সিদ্ধান্তদর্শন।

যাগাচার্য্য শ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব

কর্ত্তৃক প্রণীত।

নবদ্বীপ—নিত্য-লাইব্রেরী হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা;

৬ নং ভীমঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

ইউ. সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

সিদ্ধান্তদর্শন।

প্রথম ভাগ।

প্রথম সিদ্ধান্ত।

মিথ্যা যাহা, তাহা নাই। তোমার মতে মায়া মিথ্যা, সুতরাং তাহাও নাই। সুতরাং তাহা কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারে না। ১।

যদি বল মায়া আছে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই সত্য। মায়া সত্য স্বীকৃত হইলে, মায়ার প্রত্যেক কার্য্যও সত্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে মায়ার প্রত্যেক কার্য্যের প্রত্যেক ফলও স্বীকার করিতে হয়। ২।

মায়া সত্য স্বীকার করিলে মায়াকে অনিত্যও বলা যায় না, কারণ সত্য কখনই অনিত্য হইতে পারে না। বেদান্ত এবং নানা উপনিষদে ব্রহ্মকে সত্য বলা হইয়াছে; সেইজন্য ঐ সকল গ্রন্থমতে ব্রহ্মও নিত্য। ব্রহ্মের নিত্যতার ন্যায় মায়ারও নিত্যতা স্বীকার করিলে, ঐ উভয়ের সমতাও স্বীকার করিতে হয়। ৩।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

যে শক্তি প্রভাবে আমি আছি বোধ করা হয়, বেদান্ত এবং বৈদান্তিক গ্রন্থে সেই শক্তিকেই, অহঙ্কার বলা হইয়াছে।

বেদান্ত এবং নানা বৈদান্তিক গ্রন্থানুসারে সেই শক্তি মায়িক। মায়িক যাহা, বেদান্ত এবং নানা বৈদান্তিক গ্রন্থে তাহাকেই অসত্য বলা হইয়াছে। বেদান্ত এবং নানা বৈদান্তিক গ্রন্থানুসারে অহঙ্কার মায়িক, সুতরাং তাহাও অসত্য বলা যাইতে পারে। ১।

বেদান্ত ও বেদান্তসম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থানুসারে অহঙ্কার যদিও মায়িক, তত্রাপি অহঙ্কার ব্যতীত নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বোধ হয় না, এবং তাহা ব্যতীত অন্য কোন কিছুরও অস্তিত্ব বোধ হইবার নহে; সুতরাং আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব-বোধও সেই অহঙ্কারের অস্তিত্ব বশতই হইয়া থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অনিত্য-অসত্য দ্বারা নিত্য-সত্যের অস্তিত্ব-বোধ হয়, ইহা ভাবিতেও যেন কুণ্ঠিত হইতে হয়। অন্ধকার দ্বারা আলোক দর্শন যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ অসত্য দ্বারা নিত্য-সত্যকে জানাও অসম্ভব। ২।

যে অহঙ্কারের প্রভাবে আত্মার ও আত্মজ্ঞানেব পর্য্যন্ত অস্তিত্ব-বোধ হয়, তাহাকে তুমি অসত্য বলিতে পার না। তোমার তাহাকে নিত্য-সত্যই বলা উচিত। তাহা নিত্য-সত্য বলিলে, তাহা যে মায়ার অংশ, সে মায়াকেও নিত্য-সত্য বলিতে হয়। ৩।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

যাহার কারণ নাই, তাহা নিত্য। যাহার কারণ নাই, তাহার উৎপত্তিও হয় নাই। উৎপত্তি যাহার হয় নাই, তাহার বিনাশও নাই। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্মবিবেকানু[illegible]

অবিদ্যারও উৎপত্তির কারণ নাই। সেমতে অবিদ্যার উৎপত্তির কারণ নাই বলিয়া অবিদ্যাও অজ। সেমতে অবিদ্যা অজ বলিয়া অবিদ্যা অমরও বটে। সেমতে অবিদ্যা অজ-অমর বলিয়াই অবিদ্যাও নিত্য। সুতরাং সেই মতানুসারে অবিদ্যা ও ব্রহ্ম অভেদ বলিতে হয়। কারণ সেমতে ব্রহ্মও অজ, অমর ও নিত্য। সেমতে ব্রহ্মকে অনাদি ও অবিদ্যাকেও অনাদ্যা বলা হইয়াছে। যাঁহার আদি কেহ নাই, তিনিই অনাদি। যাঁহার আদি কেহ নাই, তাঁহার উৎপত্তিও হয় নাই। উৎপত্তি যাঁহার হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুও নাই। শঙ্করাচার্য্যের মতে পুংলিঙ্গে ব্রহ্ম যেমন অনাদি, তদ্রূপ তাঁহারই মতে স্ত্রীলিঙ্গে অবিদ্যাও অনাদ্যা। অবিদ্যা অনাদ্যা, সুতরাং অবিদ্যারও কেহ আদি নাই। অবিদ্যার আদি নাই বলিয়া অবিদ্যারও ঐ ব্রহ্মের ন্যায় জন্ম-মৃত্যু নাই। সেই জন্য ব্রহ্মের ন্যায় ঐ অবিদ্যাও নিত্য।

চতুর্থ সিদ্ধান্ত।

বেদান্তানুসারে সর্ব্ব-দেহেই একাত্মা। সেমতে সেই আত্মাই ব্রহ্ম। অথচ বেদান্তেরই কোন কোন স্থানে ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার, অপরিবর্ত্তনীয় ও নিরঞ্জন বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রায় সকল দেহেইত সেই ব্রহ্মাত্মাকে বিকারবিশিষ্ট, পরিবর্ত্তনীয় ও অঞ্জনবিশিষ্ট দেখিতে পাই। যদি বল, বেদান্তানুসারে মায়া প্রভাবেই প্রায় সকল দেহেই সেই নির্ব্বিকার-অপরিবর্ত্তনীয়-নিরঞ্জন-ব্রহ্মাত্মা বিকারবিশিষ্ট, পরিবর্ত্তনীয় এবং অঞ্জনবিশিষ্ট হইয়াছেন; তদুত্তরে বলি, তবে কি মায়া [illegible] মহান্ ব্রহ্মাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তবে কি মায়া সেই

মহান্ ব্রহ্মাত্মা অপেক্ষা মহাশক্তি-সম্পন্না? যে, সেই নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার ও অপরিবর্ত্তনীয়-ব্রহ্মকেও বিকারবিশিষ্ট, অঞ্জন-বিশিষ্ট এবং পরিবর্ত্তনীয় করিতে সক্ষম হইয়াছে? এমন কি সেই মায়া প্রভাবে সেই মহান্ ব্রহ্মাত্মারও আত্মবোধ লুপ্ত হইয়াছে। এমন কি, সেই মায়া প্রভাবে সেই মহান্ ব্রহ্মাত্মাও শোক, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, অভিমান ও অহঙ্কার প্রভৃতি নানা বিকারের অধীন হইয়া থাকেন। তিনি ঐ সকল দ্বারা অভিভূতও হইয়া থাকেন। সে অবস্থায় তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান, নির্ব্বিকার, অপরিবর্ত্তনীয় এবং নিরঞ্জন, ইহাও বুঝিতে পারেন না। সে অবস্থায় প্রকৃত-পক্ষে তিনি যাহা, তাহাওত তিনি বুঝিতে পারেন না। সে অবস্থায় তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রমই থাকে। ১।

তুমি বলিতেছ, সর্ব্বাত্মা ভ্রান্তিক্রমেই বলা হইয়া থাকে। তুমি বলিতেছ, সর্ব্ব-দেহে একাত্মাই আছেন। তুমি বলিতেছ, যত দেহ তত আত্মা নহেন। তোমার মতানুসারে সর্ব্ব-দেহেই যদি একাত্মা থাকিতেন, তাহা হইলে সর্ব্ব-দেহ হইতেই সেই একাত্মার একপ্রকার স্বভাবই বিকাশিত দেখিতাম। তাহা হইলে প্রত্যেক দেহেই সেই একাত্মা নিজেই আছেন বোধ করিতেন। আমি-আত্মা এই দেহে আছি, কিন্তু আমিই সর্ব্ব-দেহে আছি, ইহাত আমার বোধ হয় না। ২।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত।

বেদান্ত প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রমতেই আত্মা সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু হস্ত-পদবিশিষ্ট দেহ ব্যতীত অন্য কিছু অবলম্বনেত আত্মজ্ঞান

স্ফুরণের বিষয় শুনা যায় না। যে সকল গ্রন্থে আত্মা ও আত্মজ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সমস্তের মতে দেহস্থ-আত্মা হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়া থাকে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যও দেহস্থ ছিলেন, সেই দেহস্থ-মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছিল। মহাত্মা অষ্টাবক্রও দেহস্থ ছিলেন, সেই দেহস্থ-মহাত্মা অষ্টাবক্র হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছিল। বেদান্তসার রচয়িতা মহাত্মা সদানন্দ-যোগীন্দ্রও দেহস্থ ছিলেন, সেই দেহস্থ-মহাত্মা সদানন্দ-যোগীন্দ্র হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছিল। ঐরূপ কত মহাত্মাই দেহস্থ ছিলেন, অথচ তাঁহাদের মধ্য হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছে। অদ্যাপিও কত দেহস্থ মহাত্মা হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইতেছে। দেহস্থ-আত্মা ব্যতীত অন্য কোন স্থানস্থিত আত্মা হইতেত আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইবার বিবরণ, কোন উপনিষদে, বেদান্তদর্শনে, বেদান্তসারে, পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের বা অন্য কোন মহাত্মার বেদান্ত-প্রতিপাদক কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। ইদানীও কোন আত্মজ্ঞানী অদেহস্থ নহেন। উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন এবং অন্যান্য আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক গ্রন্থানুসারেই আত্মজ্ঞান দেহস্থ-আত্মা হইতেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনখানিওত দেহস্থ-বেদব্যাস হইতে স্ফুরিত হইয়াছিল। বেদান্তসারখানিওত দেহস্থ-সদানন্দ-যোগীন্দ্র হইতে স্ফুরিত হইয়াছিল। বেদান্ত-প্রতিপাদক যে সমস্ত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তইত দেহস্থ-আত্মা হইতে স্ফুরিত। সে সমস্ত গ্রন্থের কোনখানিইত অদেহ অবলম্বনে স্ফুরিত হয় নাই। সে সমস্ত গ্রন্থের প্রত্যেকখানিইত সাকার-নিরাকার-আত্মা হইতে স্ফুরিত

হইয়াছিল। সে সমস্ত গ্রন্থের কোনখানিইত কেবল নিরাকার আত্মা হইতে স্ফূরিত হয় নাই। যথা কেবল শূন্য, তথাও আত্মা বিদ্যমান। অথচ সেই শূন্যাবলম্বিত আত্মা হইতে আত্মজ্ঞান স্ফূরিত হয় না। অথবা সেই শূন্যাবলম্বিত আত্মা হইতেত কোন বৈদিক-উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন কিম্বা আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক কোন গ্রন্থ স্ফূরিত হয় নাই। ১।

প্রায় সমস্ত অদ্বৈতমত-প্রতিপাদক গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সেই সংস্কৃত ভাষাত দেহস্থ-আত্মা হইতেই স্ফূরিত হইয়া থাকে। অতএব সেইজন্য অদ্বৈতমত দেহস্থ-আত্মা হইতেই স্ফূরিত। অতএব সেইজন্য অদ্বৈতমত-প্রতিপাদক সমস্ত গ্রন্থে যে আত্মজ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে আত্মজ্ঞানও দেহস্থ-আত্মা হইতেই স্ফূরিত হইয়া থাকে। ২।

দেহেই আত্মা বিকাশিত। সেই দেহস্থ-আত্মাতেই আত্ম-জ্ঞান বিকাশিত হইয়া থাকে। অদেহস্থ-আত্মা হইতেত কখনই আত্মজ্ঞান বিকাশিত হয় না। দেহত পরিমিত, তন্মধ্যস্থ আত্মা সেই দেহ অপেক্ষা বৃহৎ, তাহাওত বোঝা যায় না। তুমিই যথার্থ বল দেখি, যে তোমার দেহ যত বড়, তন্মধ্যস্থ আত্মাকে কি তাহা অপেক্ষা বৃহৎ বোধ কর? আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, তাহা তুমি কখনই বোধ কর না। তোমার দেহে আঘাত করিলে, তদ্দ্বারা তুমি-আত্মা কষ্ট বোধ কর। কিন্তু তোমার পার্শ্বস্থ কোন শূন্যে আঘাত করিলেত তোমার কষ্ট বোধ হয় না। তবে তুমি-আত্মাই সর্ব্বত্রে আছ, ইহা কি প্রকারে অবধারিত হইতে পারে? । ৩।

এক দেহের আত্মায় আত্মজ্ঞানের স্ফূরণ দেখিতে পায়,

কিন্তু অন্য দেহের আত্মায় হয়ত আত্মজ্ঞানের স্ফূরণ দেখি না। সর্ব্ব-দেহে একাত্মারই বিদ্যমানতা থাকিলে সর্ব্ব-দেহেই আত্ম-জ্ঞানের স্ফূরণ বুঝিতাম। তাহা হইলে কোন দেহে অনাত্মজ্ঞানী-আত্মা এবং কোন দেহে আত্মজ্ঞানী-আত্মা থাকিতেন না। ৪।

দেহ-অবলম্বনে আত্মা হইতে আত্মজ্ঞান বিকাশিত হইয়া থাকে। দেহ অবলম্বনে আত্মা হইতে আত্ম-প্রেম বিকাশিত হইয়া থাকে। দেহ অবলম্বনে আত্মা হইতে শুদ্ধ-ভক্তি বিকাশিত হইয়া থাকে। দেহ অবলম্বনে আত্মা হইতে কত শক্তিই বিকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই দেহকে তুমি অপ্রয়োজনীয় বলিতে পার না। সুতরাং সেই দেহে যেন তোমার অবজ্ঞা না হয়। এক দেহস্থ আত্মজ্ঞানী-আত্মা, অন্য দেহস্থ অনাত্মজ্ঞানী-আত্মাকে আত্মজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন, সে সকলত দেহ অবলম্বনেই দিয়া থাকেন। যিনি সেই আত্মজ্ঞানীর উপদেশ সকল শ্রবণ করেন, তিনিওত দেহ অবলম্বনেই শ্রবণ করেন। এক দেহী-প্রেমিক-আত্মাইত অন্য দেহী-প্রেমাস্পদ-আত্মার প্রতি প্রেম করিয়া থাকেন। এক দেহী-ভক্তাত্মাত অন্য দেহী-ভক্তিভাজনাত্মার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন। তবে দেহ তোমার পক্ষে হেয় হয় কেন? দেহ অবলম্বনে আত্মা আত্মজ্ঞান-বিষয়ক উপদেশ সকল পাঠ ও শ্রবণ করেন। দেহ অবলম্বনে আত্মা আত্মজ্ঞান-বিষয়ক উপদেশ দিয়া থাকেন। দেহ অবলম্বনে এক দেহস্থ-আত্মা-প্রেমিক অপর দেহস্থ-প্রেমাস্পদ-আত্মার প্রতি প্রেম করিয়া থাকেন। দেহ অবলম্বনে এক দেহস্থ-ভক্তাত্মা অপর দেহস্থ-ভক্তিভাজনাত্মার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন। সকল কার্য্যই দেহ অবলম্বনে হইয়া থাকে। কত

পুরাণ, তন্ত্র, কত শাস্ত্রানুসারে পরমেশ্বরও দেহ অবলম্বনে সৃজন, পালন, নাশ প্রভৃতি কতই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কত আত্মজ্ঞানী-পরমহংসাত্মা-মহাপুরুষগণও দেহী, তাঁহারা দেহ অবলম্বনেই কত অনাত্মজ্ঞানী-দেহস্থ-আত্মাকেই আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ সকল প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দেহ অবলম্বনেই 'সোঽহং' বা 'শিবোঽহং' বলিয়া থাকেন। তবে তোমার মতে দেহ অবজ্ঞেয় কেন ?। ৫।

কোন কোন উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন, বেদান্তসার এবং পরমহংস শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের গ্রন্থাবলীমতে আত্মাতে আত্মজ্ঞান স্ফূরিত না হইলে অবিদ্যাকে অসত্য বোধ হয় না, এবং সেই আত্মজ্ঞান ব্যতীত সর্ব্ব-বন্ধন-শূন্যও হওয়া যায় না। সমস্ত অদ্বৈতমতের গ্রন্থ হইতেই জানা যায় যে, দেহস্থ-আত্মা হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফূরিত হইয়া থাকে। সে সকল গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, কখনই অদেহস্থ-আত্মা হইতে আত্মজ্ঞানের স্ফূরণ হয় না। বেদান্তানুসারে আত্মাই ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্মের দেহ নাই কি প্রকারে বলিতেছ ? ঐ যে পরমহংস যিনি বারম্বার 'সোঽহং' বলিতেছেন, যিনি আপনাকেই ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, যিনি আপনি ব্যতীত অন্য স্বতন্ত্র ব্রহ্ম আছেন স্বীকারই করেন না, ঐ দেখিতেছ না, তাঁহারও যে দেহ রহিয়াছে। তাঁহার দেহ রহিয়াছে, অথচ তাঁহার দেহকে যদি কল্পিত ও অসত্য বলা হয়, তাহা হইলে তিনি যে আছেন বোধ করিতেছেন, তাহাও অসত্য বলা হয় না কেন ? কারণ তাঁহাদের্ অদ্বৈতমতে নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, যে অহঙ্কার দ্বারা নিজের অস্তিত্ব বোধ হয়, তাহাও,

মায়িক। সুতরাং সেই মায়িক-অহঙ্কার যাহা নির্ব্বাচন করে, তাহা সত্য কি প্রকারেই বা বলা যাইতে পারে। ৬।

ব্রহ্মের সহিত আপনাদের অভেদত্ব যাঁহারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাঁহাদেরওত দেহ ছিল। ব্রহ্মের সহিত আপনাদের অভেদত্ব যাঁহারা প্রতিপাদন করিতেছেন, তাঁহাদেরওত দেহ আছে। অথচ তাঁহাদের মতে রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির দেহ কল্পিত ও অসত্য কেন বলা হয়, তাহাও বুঝিতে পারি না। যিনি বেদান্ত অনুসারে আপনাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রতিপন্ন করিতেছেন, তাঁহার দেহ সত্য হইলে রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির দেহও সত্য বলিতে হইবে। ৭।

তুমি রহিয়াছ, যে অহঙ্কার দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেছে, সেই অহঙ্কার দ্বারাই তোমার দেহ রহিয়াছেও নির্ব্বাচিত হইতেছে। তুমি আছ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার দেহ আছেও সত্য। উক্ত যুক্তি দ্বারা তোমার দেহ আছে প্রতিপন্ন হইল। উক্ত যুক্তি দ্বারাই রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিরও দেহ আছে। তাঁহাদেরও যে দেহ সত্য, ইহাই বা প্রতিপন্ন হইবে না কেন? যাহা দ্বারা এক সত্য নির্ব্বাচিত হয়, তাহা দ্বারাই অন্য সত্য নির্ব্বাচিত হইতে পারে। ৮।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

আত্মজ্ঞান যাঁহার আছে, তাঁহার আত্মজ্ঞান এবং তিনি আত্মা, ইহা তাঁহার নিশ্চয়ই বোধ আছে। সুতরাং আত্মজ্ঞানীর [illegible]হঙ্কার এবং মমতা নাই, কি প্রকারে বলিব? কারণ তাঁহার

আত্মজ্ঞান,—তাঁহার বোধ আছে, এইজন্য আত্মজ্ঞানের প্রতি তাঁহার মমতাও আছে বলিতে হইবে। তিনি আত্মা,—তাঁহার বোধ আছে, এইজন্য তাঁহার অহঙ্কারও আছে বলিতে হইবে। অথচ বেদান্তমতে আত্মজ্ঞানীর অহঙ্কার ও মমতা থাকে না বলা হয়। আত্মজ্ঞানীর নিজে আত্মা, বোধ থাকে, এবং তাঁহার আত্মজ্ঞান, ইহাও তাঁহার বোধ থাকে। সুতরাং তাঁহার অহঙ্কার ও মমতা থাকে না, কখনই বলা যায় না। ১।

নিজের অস্তিত্ব বোধ না থাকিলে, অন্য কিছুর অস্তিত্ব-বোধও হয় না। নিজের অস্তিত্ব-বোধ অহঙ্কার দ্বারা হইয়া থাকে। বেদান্তমতে অহঙ্কার মায়িক।' সেমতে যাহা মায়া কিম্বা মায়ার অংশ অথবা মায়িক, তাহাই অসত্য। অতএব সেইজন্য মায়ার বিকাশ অহঙ্কারও অসত্য। অথচ সেই অসত্য-অহঙ্কার স্ফূরিত না থাকিলে আত্মজ্ঞানী যে নিজে আত্মা, তাহাও বোধ করেন না। তাঁহার আত্মজ্ঞান, তাহাও তিনি বোধ করেন না। আত্মজ্ঞানের স্ফূরণ কি প্রকার, তাহাও অনুভব করেন না। সেই আত্মজ্ঞানের স্ফূরণ বশত আত্মজ্ঞানী যে আনন্দ সম্ভোগ করেন, তিান তাহাও বুঝিতে পারেন না। সুতরাং আত্মজ্ঞানীরও অসত্য-অহঙ্কারে বিশেষ প্রয়োজন আছে। ২।

অসত্য-অহঙ্কারের সাহত সত্য-আত্মার সম্বন্ধ বশতই সত্য-আত্মা নিজে আছেন বোধ করেন। অসত্য-অহঙ্কারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ না থাকলে তিনি নিজে আছেন পর্য্যন্ত অনুভব করিতেন না। অসত্য-অহঙ্কারের সাহায্যে সত্য-আত্মা নিজে আছেন যদি বোধ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আত্মজ্ঞানও হইত না। তাহা হইলে তাঁহার আত্মজ্ঞান, এ 'বোধও তাঁহার

হইত না। তাহা হইলে তাঁহার আত্মজ্ঞানের স্ফূরণ বোধও হইত না। তাহা হইলে আত্মজ্ঞান কি, তাহাও তিনি বুঝিতেন না। তাহা হইলে আত্মজ্ঞান বশত যে আনন্দ সম্ভোগ হয়, তিনি তাহাও সম্ভোগ করিতেন না। তাহা হইলে তিনি তাহা যে কি, তাহাও বুঝিতেন না। তাহা হইলে তিনি সেই আনন্দের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারিতেন না। সেইজন্যই বলি, অহঙ্কারকে অসত্য বলা উচিত নহে। ৩।

অসত্য-অহঙ্কার যদি আত্মার নিজের অস্তিত্ব-বোধের কারণ হয়, অসত্য-অহঙ্কার যদি আত্মার আত্মজ্ঞানের অস্তিত্বানুভব করিবার কারণ হয়, অসত্য-অহঙ্কার যদি আত্মজ্ঞান কি, তাহা বুঝিবার কারণ হয়, অসত্য-অহঙ্কার যদি আত্মজ্ঞান বিকাশিত রহিবার কারণ হয়, অসত্য-অহঙ্কার যদি আত্মজ্ঞান-জনিত আনন্দের অস্তিত্ব-বোধের, তাহা সম্ভোগ করিবার ও তাহা বুঝিবার কারণ হয়, তাহা হইলে সে অসত্য-অহঙ্কারকেও অসাধারণ বলিতে হইবে। ৪।

বেদান্তমতে অহঙ্কার, মায়ার অংশ মায়া, সুতরাং বেদান্ত-মতে তাহা অসত্য। কারণ বেদান্তে মায়াকে অসত্যই বলা হইয়াছে। বেদান্তে যে অহঙ্কারকে অসত্য বলা হইয়াছে, সেই অহঙ্কারেরই সাহায্যে সত্য-আত্মা কি প্রকারে নিজের অস্তিত্ব বোধ করেন, তাহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। অসত্য কখনই সত্য নির্ব্বাচন অথবা সত্য বুঝিবার কারণ হইতে পারে না। অসত্য নিজেই নাই। তবে তাহা,—আছে যাহা, তাহার অস্তিত্ব-বোধ কি প্রকারে করায়? অসত্য যাহার অস্তিত্ব-বোধ করায়, তাহাও যে অসত্য নহে, তাহাই বা কি প্রকারে তুমি বলি-

তেছ? বেদান্তমতে অহঙ্কার অসত্য। অথচ তাহা আত্মার অস্তিত্ব-বোধ করায়, তাহা আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব-বোধ করায়, তাহা আত্মজ্ঞান-জনিত আনন্দের অস্তিত্ব-বোধ করায়, তাহা বেদান্তানুসারে অসত্য, এবং তাহা ঐ তিনের অস্তিত্ব-বোধ করায় বলিয়াই, ঐ তিনকেও অসত্য এবং মায়ার ত্রিবিধ বিকাশ বলিতে হয়। ৫।

সপ্তম সিদ্ধান্ত।

তুমি বলিতেছ, যে আত্মজ্ঞানীই অদ্বৈতজ্ঞানী, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা নয়। আমাদের বিবেচনায় বেদান্ত যাহাকে অদ্বৈতজ্ঞান বলেন, তাহা প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানই নহে। তুমি বলিতেছ, বেদান্তানুসারে আত্মজ্ঞানীর অদ্বৈতানুভূতি হইয়া থাকে। আমরা বলি তাহা নয়, যে সময় আত্মজ্ঞানী-আত্মায় আত্মজ্ঞান স্ফূরিত রহে, সে সময় আত্মজ্ঞানী-আত্মা নিজে আছেন বোধ করেন। তিনি নিজে আত্মা, তাহাও বোধ করেন। যে অহঙ্কার দ্বারা তিনি নিজে যে আত্মা বোধ করিয়া থাকেন, তখন সে অহঙ্কারেরও অস্তিত্ব-বোধ করেন। সে সময় আত্মজ্ঞানেরও অস্তিত্ব-বোধ করেন। আত্মজ্ঞান কি, তিনি সে সময় তাহাও উপলব্ধি করেন। সে সময় সেই আত্মজ্ঞান প্রভাবে তাঁহার যে আনন্দ সম্ভোগ হইয়া থাকে, তাহাও সম্ভোগ করিয়া থাকেন। সে সময় সে সম্ভোগ বা কি, তিনি তাহাও বুঝিয়া থাকেন। সে সময় তিনি যে আনন্দ সম্ভোগ করেন, সে আনন্দেরও অস্তিত্ব-বোধ করেন। তবে আত্মজ্ঞানীর বৈ-

অদ্বৈত-বোধই থাকে কি প্রকারে বল? আমি ত দেখিতেছি, আত্মজ্ঞানীরও বহু-বোধ থাকে। তুমি যদি বল, আত্মায় আত্ম-জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান-জনিত যে আনন্দ সম্ভোগ হয়, সেই আনন্দ এবং যে শক্তি-প্রভাবে আত্মার অস্তিত্ব, আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব ও আত্মজ্ঞান-জনিত আনন্দের অস্তিত্ব-বোধ হয়, সেই শক্তিও আত্মার বিকাশ। আমরা বলি, তাহা বলাও তোমায় সঙ্গত নহে। কারণ তোমাদের বেদান্তেই আত্মা নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, সত্য, নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনীয় বলা হইয়াছে। তোমাদেরই বেদান্ত-মতানুসারে আত্মা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলা হইয়াছে। তোমাদের বেদান্তানুসারে আত্মার বহু-বিকাশ হয় না। সে-মতে আত্মার বহু-প্রকারতা নাই। সেমতে মায়ারই বহু-বিকাশ। সেমতে মায়ারই বহু-প্রকারতা। সেমতে মায়ারই পরিবর্ত্তন ও বিকার আছে। সেইজন্যই বলি, আত্মা যাহা,—তাহা আত্মাই। আত্মা এক প্রকার, আত্মজ্ঞান অন্য প্রকার, এবং আত্মজ্ঞান হইতে যে আনন্দ বিকাশিত হয়, তাহা অপর আর এক প্রকার। সুতরাং আত্মজ্ঞান এবং তজ্জনিত আনন্দের সহিত আত্মার অভেদত্ব আছে বলা যায় না। কারণ একই অদ্বিতীয়, নির্ব্বিকার ও অপরিবর্ত্তনীয়-আত্মা তিন প্রকার হইয়া বিকাশিত হইতে পারেন না। সেইজন্যই বলি, আত্মজ্ঞান আত্মার এক প্রকার বিকাশ নহে। আত্মজ্ঞান-জনিত-আনন্দও সেই আত্মার অপর আর এক প্রকার বিকাশ নহে। কারণ আত্মা, আত্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান-জনিত-আনন্দ পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐ তিনই যদি এক হইত, তাহা হলে ঐ তিনের ত্রিবিধ-বিকাশও দেখিতাম না। তাহা

হইলে ঐ তিনে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রও দেখিতাম না। আত্মা,—নির্ব্বিকার, অপরিবর্ত্তনীয় ও সত্য যদি বল, তাহা হইলে তোমাকে আত্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান-জনিত-আনন্দকে মায়ারই দুই প্রকার বিকাশ বলিতে হয়। আর অহঙ্কারকে তুমি বেদান্তানুসারে মায়ারই এক বিকাশত বলিয়াই রাখিয়াছ; সুতরাং সত্য-আত্মার পক্ষে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান-জনিত-আনন্দ এবং অহঙ্কারও অসত্য। সুতরাং ঐ তিনে আত্মার আস্থা থাকাও অনুচিত।

অষ্টম সিদ্ধান্ত।

আত্মজ্ঞানের সহিত, আত্মজ্ঞান-জনিত-আনন্দের সহিত, যে অহঙ্কার-প্রভাবে আত্মা নিজে আছেন বোধ করেন, যে অহঙ্কার-প্রভাবে আত্মা নিজের আত্মজ্ঞান আছে বোধ করেন, যে অহঙ্কার-প্রভাবে আত্মা আত্মজ্ঞান জনিত-আনন্দও আছে বোধ করেন, যে অহঙ্কার-প্রভাবে আত্মা সেই আনন্দ সম্ভোগও করেন, সেই অহঙ্কারের সহিতও আত্মার অভেদত্ব নাই। ঐ সকল আত্মার সহিত সম্পূর্ণ অসম। সুতরাং ঐ সকলের কোনটীই আত্মা কিম্বা আত্মার কোন ধর্ম্মাবিশিষ্ট নহে। সুতরাং ঐ সকলকে মায়িক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সুতরাং ঐ সকলকে মায়ারই বিবিধ-বিকাশ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? অদ্বৈতমতে মায়া অসত্য। সুতরাং ঐ সকলও মায়ার বিবিধ-বিকাশ বলিয়াই, ঐ সকলও অসত্য। বেদান্ত প্রভৃতি নানা অদ্বৈতমত-প্রতিপাদক গ্রন্থে অহঙ্কারকে স্পষ্টই মায়ার এক প্রকার বিকাশ বলা হইয়াছে। সুতরাং

সে কারণেও ঐ সকলকে মায়িক বলা যাইতে পারে। কারণ ঐ মায়িক-অহঙ্কারের সাহায্য ব্যতীত ঐ সকলের অস্তিত্ব-বোধও হইতে পারে না। মায়া বা মায়ার কোন বিকাশ দ্বারা যে সকলের অস্তিত্ব-বোধ হয়, সে সকলকে কখনই অমায়িক বলা যাইতে পারে না। সে সকলকে সত্যও বলা যাইতে পারে না, কারণ অসত্য দ্বারা সত্য নিশ্চয় করা অতি অসম্ভব।

নবম সিদ্ধান্ত।

আত্মা শব্দও মায়িক ও সান্ত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে সংস্কৃত ভাষাটীও অমায়িক নহে। আত্মা শব্দটীও সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দের মধ্যে একটী শব্দ মাত্র। আত্মা শব্দকেও তুমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলিতে পার না। কারণ আত্মা শব্দে আ, ত, ম, ও আকার আছে। সুতরাং সেই আত্মা শব্দও বহুর সমষ্টি বলিয়া, সেই আত্মা শব্দও এক অদ্বিতীয়-আত্মা নহে। আত্মা শব্দ যে অনন্ত নহে, তাহা উচ্চারণেও জানা যায়, এবং তাহা লিখিলেও দেখিতে পাওয়া যায়। ১।

আত্মা শব্দ মায়িক বলিয়া তুমি যাঁহাকে আত্মা বল, তাঁহাকেও তোমার আত্মা বল উচিত নহে। তুমি তাঁহার অন্য কোন নামও দিতে পার না। কারণ সকল নামই ভাষার অন্তর্গত ও পরিমিত, সকল নামেই বহুতা আছে। সুতরাং তুমি যাঁহাকে অমায়াত্মা বল, তাঁহার কোন নামই হইতে পারে না। ২।

আত্মজ্ঞান শব্দও ত মায়ার অন্তর্গত। কারণ তাহাও মায়িক ভাষার অন্তর্গত। কারণ তাহাতেও বহুতা আছে। সুতরাং তুমি যাহাকে আত্মজ্ঞান বল, তাহাকে তোমার আত্মজ্ঞানও

বলা উচিত নহে। তোমার তাহাকে অন্য কিছুও বলা উচিত নহে। কারণ তুমি তাহাকে অন্য যাহা কিছু বলিবে, তাহাইত ভাষার অন্তর্গত হইবে। ভাষার অন্তর্গত যাহা হইতে পারে, তাহা অমায়িক নহে; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ভাষাও মায়িক। ৩।

দশম সিদ্ধান্ত।

বেদান্তত আত্মা নহে। সুতারাং তাহাতে আত্মজ্ঞানও নাই। বেদান্ত, জড় এবং মায়িক। বেদান্ত যাহা আশ্রয় করিয়া আছে, তাহা কাগজ। কাগজ প্রাকৃত এবং অতি সামান্য। বেদান্ত, সংস্কৃত ভাষা এবং বাক্‌শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আছে। সংস্কৃত ভাষাও বহুর সমষ্টি, সুতরাং তাহাও প্রাকৃত। সুতরাং তাহাও অদ্বিতীয় আত্মা নহে। সেই সংস্কৃত ভাষার মধ্যে আত্মা বুঝাইবার জন্য যে নানা প্রকার উপমা ও উদাহরণ ব্যবহৃত হইয়াছে, সে গুলিও ভৌতিক। সুতরাং সে গুলিও প্রাকৃত বা মায়িক। সুতরাং সে গুলিও বেদান্তানুসারেই অসত্য। কারণ বেদান্তেই বলা হইয়াছে, যে আত্মা ব্যতীত অন্যান্য সকলই অসত্য। বৈদান্তিক ভাষার মধ্যে যে বাক্‌শক্তি আছে, তাহারও বহু-স্ফূরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহাও এক অদ্বিতীয়-আত্মা নহে। সুতরাং তাহা ব্রহ্ম নহে। বেদান্তানুসারেই নিত্য-সত্য-আত্মাতেই নিত্য-সত্য-আত্মজ্ঞান স্ফূরিত হইয়া থাকে। 'বেদান্ত গ্রন্থ যে জড়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; এবং তাহা যে জড়, তাহা প্রত্যক্ষও করা হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা যে আত্মা নহে, ইহা আর

কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। সুতরাং সেই অসত্য-বেদান্ত গ্রন্থে সত্য-আত্মজ্ঞান কথনই নাই। বেদান্ত গ্রন্থ অসত্য বলিয়া তাহা আত্মার আত্মজ্ঞানেরও কারণ হইতে পারে না।

একাদশ সিদ্ধান্ত।

বেদান্ত গ্রন্থ পরিমিত। তাহা অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে ভাষা আছে, তাহাও অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে সকল বর্ণ আছে, সে সকলের কোনটীই অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে সকল বাক্য আছে, সে সকলের কোনটীও অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে সকল উপমা আছে, সে সকলের কোনটীও অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে 'আত্মা' শব্দ আছে, তাহাও অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে 'ব্রহ্ম' শব্দ আছে, তাহাও অনন্ত নহে। বেদান্ত যে ব্রহ্মাত্মার বিষয় বলিতেছেন, সেই ব্রহ্মাত্মা যে অনন্ত, তাহাই বা তিনি কি প্রকারে জানিলেন? তিনিত নিজে অনন্ত নহেন। তবে অনন্ত যে কি প্রকার, তাহাই বা তিনি বুঝেন কি প্রকারে? বেদান্তত নিত্য-সত্য নহেন, তবে তিনি নিজে অনিত্য-অসত্য হইয়া সেই নিত্য-সত্য-ব্রহ্মাত্মাকে কি প্রকারে বোঝেন? এবং সেই ব্রহ্মাত্মা যে নিত্য-সত্য, তাহাই বা তিনি কি প্রকারে অবধারণ করেন?

দ্বাদশ সিদ্ধান্ত।

আছে যাহা,—তাহা অনুভব করা যায়। অনুভব করা যায় যাহা,—তাহা সত্য। মিথ্যা অনুভূত হইবার নহে। আমি আপনাকে অনুভব করি। আমি আছি, অনুভব দ্বারা জানি।

আমি যদি না থাকিতাম, তাহা হইলে আমি আছিও বোধ করিতাম না। অনুভূতি দ্বারা ব্রহ্ম-বোধও হয়। আমি সত্য স্বীকৃত হইলে, আমার কার্য্যও সত্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে আমার কার্য্য অসত্য বলিতে পারে না। ১।

আমার মধ্যে এক প্রকার নিরাকার নহে। আমি-জীবাত্মা, এক প্রকার নিরাকার, আমার প্রত্যেক মনোবৃত্তিও এক এক প্রকার নিরাকার। আমার মধ্যে সকল প্রকার নিরাকারই সক্রিয়। আমি-নিরাকারও সক্রিয়। আমার মধ্যে রাগ-নিরাকার যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাহা কার্য্য-সমন্বিত হইয়াই প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক নিরাকার মনোবৃত্তিই কার্য্য-সমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়। আমি আছি বোধও কার্য্যাত্মক। তবে নিজের মধ্যে ব্রহ্মানুভূতিই বা কি প্রকারে অকার্য্যাত্মক হইবে? । ২।

আকার অবলম্বনে প্রত্যেক মনোবৃত্তির কার্য্য ব্যক্ত হইয়া থাকে। আকার অবলম্বনে আমি এবং আমার কার্য্য সকল ব্যক্ত হইয়া থাকে। ৩।

ত্রয়োদশ সিদ্ধান্ত।

মায়াও ব্রহ্মের অধীন, জীবও ব্রহ্মের অধীন। জীব যে মায়াধীন হয়, তাহাও ব্রহ্ম-প্রভাবে, কিন্তু মায়া-প্রভাবে নয়। মায়া-প্রভাবে জীব মায়াধীন হয় স্বীকৃত হইলে, মায়াও ব্রহ্মাধীন নহেন স্বীকার করা হয়। মায়াও সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বীকার করা হয়। ব্রহ্ম অপেক্ষা মায়ার কর্তৃত্ব ও আধিপত্য, ইহাও স্বীকার করা হয়। কারণ সর্ব্ব-জীবের উপরই মায়ার প্রভাব বিস্তৃত

দেখিতেছি। আমাদের মতে সর্ব্ব-জীবের উপর যে মায়া-প্রভাব বিস্তৃত দেখিতেছি, তাহাও ব্রহ্মের নিয়োগানুসারে। মায়া ব্রহ্মের যন্ত্র স্বরূপ, ব্রহ্ম যন্ত্রী। ব্রহ্ম মায়াধীন নহেন, ব্রহ্ম মায়াধীশ। মায়াই ব্রহ্মের অধীন। অন্য কোন প্রাণী যদি ব্রহ্ম হইত, তুমি যদি ব্রহ্ম হইতে, তাহা হইলে অন্য কোন প্রাণীই মায়াধীন হইত না, তাহা হইলে তুমিও মায়াধীন হইতে না। আমাদের মতে কোন দেহস্থ-জীবাত্মাই পূর্ণ-ব্রহ্ম নহেন। কারণ পূর্ণ-ব্রহ্ম কোন প্রকার বিকারবিশিষ্টই নহেন। তাঁহার একেবারেই ভ্রান্তি এবং বিস্মৃতি নাই। তিনি কখন সবিকার এবং কখন নির্ব্বিকার নহেন। তিনি কখন পরিবর্ত্তনীয় এবং কখন অপরিবর্ত্তনীয় নহেন। তিনি কখন নিরঞ্জন এবং কখন অনিরঞ্জন নহেন। তিনি যে নিত্য-নির্ব্বিকার, তিনি যে নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়, তিনি যে নিত্য-নিরঞ্জন, তিনি যে নিত্য সত্য, তিনি যে নিত্য-অভ্রান্ত, তিনি যে নিত্য-অবিস্মৃত, তিনি যে নিত্য-শুদ্ধ, তিনি যে নিত্য-পবিত্র, তিনি যে নিত্য-জ্ঞানী, তিনি যে নিত্য-প্রেমিক।

চতুর্দ্দশ সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্ম যখন নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকেন, তখনও তাঁহাতে অব্যক্তভাবে ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তি থাকে। ব্রহ্ম যেমন নিত্য-সত্য, তদ্রূপ তাঁহাতে যে ক্রিয়া-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও জ্ঞানশক্তি আছে, তাহারাও নিত্য। ব্রহ্মও সত্য, তাহারাও সত্য। ব্রহ্মের অস্তিত্ব-বোধিনী-শক্তি যে ব্রহ্মে আছে, তাহাও নিত্য, তাহাও সত্য। যিনি ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্য

স্বীকার করেন, তিনি ব্রহ্মের ইচ্ছা ও ক্রিয়া-শক্তিও নিত্য স্বীকার করেন না কেন? বেদান্তমতে ব্রহ্ম ব্যতীত যাহা, তাহাইত অসত্য। ব্রহ্ম আর ব্রহ্মজ্ঞান এক নহে। কারণ জ্ঞান আর জ্ঞাতা এক নহে, এ কথা কে না জানে। তুমি আর তোমার জ্ঞান কি এক পদার্থ? তাই বলি, জ্ঞান ব্রহ্ম নহে। জ্ঞান ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু। জ্ঞান ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু হইলেও বেদান্তানুসারে সেই জ্ঞানকে যদি নিত্য-সত্য বলিতে হয়, তাহা হইলে সেই ব্রহ্ম ব্যতীত ব্রহ্মের ইচ্ছা ও ক্রিয়া-শক্তিকেই বা নিত্য-সত্য বলিবে না কেন? বেদান্তমতে ব্রহ্মের জ্ঞান-শক্তি যদি নিত্য-সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের মতে ব্রহ্মের ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিও নিত্য-সত্য এবং অভ্রান্ত। ১।

জ্ঞানের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইলে, ইচ্ছা ও ক্রিয়ার নিত্যত্বই বা স্বীকৃত হইবে না কেন? আত্মার জ্ঞান যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে আত্মার ইচ্ছা ও আত্মার ক্রিয়াই বা নিত্য স্বীকৃত হইবে না কেন? জ্ঞানও আত্মার, ইচ্ছাও আত্মার, ক্রিয়াও আত্মার। আত্মার জ্ঞান যে কারণে নিত্য, আত্মার ইচ্ছা ও ক্রিয়াও সেই কারণে নিত্য। ২।

আত্মা হইতে আত্মজ্ঞান স্ফূরিত হওয়া যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে সেই আত্মা হইতেই আত্মেচ্ছা ও আত্ম-ক্রিয়ার স্ফূরণই বা অসঙ্গত হইবে কেন? আত্মজ্ঞান যদি আত্মার ন্যায় নিত্য হইতে পারে, তাহা হইলে আত্মার ন্যায় আত্মেচ্ছা ও আত্ম-ক্রিয়াও নিত্য হইতে পারিবে না কেন?। ৩।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

সিদ্ধান্তদর্শন।

দ্বিতীয় ভাগ।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য রচিত অপরোক্ষানুভূতি সম্বন্ধে মত।

প্রথম সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের আদিতেই দ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াছেন। মূল শ্লোক এই—

"শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরম্।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্॥"

সেইজন্যই শঙ্করাচার্য্যকে কেবল অদ্বৈতবাদী বলা উচিত নহে। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তিনি দ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদ উভয়ই স্বীকার করিতেন। তবে তাঁহার শেষাবস্থায় অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতি অধিক এবং প্রগাঢ় অনুরাগ হইয়াছিল বটে। তাঁহার ভক্তি-ভাবের অভাব ছিল না, তাহাও তাঁহার জীবন-চরিত্র এবং তাঁহার নানা গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। তিনি তাঁহার বিবেকচূড়ামণি নামক গ্রন্থে নিজেই বলিয়াছেন,—

"মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী"

মহাত্মা আনন্দগিরি-কৃত শঙ্কর-দিগ্বিজয়ম্ নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বরের প্রতি ভক্তির বিশেষ পরিচয়

পাওয়া যায়। আমাদের মতে ভক্ত আর জ্ঞানী একই ব্যক্তি। আমাদের মতে ভক্ত আর জ্ঞানী অভেদ। যাঁহার জ্ঞান আছে, তাঁহারই ভক্তি আছে। যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহারই জ্ঞান আছে। আমাদের মতে ভক্ত অজ্ঞানী নহেন, জ্ঞানীও অভক্ত নহেন। তোমার পিতার প্রতি তোমার ভক্তি আছে, তুমি কি তোমার সেই পিতাকে জান না? তুমি অবশ্যই তোমার পিতাকে জান। ঐ প্রকার, যাঁহার পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি আছে, তিনি সেই পরমেশ্বরকে জানেনও বটে। যিনি পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারও পরমেশ্বরের প্রতি অভক্তি আছে বলা যাইতে পারে না। ভক্ত পরমেশ্বরকে যে কারণে বা যে সকল কারণে ভক্তি করেন, তাহা পরমেশ্বর-জ্ঞানীর অবশ্যই অগোচর নহে। সুতরাং তাহা জানিয়াও সেই ভক্তের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি নাই বলা যাইতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভক্তের যে সকল লক্ষণ আছে, জ্ঞান-প্রতিপাদক প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে জ্ঞানীরও সেই সকল লক্ষণ আছে। চন্দ্রে শীতলতা, সূর্য্যে অশীতলতা বা উষ্ণতা,—শীতলতার বিপরীত অশীতলতা বা উষ্ণতা হইলেও উভয় প্রকার কিরণেরই অন্ধকার দূর করিবার ক্ষমতা আছে। তোমার মতানুসারে ভক্তি এবং জ্ঞান পরস্পর বিপরীত স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে, জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিতে পারেন।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের অষ্টাদশ শ্লোকে আত্মাকে নিয়ামক বলা হইয়াছে ;—

"আত্মা নিয়ামকশ্চান্ত র্দেহো নিয়ম্য বাহ্যকঃ"

অতএব আত্মা, সগুণ-সক্রিয় নহেন কি প্রকারে? আত্মা নিয়ামক বলিলে, আত্মা কখন সগুণ-সক্রিয় এবং কখন নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বুঝিবার কোন কারণই নাই। শঙ্করাচার্য্য আত্মাকে নিয়ামক বলায়, আত্মা কেবলমাত্র সগুণ-সক্রিয়ই বুঝিবার কারণ হইতে পারে।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

যেমন দয়া এবং দয়াময় এক নহে, তদ্রূপ জ্ঞান এবং জ্ঞান-ময় এক নহে। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একোনবিংশতি শ্লোক অনুসারে—

"আত্মজ্ঞানময়ঃ পুণ্যো দেহোমাং সময়ো শুচিঃ"

ঐ মতানুসারে আত্মাকে জ্ঞানময় বলা হইয়াছে বলিয়া, আত্মাকে জ্ঞান বলা যায় না। সুতরাং জ্ঞান, আত্মার এক নামও হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে আত্মা জ্ঞানময় বলিয়া, এবং আত্মা জ্ঞান নয় বলিয়া, জ্ঞানও অসৎ। নানা অদ্বৈতমতে এক আত্মা ব্যতীত অপর যাহা কিছু তাহাই অসৎ। মাণ্ডূক্যোপ-নিষৎ প্রভৃতি মতে আত্মা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সেই-জন্য জ্ঞানকে আত্মার মতনও বলা যায় না। তবে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে জ্ঞানকে কি বলা যাইতে পারে? তাঁহারই মতা-নুসারে জ্ঞানকে অসৎ বা অসতী-অবিদ্যাই বলা যাইতে পারে। কারণ পূর্ব্বেইত শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে বলা হইয়াছে, জ্ঞান আত্মা নহে। জ্ঞান আত্মা না হইলে নিশ্চয়ই জ্ঞান অনাত্মা। অনাত্মা যাহা,—তাহাইত অসৎ। অনাত্মা যাহা,—তাহাইত

অবিদ্যা। অবিদ্যা যাহা,—কোন কোন অদ্বৈতমত-প্রতিপাদক গ্রন্থমতে তাহাইত অজ্ঞান। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়ই সমান বলিতে হয়। সুতরাং আত্মার জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন নাইও বলা যাইতে পারে। কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে জ্ঞানাজ্ঞান উভয়ই অনাত্মা বলিয়া উভয়ই বিকার। সুতরাং অবিকৃত বা নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-আত্মার আত্মজ্ঞানেও প্রয়োজন নাই। সুতরাং শ্রুতি-নির্দ্দেশিত নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-আত্মা জ্ঞানাতীত এবং অজ্ঞানাতীত। তিনি কেবল অবাঙ্মানস-গোচর। তিনি জ্ঞান-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়গণেরও অগোচর। তিনি অজ্ঞানাতীতও বটেন।

চতুর্থ সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"আত্মপ্রকাশকঃ স্বচ্ছো দেহস্তামস উচ্যতে"

প্রকাশক যাহা,—তাহা কিছুকে নিশ্চয়ই প্রকাশ করে। যিনি প্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সগুণ-সক্রিয়। সূর্য্য অথবা চন্দ্রে প্রকাশকতা আছে, তাঁহারা কি সগুণ-সক্রিয় নহেন? শঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মারও প্রকাশকতা আছে, সেইজন্য আত্মাকেও সগুণ-সক্রিয় বলা যায়।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত।

শঙ্করাচার্য্যও হরি স্বীকার করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে প্রমাণ আছে। তিনি প্রথমেই

শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া ঐ গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদে প্রণাম করা প্রয়োজনই হয় না। দ্বৈতবাদেই কোন ভক্তিভাজনকে ভক্তির সহিত প্রণাম করা হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য ঐ গ্রন্থের প্রথমেই হরিকে প্রণাম করিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার হরির প্রতি ভক্তি ছিল না, বলা যায় না।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

বন্ধন যাহার হইয়াছিল, অথবা বন্ধন যাহার হইয়া থাকে, তাহাকে নির্ব্বিকার বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য প্রণীত অপরোক্ষানুভূতি অনুসারে আমি-আত্মা নির্ব্বিকার ও অব্যয়। সুতরাং বলিতে হইবে,—আমার বন্ধন কখন হয় নাই, আমার বন্ধন নাই, এবং পরেও কখন আমার বন্ধন হইবে না। যে আত্মা নিত্য-অবদ্ধ, তাঁহাকে নিত্য-মুক্ত বলাও অতি অসঙ্গত। যে আত্মার বন্ধন হইতেই পারে না, তাঁহার মুক্তিতেও প্রয়োজন নাই। যে আত্মার বন্ধন হইতেই পারে না, তাঁহার মুক্তির সহিত কোন সংস্রবই নাই। তাঁহার মুক্তির সহিত কখনও সংস্রব হয় নাই, এবং পরেও কখন তাঁহার মুক্তির সহিত সংস্রব হইবে না। অতএব সেইজন্যই অপরোক্ষানুভূতি অনুসারে 'নিত্যমুক্তোহমচ্যুতঃ' বলাও সঙ্গত নহে।

সপ্তম সিদ্ধান্ত।

অষ্টবিংশতি শ্লোকানুসারে যদি আমি-আত্মা নির্ম্মল ও শুদ্ধ, তবে সেই নির্ম্মল-শুদ্ধাত্মা জীবত্ব-রূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়া

বিকৃত হন্ কেন? যদি বল অবিদ্যা-বশত ঐ প্রকার হয়, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে আত্মা অবিদ্যার অধীন? যদি আত্মা অবিদ্যার অধীন স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আত্মা অপেক্ষা অবিদ্যা শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে।

অষ্টম সিদ্ধান্ত।

শঙ্করাচার্য্যের মতেও আত্মা নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়। নিরহঙ্কার, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় যিনি, তাঁহাকে প্রকারান্তরে শূন্য বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ আমি আছি বোধ না থাকিলে আমাতে আত্মজ্ঞান বিকাশিত রহে না। গুণ-কর্ম্ম দ্বারাই আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়া থাকে। তোমার মধ্যে ক্রোধ আছে, তাহা গুণ-কর্ম্ম দ্বারাই বিকাশিত হয়। আত্মজ্ঞান নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকিলে তাহার বিকাশই হয় না। অহঙ্কার, জ্ঞান, গুণ এবং কর্ম্ম দ্বারা আমি-আত্মা আছি অবধারিত হয়। অহঙ্কার, জ্ঞান, গুণ এবং কর্ম্ম যদি আমি-আত্মাতে না থাকিত, তবে আমি-আত্মা এক প্রকার শূন্যই। তবে শঙ্করাচার্য্য,—আত্মাকে যিনি শূন্য বলেন, নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছেন কেন? সেই শ্লোক এই প্রকার,—

“স্বদেহে শোভনং সন্তং পুরুষাখ্যঞ্চ সম্মতম্।
কিং মূর্খ শূন্যমাত্মানং দেহাতীতং করষোভোঃ॥২৯॥”

নবম সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষানুভূতির ত্রিংশ শ্লোকে যুক্তি আর শ্রুতি দ্বারা আত্মাকে দেহাতীত অবধারণ করিতে বলা হইয়াছে। যুক্তি এবং শ্রুতিত আত্মজ্ঞান নহে, তবে ঐ উভয় দ্বারা সত্য-আত্মা যে দেহাতীত, তাহা কি প্রকারেই বা অবধারিত হইবে? ঐ দুইও বেদান্তানুসারেই মায়া হইতে বিকাশিত বলা যাইতে পারে।

দশম সিদ্ধান্ত।

ঐ ত্রিংশ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য আত্মাকে **'দেহাতীতং সদাকারং'** বলিয়াছেন। বেদান্ত এবং বেদান্তসম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থমতেই 'সৎ' নিরাকার। শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার অনেক গ্রন্থেই 'সৎ' নিরাকার বলিয়াছেন। বেদান্ত এবং সমস্ত বৈদান্তিক গ্রন্থমতেই আকার অসত্য ও অনিত্য। বেদান্ত এবং সমস্ত বৈদান্তিক গ্রন্থমতেই আকারও অবিদ্যার এক প্রকার বিকাশ। কিন্তু পৌরাণিকমতে ভগবানের আকার নিত্য। সদাকার অর্থে,—নিত্যাকার বলা যাইতে পারে। অথবা সদাকার অর্থে,—যাঁহার নিত্যাকার, তাহাও বলা যাইতে পারে। তবে শঙ্করাচার্য্য কেবল নিরাকারই স্বীকার করিয়াছেন, কি প্রকারে বলা যায়? দেখিতেছি,—তিনি যে নিত্য-আকার পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন।

একাদশ সিদ্ধান্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'অহং বিকার-হীনস্তু'। 'অহং' বিকারহীন কি প্রকারে? 'অহং'ই যে বিকার। তুমি-আত্মা নিজেকে 'অহং' জান, তুমি কি কামুক্ নও? তুমি কি ক্রোধী নও? তুমি কি অন্যান্য নানা বিকার-বিশিষ্ট নও? তবে তুমি যখন 'অহং,' তখন তোমাতে বিকার থাকে না কি প্রকারে বলিব? তোমাতে দুঃখ-বিকারের উদয় হইলে, আমি দুঃখী বলিয়া থাক। তোমাতে শোক-বিকারের উদয় হইলে, আমি শোকী বলিয়া থাক।

দ্বাদশ সিদ্ধান্ত।

পাতঞ্জলদর্শনের মতে দৃগাত্মাই পুরুষ। শঙ্করাচার্য্যেরও সেই অভিপ্রায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতে সেই দৃগাত্মা-পুরুষ অসঙ্গ। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও অপরোক্ষানুভূতির ষষ্ঠত্রিংশ শ্লোকে সেই মত সমর্থন করিয়াছেন। যে দৃগাত্মা-পুরুষ অসঙ্গ, তাঁহার অবিদ্যা-জনিত জীবত্বের সহিত কি প্রকারে সংস্রব হয়? সেই সংস্রব বশত,—সেই দৃগাত্মা-পুরুষ নানাপ্রকার দুঃখও ভোগ করেন। তাঁহার অন্যান্য প্রকার ভোগও হইয়া থাকে। তবে তিনি অসঙ্গ কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? পাতঞ্জল-দর্শনের মতে, সেই দৃগাত্মা-পুরুষের কৈবল্য হইলেই তিনি অসঙ্গ হন। বেদান্তমতেও তাঁহার অবিদ্যার সহিত যখন সংস্রব থাকে না, তখনই তাঁহাকে অসঙ্গ বলা যাইতে পারে।

ঐ বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতানুসারে স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"তত্রৈব চ সমাখ্যাতঃ স্বয়ং জ্যোতির্হি পুরুষঃ"

চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জোতিষ্কেরই জ্যোতি আছে। বেদান্তানুসারে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কোনটীইত আত্মা নহেন, তবে 'স্বয়ং জ্যোতির্হি পুরুষঃ' কি প্রকারে বলা হইয়াছে? বেদান্তমতেই জ্যোতিকেও অনাত্মার এক প্রকাব বিকাশ বলা যাইতে পারে। সুতরাং নির্ব্বিকার নিরঞ্জন-দৃগাত্মা-পুরুষকে জোতি বলাও সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

ত্রয়োদশ সিদ্ধান্ত।

কর্ম্মকাণ্ডানুসারে দেহপাতের পবও আত্মাকে নানাপ্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। অপরোক্ষানুভূতির অষ্টত্রিংশ শ্লোকে অথবা তৎপরবর্ত্তী কোন শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য ঐ মতের প্রতিবাদ করেন নাই বলিয়া, তাঁহারও ঐ মত স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ অষ্টত্রিংশ শ্লোকে তাঁহার কেবল ঐ মত প্রকাশ করায়, তিনিও ঐ মতেব পক্ষ, ইহাই অবধারণ করা যাইতে পারে। ঐ বিষয়ে শঙ্কবাচার্য্যের মূল শ্লোক এই প্রকার,—

"প্রোক্তোঽপি কর্ম্মকাণ্ডেন হ্যাত্মা দেহাদ্বিলক্ষণঃ।
নিত্যশ্চ তৎ ফলং ভুঙ্‌ক্তে দেহপাতাদনন্তরম্‌॥"

দেহপাতের পর আত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন স্বীকার করিলে, আত্মাকে নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, নির্গুণ ও

নিষ্ক্রিয় প্রভৃতিও বলা যায় না। তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের মতেই আত্মা সবিকার, অঞ্জনবিশিষ্ট, সমল, সগুণ ও সক্রিয়ইত প্রতিপন্ন হইতেছেন।

চতুর্দ্দশ সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষানুভূতির চত্বারিংশ শ্লোকানুসারে আত্মা-পুরুষই ঈশ্বর। নানা শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর সগুণ-সক্রিয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ঈশ্বর সগুণ-সক্রিয় বলিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার উক্তি,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যবান। ঐশ্বর্য্যবান যিনি,—তিনি নিশ্চয়ই সগুণ-সক্রিয়।

পঞ্চদশ সিদ্ধান্ত।

আত্মার রূপ নাই বলিতে পার না। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই অপরোক্ষানুভূতির চত্বারিংশ শ্লোকে আত্মার বহু-রূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"এবং দেহদ্বয়াদন্য আত্মাপুরুষ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বাতীতোঽহমব্যয়ঃ॥

আত্মা নিরাকার বলিলেও আত্মা রূপবান ও আত্মা সাকার স্বীকার করা হয়। কারণ নিরাকার অর্থে,—যিনি আকার নন্, ইহঃ

বলিলেও বলা যায়। নিরাকার অর্থে,—যিনি আকার নন্ করিলে, নিরাকার অর্থে,—যিনি সাকার, ইহাও বলা যাইতে পারে। নিরাকার অর্থে,—যাঁহার আকার নাই বলা অতি অসঙ্গত। কারণ যিনি আপনাকে নিরাকার-আত্মা বলেন, তাঁহারও আকার আছে। তবে তিনি নিরাকার-আত্মা অর্থে,—আকার-বিহীন-আত্মা বলেন কি প্রকারে? তাঁহার নিরাকার-আত্মা অর্থে,—আকার নন্, ইহাই বলা সঙ্গত। পরমহংস শঙ্করাচার্য্য, আত্মা সর্ব্ব-রূপ বলিয়াছেন বলিয়াই, আত্মার বহু-রূপ এবং বহু-প্রকার আকার আছেও স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার ঐ কথার সঙ্গে পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক-সাকারবাদের বিরোধ নাই।

ষোড়শ সিদ্ধান্ত।

সর্ব্বাত্মা বলিলে সকলই আত্মা বলিতে পারা যায়। অথবা সর্ব্বাত্মা বলিলে সর্ব্বই যাঁহার আত্মা, ইহাও বলা যাইতে পারে; যেমন সর্ব্ব-রূপ বলিলে সর্ব্বই যাঁহার রূপ, ইহাও বলা যাইতে পারে। যদি সর্ব্বাত্মা অর্থে,—যিনি সকলের আত্মা প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে সর্ব্ব-রূপ অর্থেই বা, যিনি সকলের রূপ প্রতিপন্ন করিবে না কেন? যিনি সকলের রূপ বলিলে, সেই 'যিনি' শব্দ স্থূল-জড়বাচক প্রতিপন্ন করা হয়। যথা,—

"এবং দেহদ্বয়াদন্য আত্মাপুরুষ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বাতীতোহমব্যয়ঃ ॥৪০॥"

উক্ত শ্লোকে পরমহংস শঙ্করাচার্য্য, আত্মাকেই 'সর্ব্বাত্মা

সর্ব্বরূপশ্চ’ বলিয়াছেন। যে আত্মা সর্ব্ব-রূপ, তিনি আকার নন্ট বা কি প্রকারে বলা যায়, কারণ রূপইত আকার। যে আত্মা সর্ব্ব-রূপ, তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বাকার। তবে আত্মাকে বৈদান্তিকমতে ‘সৎ’ বলা হইয়াছে বলিয়া, পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে, তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের ত্রিংশ শ্লোকে **‘সদাকারং’** বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মনামাবলী-মালার একোনবিংশ শ্লোকে **‘ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি’** বলায়, আত্মাই সর্ব্ব-রূপ, ইহাও তাঁহার স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ জগৎ অরূপ নহে। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মই সর্ব্ব-জগৎ বলিয়া, ব্রহ্মই সর্ব্ব-রূপ। বেদান্ত এবং নানা বৈদান্তিক গ্রন্থে ও নানা উপনিষদে ব্রহ্মই আত্মা। ঐ সকলে ব্রহ্ম এবং আত্মার অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সপ্তদশ সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষানুভূতির ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায়, চৈতন্য বা আত্মা অজীব। সেমতে ভ্রম-বশত যেমন রজ্জুকে সর্প-বোধ হয়, তদ্রূপ ভ্রম-বশতই চৈতন্য বা আত্মাকেও জীব-বোধ হয়। সেমতে রজ্জুকে সর্প-জ্ঞান যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ চৈতন্য বা আত্মাতে জীবত্ব-জ্ঞানও মিথ্যা। ঐ অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে সমস্তই ব্রহ্ম অবগত হওয়া যায়। সেই শ্লোক এই প্রকার,—

“ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ॥”

উক্ত শ্লোকানুসারে সমস্তই ব্রহ্ম অবধারিত হইয়াছে। সেইজন্য জীবও সেই সমস্তেরই অন্তর্গত। সুতরাং জীবও যে ব্রহ্ম, সে বিষয়ে সংশয় কি আছে? ঐ অপরোক্ষানুভূতিরই দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে সম্পূর্ণ অভেদ, তাহা স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই শ্লোক এই প্রকার,—

"স্বল্পমপ্যন্তরং কৃত্বা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
যস্তিষ্ঠতি স মূঢ়াত্মা ভয়ং তস্যাভিভাষিতম্॥"

শঙ্করাচার্য্যের আত্ম-পূজাতেও সদা-শিবাত্মা ও জীবে যে কোন প্রভেদ নাই, তাহাও বোঝা যায়। শঙ্করাচার্য্যের আত্ম-পূজার অষ্টম শ্লোকে আছে,—

"দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ"

অষ্টাদশ সিদ্ধান্ত।

বেদান্তমতে ব্রহ্ম যে নির্ব্বিকার ও নিত্য-সত্য, ইহা বারম্বার স্বীকার করা হইয়াছে। নির্ব্বিকার-নিত্য-সত্য যে ব্রহ্ম, তাঁহার কোন পরিবর্ত্তনই হইতে পারে না। নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনকেই নানাপ্রকার বিকার বলা যাইতে পারে। অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ॥"

উর্দ্ধ শ্লোকানুসারে অবিদ্যা ও ব্রহ্ম অভেদ, স্পষ্টই স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ শ্লোকানুসারে ব্রহ্মই 'সর্ব্ব-প্রপঞ্চ বলিয়া ব্রহ্মও

বিকারগ্রস্থ স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ সর্ব্ব-প্রপঞ্চ অবিকার নহে। ঐ সর্ব্ব-প্রপঞ্চের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন বশত আরও কত বিকার বিকাশিত হইয়াছে। সর্ব্ব-প্রপঞ্চ অবিদ্যারই নানাপ্রকার বিকাশ। সুতরাং সর্ব্ব-প্রপঞ্চ, অবিদ্যা ও ব্রহ্ম অভেদ। ঐ তিন অভেদ স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া, ঐ তিনই এক। বেদান্ত এবং শঙ্করাচার্য্যের নানা বৈদান্তিক গ্রন্থমতে ব্রহ্ম নিত্য-সত্য। সর্ব্ব-প্রপঞ্চ এবং অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মের অপার্থক্য-বশত সর্ব্ব-প্রপঞ্চ এবং অবিদ্যাকেও নিত্য-সত্য বলিতে হয়।

একোনবিংশ সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের মতে 'সর্ব্বমাত্মেতি' স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থানুসারে সমস্তই আত্মা বলিয়া, ব্যাপ্য-ব্যাপকতাও আত্মা স্বীকার করিতে হয়। ব্যাপ্য-ব্যাপকতাও আত্মা স্বীকৃত হইলে, ব্যাপ্য-ব্যাপকতাও মিথ্যা বলা যায় না। বৈদান্তিক মতানুসারেই সর্ব্ব-ভূতও অনাত্মা-অবিদ্যার নানাপ্রকার বিকাশ। অথচ পরমহংস শঙ্করাচার্য্য অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকে—

"ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ॥"

বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকানুসারে সর্ব্ব-ভূতেই ব্রহ্ম স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া, ব্রহ্মেরও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা আছে, প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে। বায়ুও সর্ব্ব-ভূতের মধ্যে এক ভূত

তুমি কি সেই বায়ুর ব্যাপ্য-ব্যাপকতা বুঝিতেছ না? শঙ্করাচার্য্যের উক্ত একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে বায়ু-ভূতও ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্ম-বায়ুরও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা নিশ্চয়ই আছে। অগ্নি-ভূতেরওত ব্যাপ্য-ব্যাপকতা দেখিয়াছ। ঐ একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে অগ্নি-ভূতও ব্রহ্ম। সুতরাং সেই ব্রহ্মাগ্নিরও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা নিশ্চয়ই আছে। জল-ভূতেরওত ব্যাপ্য-ব্যাপকতা দেখিয়াছ। ঐ একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে জল-ভূতও ব্রহ্ম। সুতরাং সেই ব্রহ্ম জলেরও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা নিশ্চয়ই আছে। উক্ত একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে সর্ব্ব-ভূত হইতে যে সকল বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকলও সর্ব্ব-ভূত। ঐ একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে সর্ব্ব-ভূত ব্রহ্মোৎপন্ন বলিয়া সর্ব্ব-ভূতকেও ব্রহ্ম যে প্রকারে বলা হইয়াছে, সেই প্রকারেই সর্ব্ব-ভূতই যে সকল বস্তু হইয়াছে, সে সকল বস্তুকেও ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে।

বিংশ সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষানুভূতির ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে সমস্তই আত্মা স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ শ্লোকে সমস্তই আত্মা স্বীকার জন্য, ঐ শ্লোকেই আত্মার বহুত্বও স্বীকার করা হইয়াছে। তদ্দারা আত্মা বহু-প্রকারও স্বীকার করা হইয়াছে। বেদান্তমতে অবিদ্যারই বহুত্ব। বেদান্তমতে অবিদ্যারই বহু-প্রকারতা। কিন্তু অপরোক্ষানুভূতির ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে পরমাত্মা-ব্রহ্মেরও বহুত্ব এবং বহু-প্রকারতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবেই বলিতে হয়, পরমাত্মা-ব্রহ্ম এবং অবিদ্যা অভেদ। শঙ্করাচার্য্যের মতানু

সারে পরমাত্মা-ব্রহ্ম ও অবিদ্যা যে অভেদ, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

একবিংশ সিদ্ধান্ত।

শঙ্করাচার্য্যের **'সর্ব্বমাত্মেতি'** বলায়, আত্মা যে বহু এবং বহু-প্রকার, ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। তবে সেই আত্মার সেই আত্মাসম্বন্ধে ভেদজ্ঞানের অবসর নাই, কি প্রকারে বলা যাইবে ? সেইজন্যই অপরোক্ষানুভূতি অনুসারে—

"ব্যাপ্যব্যাপকতা মিথ্যা সর্ব্বমাত্মেতি শাসনাৎ।
ইতি জ্ঞাতে পরে তত্ত্বে ভেদস্যাবসরকুতঃ ॥৪৬॥"

বলা উচিত হয় নাই।

দ্বাবিংশ সিদ্ধান্ত।

শঙ্করাচার্য্যের **'সর্ব্বমাত্মেতি'** মতানুসারে তাঁহার সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকোক্ত শ্রুতি-নিরূপিত-বিশ্বাত্মার নানাত্ব নিবারণ স্বীকার করা যায় না। শ্রুতিমতেইত বলা হইয়াছে **'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,'** তবে সেই ব্রহ্মাত্মার নানাত্ব অস্বীকার্য্য হইবে কেন ?

ত্রয়োবিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য—

"ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥৪৯॥

বলায়, তিনি ব্রহ্মেরই নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকে—

"দোষোঽপি বিহিতঃ শ্রুত্যা মৃত্যোর্ম্মৃত্যুং স গচ্ছতি।
ইহ পশ্যতি নানাত্বং মায়য়া বঞ্চিতো নরঃ ॥৪৮॥"

বলিয়া নানাত্ব স্বীকারকারীদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন কেন? এই জগতের'ও নানাত্ব দেখি। শঙ্করাচার্য্য'ও 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলিয়া আত্মারও নানাত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে শঙ্করাচার্য্যের কোন কোন শ্লোকে নানাত্বে দোষারোপ করা হইয়াছে কেন?

চতুর্ব্বিংশ সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষানুভূতির একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে পরমাত্মা-ব্রহ্মই সর্ব্ব-ভূত। ঐ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তিও ভূত ব্যতীত অন্য কিছু নয়। উহা ক্ষিতি-নামক ভূতই আকারে পরিণত। সুতরাং ঐ একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পার্থিবী প্রতিমূর্ত্তিও পরমাত্মা-ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের সেই শ্লোক এই প্রকার,—

"ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥৪৯॥"

পুরাণ ও তন্ত্রমতে পার্থিবী নানাপ্রকার প্রতিমূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা আছে। সে সকল পূজা করায়, পরমাত্মা-ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়। কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতে পৃথিবী-ভূতও ব্রহ্ম।

পঞ্চবিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"ব্রহ্মৈব সর্ব্বনামানি রূপাণি বিবিধানি চ।
কর্ম্মাণ্যপি সমগ্রাণি বিভর্ত্তীতি শ্রুতির্জগৌ॥"

উক্ত গ্রন্থের সকল ভাষ্যকার এবং সকল টীকাকারই উক্ত গ্রন্থেরই পঞ্চাশৎ শ্লোকের এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ঐ শ্লোকের প্রথম চরণের 'ব্রহ্মৈব সর্ব্ব-নামানি রূপানি বিবিধানি চ' অর্থে,—ব্রহ্মই সর্ব্ব-নাম, ব্রহ্মই বিবিধ-রূপ স্বীকার করিলে, কোন নামকেও অনিত্য-অসত্য বলা যায় না, কোন রূপকেও অনিত্য-অসত্য বলা যায় না। অদ্বৈতবাদের অনেক শ্রৌত-উপনিষদ্‌মতে, অদ্বৈতবাদের বেদান্তদর্শনমতে, অদ্বৈতবাদের বেদান্তসারমতে, অদ্বৈতবাদেব শঙ্করাচার্য্যের নানা গ্রন্থমতে, অদ্বৈতবাদের পরমহংস গোবিন্দ-ভগবতের মতে ও অদ্বৈতবাদের অন্যান্য প্রসিদ্ধ মহাত্মাগণের মতে সকল নাম এবং সকল রূপই প্রাকৃত। তাঁহাদের মতে কোন নাম এবং কোন রূপই অপ্রাকৃত নহে। শঙ্করাচার্য্যের অপবোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে ব্রহ্মই সমস্ত নাম, ব্রহ্মই বিবিধ-রূপ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকেও অপ্রাকৃত বলা যায় না। ঐ সকল প্রাকৃতকে ব্রহ্ম বলিতে হইলে ব্রহ্মেরও বিবিধ-বিকাশ আছে স্বীকার করা হয়। অদ্বৈত-মতের নানা গ্রন্থানুসারে, প্রকৃতিরই বিবিধ-বিকাশ। সে সকল গ্রন্থমতে ব্রহ্মকে অপরিবর্ত্তনীয়-নির্ব্বিকার-নিত্য-শুদ্ধ-নিরঞ্জন বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। অথচ শঙ্করাচার্য্যের

অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে ব্রহ্মকে ঐ সকল বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতির উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥৪৯॥"

সেইজন্যই 'ব্রহ্মৈব সর্ব্বনামানি রূপানি বিবিধানি চ' বলিলে, ব্রহ্মই সর্ব্ব-নাম ও ব্রহ্মই বিবিধ-রূপ বুঝিবার পক্ষেও কোন বাধা হয় না। কারণ, কথিত পঞ্চাশৎ শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয়, পরমাত্মা-ব্রহ্ম-জাত সমস্তই ব্রহ্ম। সেই-জন্য সমস্ত নাম এবং বিবিধ রূপও ব্রহ্ম বলিলে অসঙ্গত হয় না। কাহার কাহার মতে ঐ পঞ্চাশৎ শ্লোকের পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে বুঝিতে হয়, সর্ব্ব-নাম, বিবিধ-রূপ এবং সমগ্র কর্ম্ম-নিচয় শ্রুতি-মতে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ধারিত হইতেছে। সেইজন্য অবশ্যই ব্রহ্মকে সক্রিয় বলিতে হয়। কারণ ধারণ করাও এক প্রকার ক্রিয়া। যিনি ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই ক্রিয়াবান। নানা শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়াবান যিনি,—তিনি সগুণ। ব্রহ্মও ক্রিয়াবান প্রমাণিত হইয়াছেন বলিয়া, ব্রহ্মকেও অবশ্যই সগুণ বলিতে হয়। ব্রহ্ম ক্রিয়া-বান ও সগুণ প্রমাণিত হইয়াছেন বলিয়া, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি মতে ব্রহ্মকে সাকারও বলা যাইতে পারে। কারণ সকলেই আকার অবলম্বনে ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কারণ সকলেই আকার অবলম্বনে ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখিয়া থাকেন। প্রমাণ করা হইয়াছে, ব্রহ্মও সক্রিয়; সেইজন্য তিনিও আকার-বিশিষ্ট বা সাকারও অবধারণ করা যায়। শঙ্করাচার্য্যের মতে

ব্রহ্ম আকার-বিশিষ্ট বা সাকার অবধারিত হইলে স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্রের সহিত অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের পঞ্চাশৎ শ্লোকের কোন বিরোধই থাকে না। শঙ্করাচার্য্যের উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম সাকার স্বীকার করিতে হইলে, শঙ্করাচার্য্যকেও সাকারবাদী বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের সাকারবাদের অনেক গ্রন্থে অনেক প্রমাণও পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত অনেক স্তোত্রেও তাঁহার সাকারবাদের প্রমাণ আছে। শঙ্কর-দিগ্বিজয়ম্ নামক গ্রন্থানুসারে চণ্ডালরূপী-ভগবান-বিশ্বেশ্বর-দেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলে, সেই মূর্ত্তি-বিশিষ্ট বা আকার-বিশিষ্ট সাকার-বিশ্বেশ্বর-শিবের, শঙ্করাচার্য্য দ্বৈতবাদ-সূচক ভক্তি-বিগলিত দিব্য-ভাবে স্তব করিয়াছিলেন। সে স্তবও তাঁহার দ্বৈতবাদের, সে স্তবও তাঁহার সাকারবাদের, সে স্তবও তাঁহার ভক্তি-ভাবের প্রমাণ করে। শঙ্করাচার্য্যের দ্বৈতবাদের, শঙ্করাচার্য্যের সাকারবাদের ও শঙ্করাচার্য্যের ভক্তি-ভাবের অনেক প্রমাণ, তাঁহার নিজ-রচিত অনেক গ্রন্থেই আছে। সে বিষয়ে তাঁহার আনন্দ-লহরী নামক গ্রন্থই বিশেষ প্রমাণ করে। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বঞ্চ শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বঞ্চ তথা ভবেৎ॥"

সেইজন্য এই সিদ্ধান্তদর্শনের নানা সিদ্ধান্তে ব্রহ্মকে নানাপ্রকার প্রমাণ করার জন্য শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে কোন আপত্তি হইতে পারে না। কারণ উক্ত একপঞ্চাশৎ শ্লোকের তাৎপর্য্য,—যেমন স্বর্ণ-সম্ভূত বস্তুর নিত্য-স্বর্ণত্ব, তদ্রূপ ব্রহ্ম-সম্ভূত

যাহা,—তাহার নিত্য-ব্রহ্মত্ব। শঙ্করাচার্য্যের অনেক গ্রন্থের অনেক শ্লোকানুসারেই ব্রহ্ম-সম্ভূতই সমস্ত। সুতরাং সেইজন্য স্বয়ং ব্রহ্মই সমস্ত। ঐ বিষয়ে শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে,—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥৪৯॥"

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য,—পরমাত্মা-ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্ব-ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম, এই প্রকার অবধারণ করিবে। শঙ্করাচার্য্য সমস্তই ব্রহ্মাবধারণ করিতে বলিয়াছেন। সেইজন্য নিরাকার, সাকার এবং আকারও পরস্পর অভেদ, ইহাও তাঁহার স্বীকার করা হইয়াছে। যেমন নানা আর্য্য-শাস্ত্রানুসারে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী পরস্পর অভেদ, সেই প্রকারেই নিরাকার, সাকার এবং আকার পরস্পর অভেদ। কোন কোন গ্রন্থমতে আকাশ ও বায়ু নিরাকার। কিন্তু কাহার কাহার মতে আকাশের বিকাশ বায়ু নিরাকার বলিয়া পরিগণিত হইলেও, বায়ুও সাকার বলা যাইতে পারে। বায়ু হইতে জলের প্রকাশ। সেইজন্য সেই জল-বিশিষ্ট-বায়ু নিরাকার ও সাকার বলিয়াও অবধারিত হইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের মতেও ঐ সাকার-নিরাকার-বায়ুই জল হইয়াছে বলিয়া, বায়ুকেও আকার বলা যায়। কারণ জল বায়ুরই এক প্রকার বিকাশ। সেইজন্য বায়ুও যাহা,—জল ও তাহা। ঐ প্রকারে সাকার, নিরা-

কার ও আকার-ব্রহ্মও অভেদ বলা যাইতে পারে। ঐ প্রকারে নিরাকার ও আকার-ব্রহ্মও অভেদ বলা যাইতে পারে। আকাশের কোন ক্রিয়া নাই। অথচ নানা আর্য্য-শাস্ত্রমতে আকাশই সক্রিয়-বায়ু। নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্মকেও ঐ দৃষ্টান্তানুসারে সক্রিয়-ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। কাহার কাহার মতে সক্রিয় বায়ু নিরাকার বলিয়া পরিগণিত হইলেও, সেই সক্রিয়-বায়ু হইতেই আকার-জল বলিয়া, সেই সক্রিয়-নিরাকার-বায়ুও ঐ আকার-জল-বিশিষ্ট বলিতে হয়। সেইজন্য ঐ সক্রিয়-নিরাকার-বায়ুকে সক্রিয়-সাকারও বলিতে হয়। ঐ প্রকারে সক্রিয়-নিরাকার-ব্রহ্মকেও সক্রিয়-সাকার-ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। নিরাকার-বায়ুই সক্রিয়-আকার-জল যে প্রকারে,—সেই প্রকারে নিরাকার-সক্রিয়-ব্রহ্মই সক্রিয়-আকার-ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অভেদ। শঙ্করাচার্য্যের ঐ অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোকের মতে পরমাত্মা-ব্রহ্ম ও জীবাত্মা অভেদ বলা যাইতে পারে। সেই শ্লোক এই প্রকার,—

"স্বল্পমপ্যন্তরং কৃত্বা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
যস্তিষ্ঠতি স মূঢ়াত্মা ভয়ং তস্যাভিভাষিতম্॥"

উক্ত শ্লোক ব্যতীত শঙ্করাচার্য্যের জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদত্ব-বাচক আরও অনেক শ্লোক আছে। শঙ্করাচার্য্যের আত্মার সহিত জগতের অভেদত্ব-বাচক ও অনেক শ্লোক আছে। সে সকলের মধ্য হইতে আত্মবোধ নামক গ্রন্থের একটী শ্লোকই এই স্থলে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে। সেই শ্লোক এই প্রকার,—

"আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে ॥৪৭॥

উক্ত শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায়, যেমন ঘটাদি মৃৎ-পাত্র সকল এবং মৃৎ বা মৃত্তিকা অভেদ, তদ্রূপ আত্মা এবং এই নিখিল-জগৎ অভেদ। সেইজন্যই বলিতে হয়, আত্মাই জগৎ,—জগৎই আত্মা। শঙ্করাচার্য্যের মতেই আত্মা এবং জগৎ অভেদ প্রমাণ করা হইয়াছে। অথচ শঙ্করাচার্য্যের অনেক গ্রন্থেই জগৎ প্রাকৃত বলা হইয়াছে। জগৎ প্রাকৃত বলিয়া, জগৎকে প্রকৃতির অংশ প্রকৃতিই বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে আত্মাই জগৎ। সেইজন্য আত্মা এবং প্রকৃতির অংশ জগৎ অভেদ বলিতে হয়। প্রকৃতির অংশ জগৎ এবং আত্মা অভেদ স্বীকার করিলে, প্রকৃতি-অনাত্মা ও আত্মা অভেদও স্বীকার করিতে হয়। শ্রীমদ্ভগবৎ গোবিন্দ-পাদাচার্য্য-পরিব্রাজক পরমহংস-স্বামী-বিরচিত অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থানুসারে,—

"জলাদন্য ইবাভাতি জলাম্বু বুদ্‌বুদো যথা।
তথাত্মনঃ পৃথগিব প্রপঞ্চোয়মনেকধা ॥ ১৬ ॥"

ঐ শ্লোকানুসারে জল এবং জল-বুদ্‌বুদ্ যেমন অভেদ, তদ্রূপ আত্মা এবং প্রপঞ্চ অভেদ। শঙ্করাচার্য্যের এবং অন্যান্য অনেক অদ্বৈত-মতাবলম্বীদিগের গ্রন্থানুসারেই প্রকৃতি এবং প্রপঞ্চ অভেদ। প্রকৃতিই মায়া, প্রকৃতিই অবিদ্যা, প্রকৃতিই অনাত্মা, এবং কোন কোন ব্যক্তির মতে সেই প্রকৃতিই অজ্ঞান।

ষড়বিংশ সিদ্ধান্ত।

একই সুবর্ণে নানা অলঙ্কার হয়। সেই অলঙ্কার গুলি এক সুবর্ণ ব্যতীত যেমন অন্য কিছু নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মই সমস্ত হইয়াছেন বলিয়া, সমস্তই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে বলিতে হয়। তাহা হইলে এই জগৎ এবং জগতস্থ কোন কিছুকেই অনিত্য এবং অসত্য বলা উচিত নয়। তাহা হইলে যিনি জগৎ এবং জগতের কিছুকে অবিদ্যার নানা বিকাশ বলেন, তাঁহার সে সমস্তকেই ব্রহ্মের নানা বিকাশ বলা উচিত। শঙ্করাচার্য্যের একপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে সুবর্ণ-জাত কোন সামগ্রীর যেমন চির-সুবর্ণত্ব, তদ্রূপ ব্রহ্ম-জাত কোন কিছুর ব্রহ্মত্বই হইয়া থাকে। ঐ বিষয়ে মূল শ্লোক এই প্রকার,—

"সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বঞ্চ শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বঞ্চ তথা ভবেৎ॥"

সুবর্ণইত নানাপ্রকার সুবর্ণালঙ্কার। সুবর্ণইত নানাপ্রকার সুবর্ণ সামগ্রী। সুবর্ণের সঙ্গে নানাপ্রকার সুবর্ণালঙ্কারের, সুবর্ণের সঙ্গে নানাপ্রকার সুবর্ণ-সামগ্রীর কোন প্রভেদ নাই। সুবর্ণই নানাপ্রকার অলঙ্কার হইলে, সেই অলঙ্কার গুলিকে সেই সুবর্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যায় না। সুবর্ণই নানাপ্রকার আকার-বিশিষ্ট নানাপ্রকার সামগ্রী হইলেও, সেই নানা-প্রকার আকার-বিশিষ্ট নানাপ্রকার সামগ্রী গুলিকে সেই সুবর্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যায় না। ব্রহ্ম যদি নানাপ্রকার সামগ্রী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই নানাপ্রকার সামগ্রী গুলিকে সেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যায় না। ব্রহ্ম

যদি সমস্তই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সমস্তকেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না। তাহা হইলে অবিদ্যাওত সমস্তের অতিরিক্ত কিছু নহেন। তাহা হইলে অবিদ্যাও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সমস্তই ব্রহ্ম স্বীকৃত হইলে, সেই সমস্তের কিছুই অসত্য নহে। কারণ নানা উপনিষদে, বেদান্তে এবং বেদান্তমতের নানা গ্রন্থে ব্রহ্মকে সত্যই বলা হইয়াছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থানুসারে ব্রহ্ম সত্য বলিয়া, সেই ব্রহ্ম যে সমস্ত পদার্থ হইয়াছেন, সেই সমস্ত পদার্থও সত্য। নির্ব্বিকার-ব্রহ্মই সমস্ত হইয়াছেন বলিয়া, সমস্তের কিছুই বিকৃত নহে স্বীকার করিতে হয়।

সপ্তবিংশ সিদ্ধান্ত।

"স্বল্পমপ্যন্তরং কৃত্বা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
যস্তিষ্ঠতি স মূঢ়াত্মা ভয়ং তস্যাভিভাষিতম্ ॥৫২॥"

বলায়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকানুসারে জীবত্ব যে মিথ্যা, ইহা বুঝিবার কোন কারণই নাই। ঐ শ্লোকানুসারে জীবত্বও সত্য বোঝা যায়। কিন্তু—

"যদ্বন্মৃদি ঘটভ্রান্তিং শুক্তৌ বা রজতস্থিতিং।
তদ্বদ্ব্রহ্মণি জীবত্বং বীক্ষ্যমাণে নপশ্যতি ॥৫৯॥
যথা মৃদি ঘটো নাম কনকে কুণ্ডলাভিধা।
শুক্তৌ হি রজতখ্যাতি জীবশব্দস্তথাপরে ॥৬০॥"

বলায়, এই দুই শ্লোক পূর্ব্ব শ্লোকের প্রতিবাদই করা হইয়াছে। মৃত্তিকা-ঘটাকার না হইলে কেবল মৃত্তিকাই বলা

হয়; তখন মৃত্তিকাকে ঘট বলা হয় না। কিন্তু মৃত্তিকা ঘটাকার হইলে সে মৃত্তিকাকে অঘট বলা যাইবে কি প্রকারে? মৃত্তিকা ঘটাকার হইলে, সে মৃত্তিকার ঘট নাম নহেই বা বলা যাইবে কি প্রকারে? ব্রহ্ম জীব হইলে, ব্রহ্মকে অজীব কি প্রকারে বলা যাইবে? মৃত্তিকা না থাকিলেত মৃত্তিকা ঘটাকারে পরিণত হইতে পারে না। মৃত্তিকা আছে বলিয়া, মৃত্তিকা ঘটাকারে পরিণত হইতে পারে। সেই মৃত্তিকা ঘটাকার হইলে ঘটাভাব বলাও যায় না। ব্রহ্ম না থাকিলে, ব্রহ্ম জীব হইতে পারিতেন না। ব্রহ্ম আছেন বলিয়া, ব্রহ্ম জীব হইয়া থাকেন। সেই ব্রহ্ম জীব হইলে জীবাভাব বলাও যায় না। সত্য যাহা হন্, তাহাও সত্য। কনক কুণ্ডল হইলে সেই কুণ্ডলও মিথ্যা নহে। কনক সত্য বলিয়া সেই কনক কুণ্ডলাকারে পরিণত হইলে, সেই কুণ্ডলকেও সত্য বলিতে হয়। ব্রহ্ম জীব হইলে সেই জীবও মিথ্যা নহে। ব্রহ্ম সত্য বলিয়া, সেই ব্রহ্ম জীব হইলে, সেই জীবকেও সত্য বলিতে হয়। সত্যব্রহ্ম অসত্যরূপে পরিণত হইতেই পারেন না। বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে কি বলিতে হইবে, বীজই সত্য, বৃক্ষ সত্য নহে? বীজও সত্য, বৃক্ষও সত্য। ব্রহ্মও সত্য, জীবও সত্য। বীজ এবং বৃক্ষ যে প্রকারে অভেদ, ব্রহ্ম এবং জীবও সেই প্রকারেই অভেদ।

অষ্টবিংশ সিদ্ধান্ত।

সুবর্ণ অলঙ্কার হইলে, তোমার কি সুবর্ণ এবং অলঙ্কার এই দুই বোধ হয় না? ঐ প্রকার দ্বৈতবোধ কি অজ্ঞান-

বশত হইয়া থাকে? আমাদের বিবেচনায় তাহা কখনই নহে। আমাদের বিবেচনায় ঐ প্রকার দ্বৈতবোধ জ্ঞান-বশতই হইয়া থাকে। বেদান্তমতে আত্মা এবং জড় অভেদ নহে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য 'সর্ব্বমাত্মেতি' এবং—

"ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥৪৯॥"

বলায়, তাঁহার মতে আত্মা এবং জড় অভেদ, ইহাই বুঝিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"যত্রাজ্ঞানাদ্ভবেদ্দ্বৈতমিতরস্তত্র পশ্যতি।
আত্মত্বেন যদা সর্ব্বং নেতরস্তত্র চাণ্বপি ॥৫৩॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি চাত্মত্বেন বিজানতঃ।
নৈব তস্য ভবেন্মোহো নচ শোকোঽদ্বিতীয়তঃ॥৫৪॥
অয়মাত্মা হি ব্রহ্মৈব সর্ব্বাত্মকতয়া স্থিতঃ।
ইতি নির্দ্ধারিতং শ্রুত্যা বৃহদারণ্যসংজ্ঞয়া ॥৫৫॥"

উক্ত শ্লোকত্রয়ও শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব কথিত অভিপ্রায়েরই পোষকতা করিতেছে। উক্ত ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে 'অজ্ঞানাদ্ভবেদ্দ্বৈতম্' বলা হইয়াছে। ঐ শঙ্করাচার্য্যইত তাঁহার আত্মানাত্মবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মা এবং অনাত্মা-অবিদ্যা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ঐ দুই স্বীকার করাতে কি তাঁহারও দ্বৈত স্বীকার করা হয় নাই? তিনি তাঁহার আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থে আত্মা এবং অনাত্মা-অবিদ্যা অভেদ বলেন নাই।

তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার কেবলমাত্র অদ্বৈতজ্ঞান থাকিলে, অনাত্মা-অবিদ্যার বিষয়ে তিনি কিছু উল্লেখই করিতেন না। তাহা হইলে তিনি তাঁহার ঐ আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থে অবিদ্যাকেও অনাদি বলিয়া অবিদ্যাও যে নিত্যা, ইহাও প্রতিপন্ন করিতেন না। ঐ আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থে তিনি অবিদ্যা নিত্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন বলিয়া, অবিদ্যাকে অনিত্যা এবং মিথ্যা বলা যায় না।

একোনত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

বেদান্তমতে চৈতন্য-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহেই একাত্মা আছেন। চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহে একাত্মাই আছেন স্বীকার করিলে, আত্মা সর্ব্বব্যাপী ইহাও স্বীকার করিতে হয়। যদি বলা হয়, তিনি কেবল চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহেই আছেন, অন্য কোথাও নাই; তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহ গুলি অতি ঘনিষ্ট-ভাবে পরস্পর সংলগ্নাবস্থায় এক সঙ্গে অবস্থান করিতেছে না, যে সেই একাত্মা অন্য কোথাও না থাকিয়া কেবল চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহেই বিদ্যমান আছেন স্বীকার করা যাইবে। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অয়মাত্মা হি ব্রহ্মৈব সর্ব্বাত্মকতয়া স্থিতঃ।
ইতি নির্দ্ধারিতং শ্রুত্যা বৃহদারণ্যসংজ্ঞয়া॥"

বৃহদারণ্য-শ্রুতি-সম্মত উক্ত শ্লোকানুসারে এই আত্মাই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অনেক শাস্ত্রমতেই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা এবং ব্রহ্ম অভেদ বলিয়া, আত্মাও সর্ব্বব্যাপী বলিতে হয়। অথচ তুমি-আত্মা কি অনুভব করিতেছ, যে তুমি-আত্মাই চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহে এবং অন্যান্য সকল স্থানে আছ? সে অনুভবত তোমার হইতেছে না। তবে তুমি চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহে এবং অন্যান্য সকল স্থানে আছ, কি প্রকারে বলিবে? তুমি-আত্মা, কেবল একটী চেতনা-বিশিষ্ট এক প্রকার দেহে অবস্থান করিতেছই অনুভব করিতেছ। তুমি-আত্মা, আপনাকে সীমা-বিশিষ্টই জানিতেছ। তুমি-আত্মা, আপনাকে অনন্ত-বোধও করিতেছ না। তুমি-আত্মা, আপনাকে নির্ব্বিকার-বোধও করিতেছ না। তুমি-আত্মা, নিজে নিত্য কি অনিত্য, তাহাওত বুঝিতেছ না। তুমি-আত্মা, নিজে ছিলে কি না ছিলে, তাহাওত বুঝিতেছ না। তুমি আত্মা, পরে থাকিবে কি না থাকিবে, তাহাওত বুঝিতেছ না। তবে তুমি কি প্রকারে বল, আত্মা ব্যতীত যাহা, তাহাই অনিত্য-অসত্য?

ত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

শঙ্করাচার্য্য উক্ত ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলিয়াছেন বলিয়া,—

"অনুভূতোপ্যয়ং লোকোব্যবহারক্ষমোপি সন্।
অসদ্রূপো যথা স্বপ্ন উত্তরক্ষণবাধিতঃ ॥৫৬॥

স্বপ্নোজাগরণেঽলীকঃ স্বপ্নে জাগরণোপি হি।
দ্বয়মেব লয়ে নাস্তি লয়োঽপি উভয়োর্ন চ ॥৫৭॥
ত্রয়মেব ভবেন্মিথ্যা গুণত্রয়বিনির্ম্মিতং।
অস্য দ্রষ্টা গুণাতীতো নিত্যো হ্যেকশ্চিদাত্মকঃ ॥৫৮॥”

বলা যায় না। কারণ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক সমস্তই আত্মা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া, সমস্তই সত্য বলিতে হয়। কারণ বেদান্তমতে আত্মা, সত্য। জাগরণ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিও ‘সমস্ত’ ব্যতীত অন্য কিছু নহে; সুতরাং ঐ তিন অবস্থাও মিথ্যা নহে।

একত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

অতি দূরস্থিত আকাশেই নীলত্ব দর্শন কর, কিন্তু তোমার নিকটস্থ আকাশে নীলত্ব দর্শন কর না। তুমি আকাশের যেখানে নীলত্ব দর্শন করিয়া থাক, সেখানে যাইলে তথায় আর নীলত্ব দর্শন করিবে না। তোমার নিকট হইতে মরুস্থলের যে অংশ অতি দূরস্থ, তথায়ই তুমি ভ্রম-বশত জল দর্শন কর; কিন্তু সেই মরুস্থলের যে অংশ তোমার অতি নিকটস্থ, তথায়ত তোমার ভ্রম-বশত জল দর্শন হয় না। বিশ্বে তুমি অবস্থানই করিতেছ, বিশ্ব তোমার অতি নিকট, বিশ্বের সহিত তোমার অতি ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ। বিশ্ব যদি না থাকিত, তাহা হইলে তাহাতে কি প্রকারে অবস্থান করিতে? বিশ্ব যদি না থাকিত, তাহা হইলে তুমি তাহা দর্শনও করিতে না। বিশ্ব যদি তোমার নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থান করিত, তাহা হইলে তুমি বলিতে পারিতে, ভ্রম-বশত চিদাত্মাতে বিশ্ব-দর্শন হইতেছে। সেইজন্য

বলি, ভ্রম-বশত অতি দূরস্থিত আকাশে যে নীলত্ব দর্শন হয়, তাহার সহিত তোমার অতি নিকটস্থ বিশ্বের তুলনা করিয়া, তাহার ন্যায় তোমার অতি নিকটস্থ বিশ্বকে মিথ্যা বলিতে পার না। সেইজন্য বলি, তোমার নিকট হইতে মরুস্থলের যে অংশ অতি দূরস্থ, তথায় তুমি ভ্রম-বশত যে জল-দর্শন কর তাহার সহিত, তুমি যে বিশ্বে বাস কর তাহার সহিত, যে বিশ্ব তোমার অতি নিকট, সে বিশ্বের তুলনা করিয়া, তাহার ন্যায় তোমার সেই অতি নিকটস্থ বিশ্বকে মিথ্যা বলিতে পার না। নিকটস্থ স্থাণুকে কেহইত ভ্রম-বশত পুরুষ-দশন করে না। যে বিশ্বে বাস করিতেছ, তাহাও তোমার অতি নিকট; তাহা যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে তাহা তুমি দর্শনই করিতে না। তাহা যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে তাহা তুমি স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইতে না। সেই জন্যই বলি,—

"যথৈব ব্যোম্নি নীলত্বং যথা নীরং মরুস্থলে।
পুরুষত্বং যথা স্থাণৌ তদ্বদ্বিশ্বং চিদাত্মনি ॥৬১॥"

বলা সঙ্গত হয় নাই।

দ্বাত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

শঙ্করাচার্য্যের কতকগুলি শ্লোকের মতে আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তবে তিনি শূন্য, বেতাল, গন্ধর্ব্ব-পুর এবং দ্বি-চন্দ্রের বিষয় উল্লেখই বা কি প্রকারে করিয়াছেন? তাঁহার মতে যদি জগৎ নাই, তাহা হইলে তিনি জগতের উল্লেখই বা কি প্রকারে করিয়াছেন? তিনি ঐ সকলের বিষয় উল্লেখ

করিয়াছেন বলিয়া, ঐ সকল সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানও ছিল বলিতে হইবে। তিনি 'শূন্যেবৈতালো গন্ধর্ব্বাণাং পুরং' এবং 'দ্বিচন্দ্রত্বং' প্রভৃতি শব্দগুলি যে ব্যবহার করিয়াছেন, সে সকল শব্দও সত্য। যদি বলা হয় সে সকল শব্দ মিথ্যা, তাহা হইলে তাঁহার অদ্বৈত-প্রতিপাদক যত গ্রন্থে যত শ্লোক আছে, সে সমস্তও মিথ্যা। তাহা হইলে তাঁহার রচিত নানা গ্রন্থে যে আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও মিথ্যা। তাহা হইলে তাঁহার রচিত নানা গ্রন্থে যে আত্মজ্ঞান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও মিথ্যা। তাহা হইলে তাঁহার রচিত নানা গ্রন্থে যে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও মিথ্যা। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নানা গ্রন্থে সত্য বুঝাইবার জন্য যে বাক্‌শক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি অসত্য বুঝাইবার জন্যও সেই বাক্‌শক্তি ব্যবহার করিয়াছেন; অথচ তাঁহার মতানুসারেই সেই বাক্‌শক্তিকেও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মাইত সত্য। বাক্‌শক্তিত আত্মা নহে, তবে তিনি তাহা অবলম্বনে তাঁহার নানা গ্রন্থে সত্যাত্মাকে কি প্রকারে বুঝাইয়াছেন? তাঁহার মত-সম্মত অসত্য-বাক্‌শক্তি দ্বারা তাঁহার নানা গ্রন্থে তিনি যে সত্যাত্মাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আত্মজ্ঞানের বিপরীত ভাবেরই পরিচয় দিয়াছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

শঙ্করাচার্য্যের দ্বি-ষষ্টি শ্লোকানুসারে বেতাল নাইও প্রতিপন্ন করা যায় না, এবং জন-শূন্য স্থানে কখন কখন বেতাল দর্শন

করা যায় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ পূর্ব্বে অনেকেই কত দ্রব্য আছে বলিয়াই জানিতেন না, কিন্তু পরে সেই সকল যে আছে, তাহা বুঝিয়াছেন। এক্ষণে বেতাল আছে যিনি জানিতেছেন না, পরে তিনি বেতাল আছেওত জানিতে পারেন। অনেকেই পূর্ব্বে কত দ্রব্য দর্শন করেন নাই, পরে যে তাঁহারা সেই সকল দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন না, এ কথা তুমি বলিতে পার না। এক্ষণে বেতাল যিনি দর্শন করিতেছেন না, পরে কখন তিনি বেতাল দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন না, এ কথা কখনই বলা যায় না। জগতে এরূপ কত জন্তু আছে, যাহাদের আমরা কখন দেখি নাই। যাহাদের নামগুলি পর্য্যন্ত আমরা জানি না। তাহারা আছে, তাহাও আমরা জানি না। সেই প্রকার বেতাল নাই, তুমি ইহা কখনই সিদ্ধান্ত করিতে পার না। অনেক তন্ত্র-পুরাণে বলেন, বেতাল আছে। জন-শূন্য স্থানে ভ্রম-দৃষ্ট বেতালের সহিতও তুমি, এই দর্শন-স্পর্শন দ্বারা জ্ঞাত, এই স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান জগতের কখনই তুলনা করিতে পার না। জগৎ যে আছে, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেও প্রমাণ করা হইয়াছে। বেতালের অস্তিত্ব যে প্রকারে প্রমাণ করা হইয়াছে, সেই প্রকারেই শূন্যস্থ গন্ধর্ব্বদিগের 'পুর'ও প্রমাণ করা যাইতে পারে। নানা পুরাণ-তন্ত্রে গন্ধর্ব্বদিগের 'পুরের' ও 'গন্ধর্ব্ব-দিগের' উল্লেখ আছে। ঐ সকল গ্রন্থের মতে গন্ধর্ব্বদিগের 'পুর' ও 'গন্ধর্ব্বগণ' মিথ্যা নহে। ভ্রম-দৃষ্ট গন্ধর্ব্বপুরের সহিতও এই জগতের তুলনা হইতে পারে না। প্রকৃত গন্ধর্ব্বপুরও হয়ত কেহ কখন দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ জগৎ প্রায় সকলেই দর্শন করিতেছেন। যে সকল লোক জন্ম-কাল হইতে

অন্ধ, তাহারা জগৎ দর্শন না করিলেও জগৎ যে আছে, ইহা তাহারা নিশ্চয়ই বোঝে। কারণ তাহারা এই জগতে বাস করিতেছে, এই জগতে তাহাদের অঙ্গ নিয়তই স্পৃষ্ট রহিয়াছে. সুতরাং তাহাদের সেই ‘আধার’ জগতের অস্তিত্ব কি প্রকারেই বা অস্বীকার করিবে।

চতুস্ত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

চন্দ্র নাই, এ কথাও বলা যায় না। কারণ যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি আকাশে চন্দ্র দর্শন করিয়া থাকেন। জগতে অনেক লোকেরই চক্ষু আছে; সুতরাং জগতের অনেক লোকই আকাশে চন্দ্র দর্শন করিয়া থাকেন। আকাশের চন্দ্রালোকে এই জগৎও আলোকিত হয়, তাহা কোন্ দৃষ্টি-সম্পন্ন-ব্যক্তি না দেখিয়াছেন? এক-চন্দ্র এবং সেই এক-চন্দ্রের শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল। কোন প্রকার চক্ষু-রোগ-বশত শুক্লপক্ষে আকাশে এক-চন্দ্রের প্রকাশে দ্বি-চন্দ্র দর্শন হয় বটে, কিন্তু ঐ প্রকার রোগেও প্রকৃত-পক্ষে আকাশে এক-চন্দ্র প্রকাশিত না থাকিলেত দ্বি-চন্দ্র দর্শন করা যায় না। এক-চন্দ্রই দ্বিতীয়-চন্দ্র দর্শনের কারণ। ‘এক’ বহু হইবারও অনেক প্রমাণ আছে। কোন কোন শ্রুতি এবং বেদান্ত অনুসারে একই আত্মা। কিন্তু আমি-আত্মা, আমার এই দেহ ব্যতীত অন্যান্য দেহেও আছি কি বোধ করিতেছি? আমার ন্যায় প্রত্যেকেই, তাঁহার দেহ ব্যতীত তিনি অন্যান্য দেহে আছেন, বোধ করেন না। সুতরাং শ্রৌত এবং বৈদান্তিকমতে একাত্মারই বহু-দেহে বহুত্ব প্রতিপন্ন করা হইল। এক-চন্দ্র এবং এক-জগৎ যে সত্য,

তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। তোমার মতে কোন চক্ষু-রোগ-বশত এক-চন্দ্রের সহিত যে দ্বিতীয়-চন্দ্র দর্শন করা হয়, সেই দ্বিতীয়-চন্দ্রও যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে এই এক-জগৎ যে মিথ্যা, ইহা কখনই বলিতে পার না। কারণ অনেক-বারই প্রমাণ করা হইয়াছে, এই যে 'এক-জগৎ,' যাহাতে আমরা বাস করিতেছি, তাহা সত্য। তোমার ঐ দ্বি-চন্দ্র দর্শনের উপমানুসারে যদ্যপি এই জগতের সহিত অপর জগৎ প্রকাশিত দেখিতাম, তাহা হইলে বরঞ্চ তুমি নিজ মতানুসারে সেই দ্বিতীয়-জগৎ মিথ্যা বলিতে পারিতে। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম-নামাবলী-মালার একোনবিংশ শ্লোকে আছে, 'ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি।' সুতরাং ঐ পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতেই যে জগৎ মিথ্যা নহে, সে বিষয় সন্দেহ কি আছে। তাই বলি,—

"যথৈব শূন্যেবৈতালো গন্ধর্ব্বাণাং পুরং যথা।
যথাকাশে দ্বিচন্দ্রত্বং তদ্বৎ সত্যে জগৎস্থিতঃ ॥৬২॥"

বলিয়া জগতের অসত্যতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা যুক্তি সঙ্গত হয় নাই।

পঞ্চত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

শঙ্করাচার্য্যের ত্রি-ষষ্টি শ্লোকানুসারে জল ও তরঙ্গ অভেদ। তাম্র ও তাম্র-পাত্র যেমন অভেদ বুঝিতে হয়, তদ্রূপ ঐ শ্লোকানুসারেই আত্মা ও ব্রহ্মাণ্ড অভেদ বুঝিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন,—

"যথা তরঙ্গকল্লোলৈর্জ্জলমেব স্ফুরত্যলম্।
পাত্ররূপেণ তাম্রং হি ব্রহ্মাণ্ডৌঘৈস্তথাত্মতা॥"

ঐ মহাত্মাই পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"ঘটনাম্না যথা পৃথ্বী পটনাম্না হি তন্তবঃ।
জগন্নাম্না চিদাভাতি জ্ঞেয়ং তত্তদভাবতঃ॥"

আমরা বলি,—পৃথ্বী ঘটাকার হইলে, তবেত তাহার নাম ঘট্ হয়। ঘট্, এই নাম উচ্চারণ করিলে, ঘট্ ও পৃথ্বী, এই দুই বোধই হয়। তবে এই দুই অভেদ, এ বোধ হয় বটে। পৃথ্বীই ঘট্, এ বোধও হয় বটে। পট্, এই নাম উচ্চারণ করিলে, পট্ ও তন্তুনিচয়, এই দুই প্রকার বোধই হয়। তবে এই দুই অভেদ, এ বোধ হয় বটে। তন্তুনিচয়ই পট্, এ বোধও হয় বটে। চিৎ জগদাকার না হইলে, চিৎ জগন্নামে অভিহিত হন্ না। জগৎ, এই নাম উচ্চারণ করিলে, জগৎ ও চিৎ, এই দুই প্রকার বোধই হয়। তবে এই দুই অভেদ, এ বোধ হয় বটে। চিৎই জগৎ, এ বোধও হয় বটে। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতির চতুঃষষ্টি শ্লোকানুসারে জগৎ মিথ্যা, কি প্রকারে বলা যায়? সেমতে চিৎ সত্য, সেই চিৎইত জগদাকার। অতএব আমি সেই চিজ্জগৎ মিথ্যা কি প্রকারে বলি? আমাকে সেই চিজ্জগৎ সত্যই স্বীকার করিতে হয়।

ষট্ত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

তাম্র-পাত্র গলাইলে যেমন তাম্রই থাকে, তদ্রূপ জগৎ লয় হইলে কেবল চিদাত্মাই থাকিবেন। যেমন তাম্র-পাত্র গলাইলে

সেই তাম্র-পাত্রের অভাব হয় বটে, তবে তখন তাম্রের অভাব হয় না, তাম্র বিদ্যমান থাকে ; তদ্রূপ জগতের লয় হইলে জগতের অভাব হয় বটে, তবে তখন চিদাত্মার অভাব হয় না, চিদাত্মা বিদ্যমান থাকেন।

সপ্তত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

জনও আত্মা। অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চষষ্টী শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"সর্ব্বোঽপি ব্যবহারস্তু ব্রহ্মণা ক্রিয়তে জনৈঃ।"

জনগণ সর্ব্ব-ব্যবহারই ব্রহ্মের বিধি অনুসারে করিয়া থাকেন। সুতরাং কোন জনাত্মাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। যে ঘট্ দর্শন করে, যাহার ঘট্ বোধ আছে, তাহার মৃত্তিকাই যে ঘট্, এ বোধও আছে। ঘট্ই যে মৃত্তিকা, তাহার এ বোধের অভাব আছে বলা যায় না। মৃত্তিকা যেমন ঘটাকার হইয়াছে, তদ্রূপ শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে যদ্যপি ব্রহ্মাত্মাই জগদাকার হইয়া থাকেন ; তাহা হইলে যে ব্যক্তি জগৎ দর্শন করিতেছে, যাহার জগৎ বোধ আছে, তাহার ব্রহ্মই যে জগৎ, এ বোধও আছে। জগৎই যে ব্রহ্ম, তাহার এ বোধের অভাব আছে বলা যায় না। অতএব সেইজন্য—

"সর্ব্বোঽপি ব্যবহারস্তু ব্রহ্মণা ক্রিয়তে জনৈঃ।
অজ্ঞানান্ন বিজানন্তি মৃদেবাহি ঘটাদিকম্॥"

বলিলেই হইত।

অষ্টত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের ষট্ষষ্টী শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"কার্য্যকারণতা নিত্যং ভাতি ঘটমৃদোর্যথা।
তথৈব শ্রুতিযুক্তিভ্যাং প্রপঞ্চ ব্রহ্মণোরিহ॥"

মৃত্তিকা যখন ঘট্ হইতে থাকে, তখনই কার্য্য বিদ্যমান থাকে। ঘট্-গঠন সমাপ্ত হইলে কার্য্য আর বিদ্যমান থাকে না। তবে ঘট্, কার্য্যের পরিচায়ক বটে। ব্রহ্ম যখন প্রপঞ্চাকার হন্, তখন অবশ্য কার্য্য দ্বারায় হন্। যে সময় ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকার হইতে থাকেন, তখন অবশ্যই কার্য্য বিদ্যমান থাকে। উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে প্রপঞ্চ-গঠন সমাপ্ত হইলে, আর কার্য্য বিদ্যমান থাকে না বলিতে হয়; অথচ জগৎ-প্রপঞ্চে কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে, প্রত্যক্ষ করা হইতেছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মই জগদাকার। অথচ তাঁহারই মতে জগৎ অনিত্য। যখন জগৎ হয়, অবশ্যই সে সময় কার্য্য ও কারণেরও প্রয়োজন হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতে 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলা হইয়াছে বলিয়া, কার্য্য এবং কারণও আত্মা বলিতে হয়। যদি অবিদ্যাই কার্য্য-কারণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আত্মা-ব্রহ্ম জগদাকার হইবার কার্য্য ও কারণ, অবশ্যই অবিদ্যা বলিতে হয়। তাহা হইলে আত্মা-ব্রহ্মও অবিদ্যার অধীন, অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আর যদি বলা হয়, অবিদ্যাও ব্রহ্মের বিকাশ, তাহা হইলে অবিদ্যাও ব্রহ্ম, অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অবিদ্যাও ব্রহ্ম স্বীকার করিলে, ব্রহ্মও বিকার স্বীকার করিতে

হয়। কারণ বেদান্তমতে অবিদ্যাই অজ্ঞান। সেই অবিদ্যা-অজ্ঞানই বিষম-বিকার। বেদান্ত মতানুসারে সেই বিষম-বিকার দ্বারায় আত্মা, জীব।

একোনচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের সপ্তষষ্টী শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"গৃহ্যমাণে ঘটে যদ্বন্মৃদেব যাতি বৈ বলাৎ।
বীক্ষ্যমাণে প্রপঞ্চেপি ব্রহ্মৈব ভাতি ভাস্করম্॥"

কিন্তু ঘটাকার থাকিতে, কেবল মৃত্তিকাই কি দর্শন করা হয়? মৃত্তিকা ঘটাকার থাকিতে, মৃত্তিকা ও ঘট উভয়ই দর্শন করা হয়। ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকার থাকিতে, কেবল ব্রহ্মই কি দর্শন করা হয়? ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকার থাকিতে, ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চ উভয়ই দর্শন করা হয়।

চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের অষ্টষষ্টী শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"স দৈবাত্মা বিশুদ্ধোঽস্তি ন শুদ্ধো ভাতি বৈ সদা।
যথৈব দ্বিবিধা রজ্জু র্জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনোঽনিশম্॥"

শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালার একবিংশ শ্লোকে আছে,—'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' বেদান্তমতের বিবিধ গ্রন্থানুসারে

আত্মা-ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন। বেদান্তমতে সেই নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-আত্মারই আত্মজ্ঞান আছে। সেই আত্মা নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন বলিয়া, তিনি অজ্ঞানীও নহেন বলিতে হয়। সুতরাং তাঁহার ভ্রম আছে, ইহাও স্বীকার করা যায় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বলিয়া, সেই ব্রহ্ম-জীবাত্মাও অজ্ঞানী নহেন। সেইজন্য সেই ব্রহ্ম-জীবাত্মার ভ্রম-বশত রজ্জুকে সর্প দর্শনও হইতে পারে না। তাঁহার রজ্জুকে সর্প-বোধও হইতে পারে না। সেইজন্যই তিনি আত্মাকে সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ-বোধ করেন বলিতে হয়। সেইজন্যই তিনি আত্মাকে কখনই অশুদ্ধ-বোধ করেন নাও বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যইত বলিয়াছেন,—'সর্ব্বমাত্মেতি।' শঙ্করাচার্য্যইত বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥৪৯॥"

শঙ্করাচার্য্যইত তাঁহার ব্রহ্মনামাবলী-মালার একোনবিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন,—'ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি।' তাহা হইলে রজ্জুও সেই আত্মা-ব্রহ্ম, সর্পও সেই আত্মা-ব্রহ্ম। কারণ পূর্ব্বেই 'ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি' বলা হইয়াছে। সুতরাং রজ্জুকে রজ্জ্বাকার-ব্রহ্মাত্মা ও সর্পকে সর্পাকার-ব্রহ্মাত্মা বলা যায়। কারণ সর্পের শরীরও পঞ্চ ভূতের বিকাশ। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকে ব্রহ্ম ও সর্ব্ব-ভূত অভেদ বলা হইয়াছে বলিয়া, সর্পের পঞ্চ-ভূতের বিকাশ যে শরীর, তাহাও ব্রহ্ম। 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলা হইয়াছে বলিয়া, সর্পও আত্মা। আত্মাইত ব্রহ্ম,—সুতরাং

সর্পও ব্রহ্ম। আত্মা-ব্রহ্ম রজ্জুও বটেন, আর তিনি সর্পও বটেন। পূর্ব্বকথিত শঙ্করাচার্য্য রচিত প্রমাণাবলী অনুসারে বিশুদ্ধ এবং অশুদ্ধ উভয়কেই সেই 'এক' আত্মা-ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে।

একচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের একোনসপ্ততি শ্লোকে,—

"যথৈব মৃণ্ময়ঃ কুম্ভস্তদ্বদ্দেহোঽপি চিন্ময়ঃ।
আত্মানাত্মবিভাগোঽয়ং মুধৈব ক্রিয়তে বুধৈঃ॥"

বলায়, আত্মা এবং অনাত্মার বিভাগ অস্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা এবং অনাত্মা যে অভেদ, ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সেইজন্য ঐ শ্লোকে আত্মানাত্ম বিভাগ রাখিবার প্রয়োজন নাই বলা হইয়াছে। ঐ শ্লোকের প্রথমাংশে কুম্ভ মৃন্ময় ও দেহ চিন্ময় স্বীকার করা হইয়াছে। যে প্রকারে আনন্দ ও আনন্দময় অভেদ নয়, সেই প্রকারেই মৃৎ এবং মৃণ্ময় অভেদ নয় বলা যাইতে পারে। যাঁহার আনন্দ আছে, অথবা যাঁহাতে আনন্দ ব্যাপ্ত, তাঁহাকেই আনন্দময় বলা যায়। কিন্তু আনন্দ অর্থে, যাঁহার আনন্দ আছে, অথবা যাঁহাতে আনন্দ ব্যাপ্ত বলা যায় না। মৃণ্ময় অর্থে, মৃৎ বা মৃত্তিকা বলা যাইতে পারে। কিন্তু মৃৎ অর্থে, যাহাতে মৃৎ ব্যাপ্ত বলা অতি অসঙ্গত। কুম্ভ যে নিজে মৃৎ, সেইজন্যই তাহাকে মৃণ্ময় বলা সঙ্গত নহে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থাবলীর অনেক স্থলেই আত্মা বা চিৎ ব্যতীত দেহের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার মতানুসারে বুঝিতে হয়, দেহও আত্মা বা

চিৎ ব্যতীত অপর কিছু নহে। শঙ্করাচার্য্য কুম্ভকে যেভাবে মৃণ্ময় বলিয়াছেন, তিনি সেইভাবেই দেহকে চিণ্ময় বলিয়াছেন, তাহার একোনসপ্ততি শ্লোকানুসারেই অবগত হওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য কুম্ভকে মৃণ্ময় বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কুম্ভ কি মৃৎ নয়? শঙ্করাচার্য্য দেহকে চিন্ময় বলিয়াছেন বটে, কিন্তু দেহ কি চিৎ নয়? শঙ্করাচার্য্যের নির্দ্দেশিত মৃণ্ময়-কুম্ভকে যে কারণে মৃদাকার বলা যায়, সেই কারণেই তাঁহার নির্দ্দেশিত চিন্ময়-দেহকেও চিদাকার বলা যাইতে পারে। কোন কোন পুরাণমতে চিন্ময়-আকার ও চিদাকার অনিত্য নয়। শঙ্করাচার্য্যের মতেই চিন্ময়-দেহ বা আকার যে অনিত্য।

দ্বিচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

শঙ্করাচার্য্যেরই আত্মানাত্মবিবেক নামে এক গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে তিনি তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একোনসপ্ততি শ্লোকে আত্মানাত্ম-বিভাগের প্রয়োজন নাই কি প্রকারে বলিয়াছেন? তাঁহার অনেক গ্রন্থের অনেক স্থলে পৃথক্‌ভাবে আত্মা এবং অনাত্মা-অবিদ্যা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একোনসপ্ততি শ্লোকানুসারে আত্মা এবং অনাত্মা অভেদই বুঝিতে হয়। বেদান্তমতে অনাত্মাইত অবিদ্যা। তাহা হইলে উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা এব· অনাত্মা-অবিদ্যাও অভেদ বুঝিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থানুসারে নিত্য-সত্য-আত্মার ন্যায়, অনাত্মা-অবিদ্যাও নিত্য-সত্য প্রতিপন্ন

করা যায়। সেইমতে অবিদ্যাকে অনাদি বলা হইয়াছে। সেমতে বলা হইয়াছে,—

"অবিদ্যা কেনাপি ভবতীতি চেৎ।
অবিদ্যা ন কেনাপি ভবতীতি চেৎ॥"

সুতরাং উক্ত দুই প্রমাণানুসারে অনাত্মা-অবিদ্যাও নিত্য-সত্য প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

ত্রিচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

শঙ্করাচার্য্য অপরোক্ষাভূতি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"সর্পত্বেন যথা রজ্জু রজতত্বেন শুক্তিকা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা॥৭০॥
ঘটত্বেন যথা পৃথ্বী পটত্বেনৈব তন্তবঃ।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা॥৭১॥
কনকং কুণ্ডলত্বেন তরঙ্গত্বেন বৈজলম্।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা॥৭২॥
পুরুষত্বেন বৈ স্থাণু র্জলত্বেন মরীচিকা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা॥ ৭৩॥
গৃহত্বেনৈব কাষ্ঠানি খড়্গত্বেনৈব লোহতা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা॥ ৭৪॥
যথা বৃক্ষবিপর্য্যাসো জলাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৫॥

পোতেন গচ্ছতঃ পুংসঃ সর্ব্বং বিচঞ্চলং ভবেৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৬ ॥
পীতত্বং হি যথা শুভ্রে দোষাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৭ ॥
চক্ষুর্ভ্যাং ভ্রমশীলাভ্যাং সর্ব্বং ভাতি ভ্রমাত্মকম্।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৮ ॥
অলাতং ভ্রমণেনৈব বর্ত্তুলং ভাতি সূর্য্যবৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৯ ॥
মহত্ত্বে সর্ব্ববস্তূনামণুত্বন্ত্বতিদূরতঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮০ ॥
সূক্ষ্মত্বে সর্ব্বভাবানাং স্থূলতা চোপনেত্রতঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮১ ॥
কাচভূমৌ জলত্বং বা জলভূমৌ হি কাচতা।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮২ ॥
যদ্বদগ্নৌ মণিত্বং হি মণৌ বা বহ্নিতা পুনঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৩ ॥
যথৈব দিগ্বিপর্য্যাসো মোহাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৪ ॥
অভ্রেষু সৎসু ধাবৎসু সোমো ধাবতি ভাতি বৈ।
তদ্বদাত্মনি দেহতং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৫ ॥

যথা শশী জলে ভাতি চঞ্চলত্বেন কর্হিচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৮৬॥"

ঐ সকল শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী একোনসপ্ততি শ্লোকে দেহকে চিন্ময় বলা হইয়াছে। অথচ কুম্ভকে মৃণ্ময় বলিয়া, সেই উপমা দ্বারা দেহকে চিন্ময় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। উক্ত একোন-সপ্ততি শ্লোকের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে, বাস্তবিক কুম্ভ মৃণ্ময় নহে, কিন্তু উহা মৃৎ। ঐ শ্লোকেরই আলো-চনায় দেহ চিৎ, ইহাও প্রমাণ করা হইয়াছে। দেহ চিৎ। সুতরাং উক্ত শ্লোকাবলী দ্বারা দেহকে অনিত্য বলা সঙ্গত হয় নাই। চিদ্দেহকে নিত্য বলাই উচিত। শঙ্করাচার্য্যের মতে চিৎ, আত্মা। আত্মা, শ্রুতি ও বেদান্তমতে নিত্য। নিত্যই সৎ, অতএব আত্মাও সৎ। সদাত্মা-চিৎ ও দেহ অভিন্ন প্রতিপন্ন করা হইয়াছে বলিয়া, দেহকেও সদাকার বলা যায়। অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের ত্রিংশ শ্লোকানুসারে আত্মা, 'সদাকারং'। শঙ্করাচার্য্যের অনেক শ্লোকানুসারে আত্মা আকারও নহেন, এবং আত্মার আকার নাই বলিয়া, সদাকার অর্থে, সৎই আকার বলাও যায় না। সদাকার অর্থে, যাঁহার আকার সৎ বলাও যায় না। কিন্তু ঐ ত্রিংশ শ্লোকে আত্মাকেই সদাকার বলা হইয়াছে বলিয়া, সদাকার অর্থে, সৎই আকার, ইহাও বলা যায়। ঐ শ্লোকানুসারে সদাকার অর্থে, যাঁহার আকার সৎ, এ অর্থও করা যায়। শ্রুতি, বেদান্ত এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রেই আত্মাকে সৎ বলা হইয়াছে বলিয়া, উক্ত ত্রিংশ শ্লোকে আত্মাকে 'সদাকারং' বলায়, আত্মা সদাকারই প্রতি-

পন্ন হইয়াছে, কিন্তু আত্মা সৎ-সাকার প্রতিপন্ন হয় নাই। ঐ ত্রিংশ শ্লোকে আত্মাকে '**সদাকারং**' বলায়, আত্মার আকার সৎ অথবা আত্মা সদাকার-বিশিষ্ট, এই অর্থ করিলে আত্মা সৎ সাকারও প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বেদান্তমতে অদ্বৈতবাদ; সেইজন্য আত্মা সৎ এবং তাহার আকারও সৎ প্রতিপন্ন হইলে, সদাত্মা-সাকার ও সদাকার অভেদই প্রতিপন্ন করা হয়। ফলও তাহার ত্বক্ যেভাবে অভেদ, সেইভাবেই সদাত্মা-সাকার ও সদাকার অভেদ বলা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একবিংশ শ্লোকানুসারে '**আত্মা নিত্যো হি সদ্রূপো**'। সৎ অর্থে, নিত্য। সৎ অর্থে, সত্য। সদ্রূপঃ অর্থে, নিত্য-সত্য-রূপ। শঙ্করাচার্য্যের মতেই যে দেখিতেছি আত্মা,—নিত্য-সত্য-রূপ। সুতরাং আত্মা অদেহ কিম্বা অনাকার বলা যায় না। উক্ত শঙ্করীয়-প্রমাণানুসারেই আত্মা, সদ্দেহ এবং সদাকার বলা যাইতে পারে। সুতরাং পৌরাণিক মতে পরমেশ্বর-শ্রীকৃষ্ণ যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। বেদান্তমতে আত্মা,—সৎ, চিৎ এবং আনন্দ, এই তিনই বটেন। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি অনুসারে আত্মা সৎ এবং চিৎ। তাঁহার আত্ম-পূজা অনুসারে আত্মাই আনন্দ। তিনি আত্ম-পূজায় বলিয়াছেন,—

"আনন্দে সচ্চিদানন্দে নির্ব্বিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিতোর্দ্বিতীয়াভাবে বৈ কথং পূজা বিধিয়তে ॥১॥"

পরমহংস গোবিন্দ-পাদাচার্য্যের অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থানুসারে আমি-আত্মাই আনন্দ। ঐ গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে আছে,—

"অহমানন্দসত্যাদিলক্ষণঃ কেবলঃ শিবঃ।"

শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালা নাম্নী পুস্তিকা অনুসারেও আমি-আত্মা সচ্চিদানন্দ-রূপ। ঐ গ্রন্থে বলা হইয়াছে,—

"অসঙ্গোঽহমসঙ্গোঽহমসন্দেহঃ পুনঃ পুনঃ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ২ ॥"

উক্ত শ্লোক সকল পর্য্যালোচনা করিলে, আত্মাই যে আনন্দ, ইহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে। আবার শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালাতে আত্মা 'সচ্চিদানন্দরূপঃ' পর্য্যন্ত। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে ব্রহ্মনামাবলী-মালা গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোকে, আমি-আত্মাইত 'সচ্চিদানন্দরূপোঽহং' বলিয়াছে। ঐ গ্রন্থানুসারে আমি-আত্মাই সচ্চিদানন্দ-রূপ বলিয়া, আমি-আত্মাই সদ্রূপ বা সদাকার, আমি-আত্মাই চিদ্রূপ বা চিদাকার, আমি-আত্মাই আনন্দ-রূপ বা আনন্দাকার। আমি-আত্মা নিত্য বলিয়া, আমি নিত্য-চিদ্রূপ, আমি নিত্য-চিদাকার, আমি নিত্যানন্দ-রূপ, আমি নিত্যানন্দাকার। শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বাণ-ষট্‌কম্ নামক গ্রন্থ ষষ্ঠ শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি ঐ গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের শেষাংশেই—

"চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্"

বলিয়াছেন। তাঁহার ঐ গ্রন্থে 'অহং' শব্দ, আত্মাবাচক। সুতরাং আমি-আত্মা 'চিদানন্দরূপঃ' বলায়, আমি-আত্মা চিদ্রূপও বটে, আমি-আত্মা আনন্দ-রূপও বটে। রূপ ও আকার অভিন্ন বলিয়া, রূপ ও দেহ অভিন্ন বলিয়া, আমি-আত্মাই চিদাকার,

আমি-আত্মাই চিদ্দেহ, আমি-আত্মাই আনন্দাকার, আমি-আত্মাই আনন্দ-দেহ।

চতুশ্চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে, আমি যদি যথার্থই ব্রহ্ম, সৎ ও চিৎ হই, তাহা হইলে আমি-আত্মাতে অবিদ্যার প্রভাব বিস্তার হওয়াই অসম্ভব। কারণ শ্রুতি-বেদান্তমতে আমি-আত্মাত নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন। সুতরাং নিত্য-আত্মজ্ঞানী আমি-আত্মা সম্বন্ধে,—

"এবমাত্মন্যবিদ্যাতো দেহাধ্যাসো হি জায়তে।
স এবাত্মপরিজ্ঞানাৎ লীয়তে চ পরমাত্মনি ॥৮৭॥"

বলা সঙ্গত নহে। ঐ শ্লোকানুসারে অবিদ্যা-জনিত ভ্রম-বশত নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-ব্রহ্মাত্মার যদি আপনাকে দেহ-বোধ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে অঞ্জনবিশিষ্ট সবিকার-পুরুষই বলিতে হয়। তাহা হইলে তিনি অবিদ্যার অধীন বলিতে হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করিয়া, অবিদ্যার শ্রেষ্ঠতাই স্বীকার করা উচিত। আমাদের মতে ব্রহ্মাত্মার উপর কখনই অবিদ্যার আধিপত্য হইতে পারে না। অবিদ্যার আধিপত্য যাঁহার উপর আছে, তিনি নিশ্চয়ই অব্রহ্মাত্মা। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যেরই আত্ম-ষটক্, নির্ব্বাণ-ষটক্ ও হস্তামলক্ নামক গ্রন্থত্রয় পাঠে, আমি-ব্রহ্মাত্মার সহিত অনাত্মা-অবিদ্যার কোন সম্বন্ধ নাই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং পরমহংস

শঙ্করাচার্য্যের উক্ত তিন গ্রন্থানুসারে আমি-ব্রহ্মাত্মা নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জনই প্রতিপন্ন করা যায়।

পঞ্চচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের অষ্টাশীতি শ্লোকে বলিয়াছেন,--

"সর্ব্বমাত্মতয়া জ্ঞানং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
অভাবাৎ সর্ব্বভাবানাং দেহস্য চাত্মতা কুতঃ॥"

যাঁহাতে কোন ভাব নাই, তিনি কোন ভাবাত্মক গ্রন্থও রচনা করিতে পারেন না। একখানি গ্রন্থে আবার নানা ভাব থাকে। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ যিনি রচনা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ভাব-বিহীন নহেন। তিনি ভাব-বিহীন নহেন বলিয়া, স্থাবর-জঙ্গম-জগৎ তাঁহার সম্বন্ধে নাই বলিতে পার না। তিনি ভাব-বিহীন নহেন বলিয়া, তাঁহার দেহ নাই বলিতে পার না। উক্ত অষ্টাশীতি শ্লোকানুসারে সর্ব্ব-ভাবের অভাব ব্যতীত দেহের আত্মতার অভাব হয় না। বাক্য-স্ফূর-ণের অবলম্বন, মুখ ও মুখস্থিত রসনা। অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে এবং তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থে, তাঁহার কত বাক্যই রহিয়াছে। অতএব ঐ সকল গ্রন্থের রচয়িতা শঙ্করাচার্য্যের কোন প্রকার দেহ ছিল না, বলিতে পার না। অষ্টাশীতি শ্লোকানুসারে বোঝা যায়, সর্ব্ব-স্থাবর-জঙ্গম-জগৎকে ততকাল আত্মা-বোধ করা যায়, যতকাল না সর্ব্ব-ভাবের অভাব হয়। সেইজন্য দেহকেও ততকাল আত্মা-বোধ হয়, যতকাল না

সর্ব্ব-ভাবের অভাব হয়। দেহ বোধ থাকিতে, দেহের আত্ম-তার অভাব হইতে পারে না। দেহের সহিত সংস্রব থাকিতেও আপনাকে বিদেহী বোধ হয় না।

ষট্‌চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষানুভূতির একোন-নবতি শ্লোকে পরমহংস শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"আত্মানং সততং জানন্ কালং নয় মহামতে।
প্রারব্ধমখিলং ভুঞ্জন্ নোদ্বেগং কর্ত্তুমর্হসি ॥"

উক্ত শ্লোকে আত্মাকে অবগত হইয়া অনুদ্বিগ্নভাবে সমস্ত প্রারব্ধ ভোগ করিতে বলা হইতেছে। ঐ শ্লোকানুসারে আত্মজ্ঞানের উদয় হইলেও প্রারব্ধ ভোগ হয়, বুঝিতে হয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যেরই নবতি ও একনবতি শ্লোকে,—

"উৎপন্নেপ্যাত্মবিজ্ঞানে প্রারব্ধং নৈব মুঞ্চতি।
ইতি যৎ শ্রূয়তে শাস্ত্রাৎ তন্নিরাক্রিয়তেঽধুনা ॥
তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে।
দেহাদীনামসত্ত্বত্তু যথা স্বপ্নো বিবোধতঃ ॥"

বলায়, তাঁহার একোন-নবতি শ্লোক খণ্ডন করা হইয়াছে।

সপ্তচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

প্রারব্ধ কি? অপরোক্ষানুভূতির দ্বি-নবতি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"কর্ম্ম জন্মান্তরীয়ং যৎপ্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতম্।
তত্তু জন্মান্তরাভাবাৎ পুংসো নৈবাস্তি কর্হিচিৎ॥"

যাহা ছিল এবং যাহা আছে, তাহার আবার জন্ম হইবে কি প্রকারে? বেদান্তমতে আত্মা নিত্য বলিয়া, আত্মা অজ। সুতরাং তাঁহার জন্মান্তব কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? ঐ বেদান্তানুসারেই আত্মা নিগুর্ণ-নিষ্ক্রিয় বলিয়া, তাঁহার জন্মান্তরীয় কর্ম্ম বা প্রারব্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে না। যে আত্মার জন্মান্তর এবং জন্মান্তরীয় কর্ম্ম বা প্রারব্ধ নাই, তাহার জন্মান্তর এবং জন্মান্তরীয় কর্ম্ম বা প্রারব্ধের অভাবই বা হইবে কি প্রকারে? যদি বল, অজ্ঞানবশত আত্মার জন্মান্তর আছে বোধ হয়, সেইজন্যই আত্মা আপনাকে 'জ' বোধ করেন; যদি বল, অজ্ঞানবশত আত্মার জন্মান্তরীয় কর্ম্ম আছে বোধ হয়, এবং সেই অজ্ঞানবশতই তাঁহার জন্মান্তরীয় কর্ম্ম বা প্রারব্ধ ভোগ হয়; তাহা হইলে বাস্তবিক তাঁহার সেই জন্মান্তরীয় কর্ম্ম বা প্রারব্ধ ভোগ না থাকিলেও, কিন্তু সেই আত্মাকে বেদান্ত মতানুসারে নিত্য, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, নিগুর্ণ ও নিষ্ক্রিয় বলা উচিত হয় নাই।

অষ্টচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের ত্রি-নবতি শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"স্বপ্নদেহো যথাধ্যস্তস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ।
অধ্যস্তস্য কুতো জন্ম জন্মাভাবে হি তৎ কুতঃ॥"

স্বপ্ন-দর্শন সময়ে কাহারও স্বপ্নকে মিথ্যা বোধ হয় না, তখন স্বপ্নকে সত্যই বোধ হয়। জাগরণে,—স্বপ্নে যে সকল দর্শন হইয়াছিল, সে সকল মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয় সত্য; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য,—

"স্বপ্নদেহো যথাধ্যস্তস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ।
অধ্যস্তস্য কুতো জন্ম জন্মাভাবে হি তৎ কুতঃ॥"

জাগ্রতাবস্থাতেইত বলিয়াছিলেন। স্বপ্নাবস্থায় থাকিয়া যেমন স্বপ্ন অসত্য বোধ হয় না, তদ্রূপ জাগরণাবস্থায় থাকিয়াও, জাগরণ কাহারও মিথ্যা বোধ হইতে পারে না। সে অবস্থায় যে সকল দর্শন. স্পর্শন ও অনুভব করা যায়, অথবা সে অবস্থায় যে সকল কার্য্য করা যায়, সে সমস্তকেও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না।

একোনপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের চতুর্নবতি শ্লোকে পরমহংস শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্ভাণ্ডস্যেব দৃশ্যতে।
অজ্ঞানঞ্চেতি বেদান্তৈস্তস্মিন্নষ্টে ক্ব বিশ্বতা॥"

যাঁহার আদি নাই, তাঁহার অন্তও নাই। যাঁহার আদি নাই, তাঁহাকে অজই বলিতে হয়। অজ যিনি, তিনি নিশ্চয়ই অমর। যিনি অনাদি, অ ᅟ ও অমর, তিনি নিশ্চয়ই নিত্য। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যই তাঁহার আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থে অবিদ্যাকে অনাদি বলিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে অবিদ্যাকে

অনাদি বলায়, অবিদ্যাকেও সেইজন্য নিত্য বলিতে হয়। নিত্য যাহা, তাহা নষ্ট হয় না। সেইজন্য অবিদ্যাও নষ্ট হয় না। বেদান্তমতের অনেক গ্রন্থেই অবিদ্যাকে অজ্ঞান বলা হইয়াছে। সেইজন্য অজ্ঞানও নিত্য বলিয়া, তাহাও নষ্ট হয় না। বিশ্বের উপাদান অজ্ঞানও নিত্য প্রমাণ করা হইয়াছে। সুতরাং সেই বিশ্বের উপাদান অজ্ঞান নষ্ট হয়, বলিতে পারা যায় না। বিশ্বের উপাদান অজ্ঞান নষ্ট হয় না বলিয়া বিশ্বাভাব বলিতে পার না; সেইজন্য বিশ্বও রহিয়াছে বলিতে হইতেছে। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই অজ্ঞান নামক বিশ্বের উপাদান সত্য বলিয়া, বিশ্বও সত্য বলিতে হইতেছে। যেমন উক্ত চতুর্নবতি শ্লোকানুসারে মৃৎই ভাণ্ডাকার বলা যাইতে পারে; তদ্রূপ ঐ শ্লোকানুসারে অজ্ঞানই বিশ্বাকার বলা যাইতে পারে। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের চতুর্নবতি শ্লোকের বিপরীত শ্লোক, উক্ত গ্রন্থেরই পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোক। সেই পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোক এই প্রকার;—

"উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোহন্যন্ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোহয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ॥"

উপরোক্ত শ্লোকের সহিত চতুর্নবতি শ্লোকের ঐক্য করিতে হইলে, ব্রহ্ম ও অজ্ঞান অভেদই বলিতে হয়। কারণ চতুর্নবতি শ্লোকে প্রপঞ্চের উপাদান অজ্ঞান বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থেরই পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকানুসারে প্রপঞ্চের উপাদান ব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। অতএব পরমহংস শঙ্করাচার্য্যেই মতে ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান অভেদই বলিতে হয়।

পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে,—

"যথা রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্নাতি বৈ ভ্রমাৎ।
তদ্বৎ সত্যমবিজ্ঞায় জগৎ পশ্যতি মূঢ়ধীঃ ॥ ৯৫ ॥
রজ্জুরূপে পরিজ্ঞাতে সর্পত্বন্তু ন তিষ্ঠতি।
অধিষ্ঠানে তথা জ্ঞাতে প্রপঞ্চঃ শূন্যতাং গতঃ ॥৯৬॥"

যে স্বর্ণালঙ্কার দর্শন করে, তাহার কি সেই স্বর্ণালঙ্কার দর্শনে, স্বর্ণ দর্শন করা হয় না? স্বর্ণই অলঙ্কার হইয়াছে বলিয়া, অলঙ্কার দর্শন করিলেই স্বর্ণ দর্শন করাও হয়। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে—

"উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোহন্যন্ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোহয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ ॥"

বলায়, প্রপঞ্চ-জগতের উপাদান ব্রহ্মই বুঝিতে হয়। সুতরাং এই প্রপঞ্চ-জগৎ যিনি দর্শন করেন, তাঁহার কি সেই সত্য-ব্রহ্ম দর্শন করা হয় না? ঐ শ্লোকানুসারে ব্রহ্মোপাদানই কি এই প্রপঞ্চ-জগদাকার হন্ নাই? শঙ্করাচার্য্য—

"সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বঞ্চ শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বঞ্চ তথা ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥"

বলায়, এই জগদ্দর্শনে সত্য-ব্রহ্মই দর্শন করা হয়। শঙ্করাচার্য্যের—

"ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥৪৯॥"

শ্লোকানুসারে, ব্রহ্মই এই জগৎ। উক্ত শ্লোকে সর্ব্ব-ভূত ব্যতীত এই জগৎ নহে। সুতরাং ঐ শ্লোকানুসারে এই জগৎ ও ব্রহ্ম যে অভেদ, সে বিষয়ে আর সংশয় কি আছে? শঙ্করাচার্য্য 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলায়, পঞ্চনবতি শ্লোকোক্ত রজ্জুও আত্মা, সর্পও আত্মা। ভ্রমবশত রজ্জুকে সর্প ও সর্পকে রজ্জু-বোধ হইলেও, শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে উভয়কেই আত্মা-বোধ হয়। কারণ তাঁহার মতে সমস্তই আত্মা। পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে, প্রপঞ্চ ও আত্মা-ব্রহ্ম অভেদ। সুতরাং—

"অধিষ্ঠানে তথা জ্ঞাতে প্রপঞ্চঃ শূন্যতাং গতঃ"

কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? স্বর্ণই অলঙ্কার হইয়াছে। তুমি সেই অলঙ্কার দর্শন করিতেছ, তোমার কি সেই অলঙ্কার দর্শনে স্বর্ণ-দর্শনও হইতেছে না? তোমার কি সেই অলঙ্কারকেই স্বর্ণ-বোধ হইতেছে না? পূর্ব্বেইত শঙ্করাচার্য্যের নানা শ্লোকানুসারে প্রমাণ করা হইয়াছে, ব্রহ্মই প্রপঞ্চাকার। সুতরাং ঐ প্রকার প্রপঞ্চ দর্শন করায় কি ব্রহ্ম-দর্শন করা হয় না? সুতরাং তদ্দ্বারা কি প্রপঞ্চই ব্রহ্ম-বোধ করা হয় না?

একপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

যখন স্বর্ণ অলঙ্কাররূপে পরিণত হয়, তখন স্বর্ণ এবং অলঙ্কার উভয়ই স্বীকার করিতে হয়। অপরোক্ষানুভূতির পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকানুসারে সর্ব্ব-প্রপঞ্চই ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের উক্ত শ্লোকানুসারে অলঙ্কারের উপাদান যেমন স্বর্ণ, তদ্রূপ সর্ব্ব-প্রপঞ্চের উপাদান ব্রহ্ম। অলঙ্কারের উপাদান স্বর্ণই

যেমন অলঙ্কার হয়, তদ্রূপ সর্ব্ব-প্রপঞ্চের উপাদান ব্রহ্মই এই প্রপঞ্চ-জগদাকার হন্। ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চ জগদাকার হইলে, ব্রহ্ম এবং এই প্রপঞ্চ-জগৎ উভয়ই স্বীকার করিতে হয়। তবে পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের,—

"দেহস্যাপি প্র পঞ্চত্বাৎ প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ।
অজ্ঞানজনবোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ॥৯৭॥"

শ্লোকানুসারে, প্রপঞ্চ-দেহ ও প্রারব্ধ অস্বীকার করা কথনই সঙ্গত নহে।

দ্বি-পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের শ্রুতি-সম্মত,—

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে।
বহুত্বং তন্নিষেধার্থং শ্রুত্যা গীতং যতস্ফুটম্॥ ৯৮॥"

শ্লোকানুসারে, সেই পরাবর-পরমাত্মা দশন করা যায়, এবং তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্ব-কর্ম্ম ক্ষয় হয়। নিবাকার দর্শন করা যায় না। নিরাকারের অস্তিত্ব, অনুভব দ্বারাই নিশ্চয় করা যায়। আকারের অস্তিত্ব, দর্শন দ্বারা নিশ্চয় করা যায় বটে। উক্ত শ্লোকীয় 'পরাবর' কি আকার? তিনি আকার বলিয়াই কি তাঁহাকে দর্শন করা যায়? শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতির সপ্তনবতি শ্লোকীয়—'দেহস্যাপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ' স্বীকার করিলে,—'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে' স্বীকার করা যায় না।

কারণ ঐ সপ্তনবতি শ্লোকানুসারে প্রপঞ্চ-দেহ এবং প্রারব্ধ একেবারে অস্বীকার করিলে, কোন কর্ম্মই স্বীকার করা যায় না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের অষ্ট-নবতি শ্লোক স্বীকার করিলে, সর্ব্ব-কর্ম্মই স্বীকার করা যায়। ঐ শ্লোকের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে, পরাবর-পরমাত্মা দর্শন করিলে সর্ব্ব-কর্ম্ম ক্ষয় হয়। সর্ব্ব-কর্ম্ম না থাকিলে, সর্ব্ব-কর্ম্ম ক্ষয় হইবার প্রয়োজনই হয় না। সর্ব্ব-কর্ম্ম আছে বলিয়াই, পরাবর-পরমাত্মা দর্শন করিলে সর্ব্ব-কর্ম্ম ক্ষয় হয় বলা হইয়াছে। কথিত অষ্টনবতি শ্লোকের প্রথমাংশ দ্বারা সর্ব্ব-কর্ম্মের বিদ্য-মানতা প্রমাণ করায়, বহু-কর্ম্মেরও বিদ্যমানতা স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ শ্লোকের শেষাংশে—'বহুত্বং তন্নিষে-ধার্থং শ্রুত্যা গীতং যতস্ফুটম্' বলা সঙ্গত হয় নাই।

ত্রি-পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"উচ্যতেঽজ্ঞৈর্ব্বলাচ্চৈতৎ তদানর্থদ্বয়াগমঃ।
বেদান্তমতহানঞ্চ যতোজ্ঞানমিতি শ্রুতিঃ॥৯৯॥"

শঙ্করাচার্য্য 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলায়, তাঁহার একত্ব এবং বহুত্ব স্পষ্টই স্বীকার করা হইয়াছে। তাঁহার কেবল একত্ব স্বীকার করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে, তাঁহার 'আত্মেতির' পূর্ব্বে 'সর্ব্বম্' শব্দ ব্যবহার করা উচিত হয় নাই। তাঁহার নিজের কথাতেই তিনি বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের হানি করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে চতুরাধিকশত শ্লোকে

'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি' বলিয়াও বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের হানি করিয়াছেন। আর ঐ শঙ্করাচার্য্য 'সর্ব্বমাত্মেতি,' 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি' এবং তাঁহার ব্রহ্মনামাবলী-মালায় 'ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি' স্বীকার করায়, প্রারব্ধও আত্মা, এবং প্রারব্ধও ব্রহ্ম স্বীকার করা সম্বন্ধেই বা তাঁহার কি আপত্তি হইতে পারে? তিনি নিজেইত কয়েকটী বাক্য দ্বারা অদ্বৈতবাদের হানি করিয়াছেন। তবে তিনি প্রারব্ধ স্বীকার করিলেনই বা? আর তাঁহারও যে প্রারব্ধ স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাত পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের 'যতোজ্ঞানমিতি শ্রুতিঃ' বলা উচিত হয় নাই। কারণ শ্রুতিও পরিমিত গ্রন্থ। তাহার মধ্যে যে সকল উপদেশ আছে, সে সকলও পরিমিত। সে সকলে কত বাক্য, কত অক্ষর এবং কত উপমাই আছে; সেই সকল উপমাও ভৌতিক। সুতরাং বেদান্তানুসারে উক্ত সমস্তই অসত্য বলিতে হয়। ঐ সমস্তের সমষ্টি শ্রুতি। সুতরাং সেই শ্রুতিকেই বা অদ্বৈতবাদানুসারে কি প্রকারে অসত্য না বলা যায়? সুতরাং সেই শ্রুতি অদ্বৈত-আত্মজ্ঞান লাভেরই বা কারণ কি প্রকারে হইতে পারে? শ্রুতিতেই ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচর বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি নিজেত অবাক্য নহে, শ্রুতি যে বাক্য-সমষ্টির বিকাশ। সুতরাং সেই শ্রুতি অনুসারেই, সেই শ্রুতি অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞানের ও অদ্বৈত-আত্মজ্ঞানের কখনই কারণ হইতে পারে না। বেদান্তানুসারেও ব্রহ্ম বাক্য-মনের অগোচর। সুতরাং সেমতেও বাক্য-সমষ্টির বিকাশ যে শ্রুতি, সেই শ্রুতি অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞানের ও অদ্বৈত-আত্মজ্ঞানের কখনই কারণ হইতে পারে না। তাহা হইতে

পারে যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অপর কিছু মায়িকই বা উক্ত জ্ঞান-লাভের কারণ হইতে পারিবে না কেন?

চতুঃপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"ত্রিপঞ্চাঙ্গান্যতো বক্ষ্যে পূর্ব্বোক্তস্য হি লব্ধয়ে।
তৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সদা কার্য্যং নিদিধ্যাসনমেব তু॥১০০॥
নিদিধ্যাসাদৃতে প্রাপ্তির্ন ভবেৎ সচ্চিদাত্মনঃ।
তস্মাদ্‌ব্রহ্ম নিদিধ্যাসেৎ জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়সে
চিরম্॥১০১॥
যমো হি নিয়মস্ত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কালতা।
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃক্‌স্থিতিঃ॥১০২॥
প্রাণসংযমনঞ্চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ॥১০৩॥
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ।
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো
মুহুর্মুহুঃ॥১০৪॥
সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়াতিরস্কৃতিঃ।
নিয়মো হি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ॥১০৫॥

ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ।
ত্যাগো হি মহতাং পূজ্যঃ সদ্যো মোক্ষময়ো
যতঃ॥১০৬॥

যস্মাদ্বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
যন্মৌনং যোগিভির্গম্যং তদ্ভবেৎ সর্ব্বদা বুধঃ॥১০৭॥
বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্বক্তুং কেন শক্যতে।
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ॥১০৮॥
ইতি বা তদ্ভবেন্মৌনং সতাং সহজ সংজ্ঞিতম্।
গিরামৌনন্তু বালানাং প্রযুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥১০৯॥
আদাবন্তে ব মধ্যে চ জনো যস্মিন্নবিদ্যতে।
যেনেদং সততং ব্যাপ্তং স দেশো বিজনঃ স্মৃতঃ॥১১০॥
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ।
কালশব্দেন নির্দ্দিষ্টোঽখণ্ডানন্দকাদ্বয়ঃ॥ ১১১ ॥
সুখেনৈব ভবেদ্যস্মিন্নজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।
আসনং তদ্বিজানীয়ান্নেতরৎ সুখনাশকম্॥১১২॥
সিদ্ধং যৎ সর্ব্বভূতাদি বিশ্বাধিষ্ঠানমব্যয়ম্।
যস্মিন্ সিদ্ধাঃ সমাবিষ্টাস্তদ্বৈ সিদ্ধাসনং বিদুঃ॥১১৩॥
যন্মূলং সর্ব্বভূক্তনাং যন্মূলং চিত্তবন্ধনম্।
মূলবন্ধঃ সদাসেব্যো যোগ্যোসৌ রাজ-
যোগিনাম্॥১১৪॥

অঙ্গানাং সমতাং বিদ্যাৎ সমে ব্রহ্মণি লীয়তে।
নোচেন্নৈব সমানত্বমৃজুত্বং শুষ্ককাষ্ঠবম্ ॥১১৫॥
দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ব্রহ্মময়ং জগৎ।
সা দৃষ্টিঃ পরমোদারা ন নাসাগ্রে বিলোকিনী ॥১১৬॥
দৃষ্টিদর্শনদৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ।
দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রবিলোকিনী ॥১১৭॥
চিত্তাদিসর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥১১৮॥
নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচনাখ্যঃ সমীরণঃ।
ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরীরিত ॥১১৯॥
ততস্তদ্বৃত্তি নৈশ্চল্যং কুম্ভক প্রাণসংযমঃ।
অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং ঘ্রাণপীড়নম্ ॥১২০॥
বিষয়ে স্বাত্মতাং দৃষ্ট্বা মনসশ্চিতিমজ্জনম্।
প্রত্যাহারঃ সবিজ্ঞেয়োঽভ্যসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ ॥১২১॥
যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ।
মনসো ধারণঞ্চৈব ধারণা সা পরা মতা ॥১২২॥
ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ।
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী ॥১২৩॥
নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্জ্ঞানসংজ্ঞকঃ ॥১২৪॥

ইমঞ্চাকৃত্রিমানন্দং তাবৎ সাধু সমাভ্যসেৎ।
বশ্যো যাবৎ ক্ষণাৎ পুংসঃ প্রযুক্ত সন্ ভবেৎ
স্বয়ম্ ॥১২৫॥
ততঃ সাধননির্মুক্তঃ সিদ্ধো ভবতি যোগিরাট্।
তৎস্বরূপং ন চৈতস্য বিষয়ো মনসো গিরাম্ ॥১২৬॥"

বৈদান্তিক কোন গ্রন্থমতেই নিদিধ্যাসন আত্মা-ব্রহ্ম নহে। অপরোক্ষানুভূতির শততম্ শ্লোকে তাহার আবার ত্রি-পঞ্চাঙ্গ স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং তাহা যে অনাত্মা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কারণ অদ্বৈত-ব্রহ্মের কোন প্রকার বিভাগ থাকিতে পারে না। নিদিধ্যাসনের পঞ্চদশ প্রকার বিভাগ স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের মতেই নিদিধ্যাসন সাধনাত্মক,—সাধনা করিতে হয়; সেইজন্য সাধনাকেও ক্রিয়া বলা যায়। বৈদান্তিক অনেক গ্রন্থমতেই নানাপ্রকার ক্রিয়া অবিদ্যার নানাপ্রকার বিকাশ বলিয়া, কোন প্রকার ক্রিয়া দ্বারায় আত্মা-ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। অথচ শঙ্করাচার্য্যের উক্ত শততম্ শ্লোক হইতে ষড়বিংশাধিকশত শ্লোক পর্য্যন্ত দেখিলে বোঝা যায়, যে ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও সাধনাত্মিকা নানাপ্রকার ক্রিয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পঞ্চপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে,—

"সমাধৌ ক্রিয়মাণে তু বিঘ্নান্যায়ান্তি বৈ বলাৎ।
অনুসন্ধানরাহিত্যমালস্যং ভোগলালসম্ ॥১২৭॥

লয়স্তমশ্চ বিক্ষেপো রসাস্বাদশ্চ শূন্যতা।
এবং যদ্বিঘ্নবাহুল্যং ত্যাজ্যং ব্রহ্মবিদা শনৈঃ ॥১২৮॥”

উক্ত দুই শ্লোকানুসারে অবশ্যই সমাধি সম্পাদন কালে নানাপ্রকার বিঘ্ন প্রকাশিত হয়। এবং ঐ শ্লোকদ্বয়ের শেষ শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায়, যে ঐ সকল বিঘ্ন পরিত্যাগও করা যায়; সুতরাং ঐ সকল বিঘ্ন অবশ্যই সত্য। ঐ সকল সত্য না হইলে ঐ সকল পরিত্যাগেরই প্রয়োজন হইত না। উক্ত অষ্টবিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায়, যে ঐ সকল বিঘ্ন ব্রহ্মবিদ্‌গণ কর্ত্তৃকই শীঘ্র পরিত্যাজ্য। তাহা হইলে ঐ সকল বিঘ্নকে মিথ্যা বলা যায় না। যাহা মিথ্যা, প্রকৃত কথায় তাহাত নাই। নাই যাহা,—ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাহা নাই-ই জানেন। তাঁহারা তাহা আছে বিবেচনা করিয়া, কখন তাহা পরিত্যাগের জন্য উৎসুক হন্ না। কারণ যাহা নাই, তাহা তাঁহাদের আছে, ভ্রান্তি-ক্রমেও বোধ হইতে পারে না। তাঁহাদেরও ভ্রান্তি আছে যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বেদান্তমতানুসারে তাঁহাদের অব্রহ্মবিদ্‌ই বলা উচিত।

ষট্‌পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

বেদান্ত এবং সেই বেদান্তবাদী শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মইত আত্মা। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাঁহার আত্মাকে জানা হয়, নাই বলা যাইতে পারে না। যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান আছে, তাঁহার নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞান আছে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ। শ্রুতি ও বেদান্তমতে সেই আত্মা-ব্রহ্ম

অদ্বিতীয়। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের অষ্টবিংশাধিকশত শ্লোকে 'ব্রহ্মবিদা' শব্দ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়াছে। 'ব্রহ্মবিদা' শব্দের অর্থ, ব্রহ্মবিদ্‌গণ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কিম্বা আত্মজ্ঞান হইলে কেবল একই বোধ থাকে বলিয়া, ব্রহ্মবিদ্-শঙ্করাচার্য্যের 'ব্রহ্মবিদা' শব্দ ব্যবহার করা অনুচিত হইয়াছে। তাঁহার ব্রহ্মবিদ্ এবং আত্মবিদ্ অভেদ-বোধই থাকা উচিত ছিল। ঐ প্রকার অভেদ-বোধ থাকিলে, একাধিক-ব্রহ্মবিদ্ স্বীকারই করা যায় না। পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ প্রতিপন্ন করায়, বহু-ব্রহ্মবিদের অস্তিত্ব থাকাই অসম্ভব হয়।

সপ্তপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

বেদান্তমতানুসারে যাহার বহুতা আছে, তাহাই অবিদ্যার বিকাশ। একোনত্রিংশাধিকশত শ্লোকে ত্রিবিধ-বৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ শ্লোকানুসারে ভাব-বৃত্তি অবলম্বনে ভাবত্ব লাভ করা যায়, শূন্য-বৃত্তি অবলম্বনে শূন্যতা লাভ করা যায়, এবং ব্রহ্ম-বৃত্তি অবলম্বনে ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়। ব্রহ্ম-বৃত্তি যেটী, পূর্ব্ব প্রমাণানুসারে সেটীকেও অবিদ্যা-অনাত্মার বিকাশ বলা যাইতে পারে। সুতরাং তাহা যদি ব্রহ্মত্বের কারণ হয়, তাহা হইলে সৎ-কর্ম্মকাণ্ডই বা ব্রহ্মত্বের কারণ হইবে না কেন? অন্ধকার দ্বারাত অন্ধকার তিরোহিত হয় না। অন্ধকারের বিপরীত আলোক দ্বারাই অন্ধকার তিরোহিত হয়। তবে ব্রহ্মত্বের বিপরীত যাহা, তাহা দ্বারাই বা ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে না কেন? ক্ষুধার দ্বারাত ক্ষুধা নিবারণ হয় না, খাদ্য দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি

হয়; ক্ষুধাই খাদ্য নহে বলিয়া, প্রকারান্তরে খাদ্য ক্ষুধার বিপরীত বটে। তৃষ্ণার দ্বারা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না, জল দ্বারা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়; তৃষ্ণাই জল নহে বলিয়া, প্রকারান্তরে জল তৃষ্ণার বিপরীত বটে। ঐ সকল উদাহরণের ন্যায় ব্রহ্মত্বের বিপরীত যাহা, তাহা দ্বারাই বা ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে না কেন? হরি-ভক্তিই হরি নন্, অথচ পৌরাণিকমতে হরি-ভক্তি দ্বারাই হরি লাভ করা যায়। দৃষ্টি-শক্তিবিশিষ্ট চক্ষু দ্বারা যে সকল বস্তু দর্শন করা হয়, সে সকল বস্তুই দৃষ্টি-শক্তিবিশিষ্ট চক্ষু নহে। সুতরাং ব্রহ্মত্বের বিপরীত যাহা, তাহা দ্বারাই বা ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে না কেন?—

"ভাববৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি ব্রহ্মত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ ॥১২৯॥"

শ্লোকে ব্রহ্মত্ব-নামক পূর্ণত্ব অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছে। বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মাইত ব্রহ্ম। তবে আর অভ্যাস দ্বারা সেই আত্মার ব্রহ্মত্ব-নামক পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইবে কেন? বেদান্তানুসারে কোন কারণেই নির্ব্বিকার-আত্মা-ব্রহ্ম, অনাত্মা-অব্রহ্ম হন্ না। তিনি তাহা হন্ স্বীকার করিলে, আত্মা-ব্রহ্মকে নির্ব্বিকারও বলা যায় না। তাহা হইলে তিনিও পরিণাম-বিশিষ্ট অবিদ্যা-অনাত্মা, প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয়।

অষ্টপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"যে হি বৃত্তিং জহাত্যেনাং ব্রহ্মাখ্যাং পাবনীং পরাং।
তে তু বৃথৈব জীবন্তি পশুভিশ্চ সমা নরাঃ॥"

আত্মা এক। সুতরাং সেই আত্মা শব্দের পরিবর্ত্তে বহুবাচক 'যে' কিম্বা 'তে' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্যের মতেই আত্মা, ব্রহ্ম। সুতরাং তাঁহার ব্রহ্ম-বৃত্তি অবলম্বনের অথবা তাহা পরিত্যাগেরও প্রয়োজন হয় না। সেই ব্রহ্মাত্মাই জীব স্বীকার করিলে, তাঁহার ব্রহ্ম-বৃত্তি অবলম্বন কিম্বা পরিত্যাগের প্রয়োজন হয় না। কারণ শঙ্করাচার্য্যইত তাঁহার ব্রহ্ম-নামাবলী-মালা নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' মাণ্ডুক্যোপনিষদের মতে শিব ও ব্রহ্ম অভেদ। সেইজন্যই জীবন্মুক্তি-গীতা অনুসারেও বলা যাইতে পারে,—

"জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।"

একোনষষ্টি সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে,—

"যে হি বৃত্তিং বিজানন্তি জ্ঞাত্বাপি বর্দ্ধয়ন্তি যে।
তে বৈ সৎ পুরুষা ধন্যা বন্দ্যাস্তে ভুবনত্রয়ে॥১৩১॥
যেষাং বৃত্তিঃ সমাবৃদ্ধা পরিপক্কা চ সা পুনঃ।
তে বৈ সদ্ব্রহ্মতাং প্রাপ্তানেতরে শব্দবাদিনঃ॥১৩২॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। সুতরাং সেই ব্রহ্ম-জীবের আবার ব্রহ্ম-বৃত্তি জানিবারই বা প্রয়োজন হইবে কেন? তিনি সেই

বৃত্তি অবগত হইয়া, তাঁহার তাহা বৰ্দ্ধিত করিতেই বা হইবে কেন? শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মইত সৎ। তাঁহারই মতে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। সুতরাং তাঁহারই মতে ব্রহ্ম-জীব অসৎ কোন প্রকারেই নহেন। অতএব সেই ব্রহ্ম-জীবকেই সৎ-পুরুষ বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে ব্রহ্ম-বৃত্তি অবগত হইয়া তাহা বৰ্দ্ধিত করিলে, তবে তাঁহাকে সৎ-পুরুষ বলা যাইতে পারিবে, ইহা বিবেচনা করিও না। শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হওয়ার জন্য, সেই ব্রহ্ম-জীব স্বভা-বতইত সৎ-পুরুষ। শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া, সেই সৎ-পুরুষ ব্রহ্ম-জীবকে অপর কেহ বন্দনা করিবারত নাই। নিজেকে নিজে কেহ বন্দনা করে না, তাহা করিবার প্রয়োজনও হয় না। অপ-রোক্ষানুভূতির দ্বাত্রিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে যাঁহাদের ব্রহ্ম-বৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহা পরিপক্ক হয়, তাঁহারাই সদ্‌ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হন্। শঙ্করাচার্য্যের মতেই ব্রহ্ম-জীবাত্মাকে সদ্‌ব্রহ্ম বলা অসঙ্গত নহে, কারণ তাঁহারই মতানুসারে ব্রহ্ম-জীবাত্মাই সদ্‌ব্রহ্ম। সুতরাং সেই ব্রহ্ম-জীবাত্মার সদ্‌ব্রহ্মতা লাভের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা শব্দবাদী, তাঁহারা সদ্‌ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হন্ নাও বলা যায় না, কারণ তাঁহারাওত শঙ্করাচার্য্যেরই মতানুসারে অব্রহ্ম-জীবাত্মা নহেন। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে যে তাঁহারাও সদ্‌ব্রহ্ম, সুতরাং তাঁহাদেরই বা সদ্‌ব্রহ্মতা প্রাপ্তির প্রয়োজন কি? শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে বহু-জীবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করা যায় না। তিনি যে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বলিয়াছেন। অতএব তাঁহার সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-জীবাত্মা যে বহু, তাহা

তাঁহার অপরোক্ষানুভূতির দ্বাত্রিংশাধিকশত শ্লোকে 'যেষাং' 'তে' এবং 'শব্দবাদিনঃ' শব্দত্রয় ব্যবহারে উহার পরিচয় দেওয়া উচিত হয় নাই।

ষষ্টি সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ।
তেপ্যজ্ঞানিতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ ॥১৩৩॥"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। সুতরাং বহু-জীবও স্বীকার করা যায় না। সেইজন্য ঐ অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের ত্রয়স্ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে বহুবচনে 'বৃত্তিহীনাঃ' ও 'সুরাগিণঃ' প্রভৃতি বলা উচিত হয় নাই। কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই এক ব্রহ্ম-জীবাত্মাই বর্ত্তমান। তাঁহারই মতে বহুত নাই। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মই যে জীব। সুতরাং ব্রহ্ম-বৃত্তি হীনই বা কাহারা? শঙ্করাচার্য্যের মতে যে জীব স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁহাকে সদ্‌ব্রহ্মতা প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্ম-বৃত্তিই বা অবলম্বন করিতে হইবে কেন? তিনি যে স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁহার ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য সাধনাই বা করিতে হইবে কেন? স্বয়ং যিনি ব্রহ্ম, তিনি কি হইবার জন্য সাধনা করিবেন? ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত কিছুই নাই। ব্রহ্ম-জীবই নিশ্চয় ব্রহ্ম, বার্ত্তা-কুশল, এবং তিনিই আপনাতে এবং আপনার বিষয়ে অনু [illegible] সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? বেদান্তমতে নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের মতে সেই ব্রহ্মই আত্মা, সেই ব্রহ্মই জীব।

সুতরাং সেই নির্ব্বিকার-ব্রহ্ম-জীবাত্মার অজ্ঞান থাকা অতি অসম্ভব। তাঁহার নির্ব্বিকারতা জন্য অজ্ঞানতা নাই বলিয়া, তাঁহার সেই অজ্ঞানতা জন্য বারম্বার গমনাগমন হয়ও বলা যায় না। বৈদান্তিক নানা গ্রন্থমতে ব্রহ্ম-জীবাত্মা কোন্ স্থানে নাই? উক্ত মতে তিনি যে সর্ব্বত্রে পরিপূর্ণ। কোন স্থানেইত তাঁহার অভাব বলিতে পার না। তবে তিনি কোথায় গমনই বা করিবেন, এবং তাঁহার কোথায় আগমনই বা হইবে? শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই সেই ব্রহ্ম-জীবের কোথাও গমন করিবারও স্থান নাই, এবং তাঁহার কোথাও আগমন করিবারও স্থান নাই।

একষষ্টি সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের চতুস্ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"নিমেষার্দ্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা।
যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ॥"

উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণে কর্ত্তা নাই। ঐ চরণের অর্থ, ব্রহ্মময়ী-বৃত্তি বিনা নিমেষার্দ্ধ থাকেন না। কিন্তু ঐ চরণে বলা হয় নাই, যে ব্রহ্মময়ী-বৃত্তি বিনা নিমেষার্দ্ধ কাহারা থাকেন না? শঙ্করাচার্য্যের মতে—

কার্য্যে কারণতা জাতা কারণে নহি কার্য্যতা।
কারণত্বং ততো গচ্ছেৎ কার্য্যাভাবে বিচারতঃ॥১৩৫॥

অথ শুদ্ধং ভবেদ্বস্তু যদ্বৈ বাচামগোচরম্।
দ্রষ্টব্যং মৃদ্ঘটেনৈব দৃষ্টান্তেন পুনঃ পুনঃ ॥১৩৬॥”

কার্য্য,কারণের অস্তিত্ব প্রমাণ করে সত্য ; কিন্তু কার্য্যে কারণতা জাত হয় না। কার্য্য কখনই কারণোৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। কারণ হইতেই কার্য্য বিকাশিত হয়। কার্য্যে কারণতা বিদ্যমানও নাই। তবে কার্য্য, কারণের পরিচায়ক বটে। কার্য্য বা ক্রিয়া-শক্তির আধার বা আশ্রয়ই কারণ। তবে **‘কারণে নহি কার্য্যতা’** কি প্রকারেই বা বলা যায়। কার্য্যাভাবে কারণত্বের অভাব হইতে পারে না। কারণ,—কারণ থাকিতে কারণত্বের অভাব হওয়া অতি অসঙ্গত। কার্য্যের বিদ্যমানতা জন্য কারণ নহে। কিন্তু কারণের বিদ্যমানতা জন্য কার্য্য। সেইজন্যই অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের পঞ্চত্রিংশাধিকশত শ্লোকীয় উপদেশ গ্রাহ্য হইতে পারে না। উক্ত গ্রন্থের ষট্‌ত্রিংশাধিক-শত শ্লোকীয় বস্তু অর্থে, ব্রহ্মই বুঝিতে হয়। কারণ ঐ শ্লোকীয় বস্তু, শুদ্ধ ও বাক্য-মনের অগোচর। শ্রুতি ও বেদান্তে ব্রহ্মকেই শুদ্ধ ও বাক্য-মনের অগোচর বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত শ্লোকীয় শুদ্ধ ও বাক্য-মনের অগোচর-বস্তু ব্রহ্ম, ইহাই নিশ্চয় করিতে হয়। সাধারণতঃ বস্তু বলিলে, তাহার অর্থ ব্রহ্মকে বুঝায় না। বাস্তবিক, বস্তু অর্থে ব্রহ্ম নহে। নিয়ত আমি অনেক বস্তুই প্রত্যক্ষ করিতেছি। বস্তু জড়, ইহাই সকলের জানা আছে। আর বহু-বস্তু প্রত্যক্ষ করা হয় বলিয়া, বস্তুও প্রাকৃত বলিতে হয়। প্রাকৃত যাহা, তাহা শ্রুতি, বেদান্ত এবং পাতঞ্জলদর্শনের মতে সত্য নহে। ব্রহ্মও বস্তু

বলায়, প্রকারান্তরে ব্রহ্মকেও প্রাকৃত বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকীয় ব্রহ্ম-বস্তু বাগেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলা হয় নাই। সেই ব্রহ্ম-বস্তুকে দর্শন করা যায় না, তাহাও বলা হয় নাই। সেই ব্রহ্ম-বস্তু বুদ্ধির অগোচর, তাহাও বলা হয় নাই। ঘট্ নাশে মৃত্তিকা হয় বলা সঙ্গত নহে। কারণ যখন ঘট্ থাকে, তখনওত মৃত্তিকা থাকে। মৃত্তিকাইত ঘট্ হয়। তবে ঘট্ নাশে মৃত্তিকা হয়, না বলিয়া তখনও মৃত্তিকা থাকে বলাই অতি সঙ্গত। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেও কার্য্য-কারণের অভাব হইলে, যাহা বাক্য-মনের অগোচর সেই শুদ্ধ-বস্তু, হয় বলাও সঙ্গত নহে। যিনি বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্তু ব্রহ্ম, তিনি শ্রুতি-বেদান্তানুসারেই যে নিত্য-সত্য। সুতরাং তাঁহার হইবারত প্রয়োজন নাই, তিনিত আছেনই; সুতরাং তিনি হন্ স্বীকার কখনই করা যায় না। হয় যাহা, তাহা নিশ্চয়ই যায়। সুতরাং যাহা হয় এবং যাহা যায়, তাহা কখনই নিত্য-সত্য-ব্রহ্ম নহে। অতএব সেইজন্যই শঙ্করাচার্য্যের—'অথ শুদ্ধং ভবেদ্বস্তু যদ্বৈ বাচামগোচরম্' নির্দ্দেশ স্বীকার করা যায় না। ষট্‌ত্রিংশাধিকশত শ্লোকীয়—

"অথ শুদ্ধং ভবেদ্বস্তু যদ্বৈ বাচামগোচরম্"

কোন্ বস্তু হয়? অবিদ্যমান হইতে কিছুত বিদ্যমান হইতে পারে না। যদি বল, কোন অশুদ্ধ-বাক্য-মনের গোচর-বস্তু পরিবর্ত্তিত হইয়া, শুদ্ধ-বাক্য-মনের অগোচর-বস্তু হয়, তাহাও বলিতে পার না। কারণ কথিত ষট্‌ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে ঐ কথার আভাস পর্য্যন্ত নাই।

কথিত ষট্‌ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন শ্লোকে যদি ঐ কথার আভাসও থাকিত, তাহা হইলেও সে কথা স্বীকার করা যাইতে পারিত না। কারণ সবিকার-বস্তু নির্ব্বিকার-ব্রহ্ম-বস্তু হন্ বা হইতে পারেন, তাহা শ্রুতি কিম্বা বেদান্তে স্বীকার করা হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত কোন শ্লোকানুসারে, স্বয়ং কারণও বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্তু হন্, বুঝিবার কোন প্রমাণও নাই।

দ্বি-ষষ্টি সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে—

"অনেনৈব প্রকারেণ বৃত্তি ব্র্হ্মাত্মিকা ভবেৎ:
উদেতি শুদ্ধচিত্তানাং বৃত্তি জ্ঞানং ততঃ পরম্॥১৩৭॥"

অপরোক্ষানুভূতির ষট্‌ত্রিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্তু ব্রহ্ম হইলে. কেবলাত্মাত হইতে হয়। তখন নিশ্চয়ই কোন প্রকার বৃত্তির সঙ্গে সংস্রব থাকে না। সে অবস্থায় নিজে কি, সেই জ্ঞানই হয়। সে অবস্থায় ব্রহ্ম-বৃত্তি-জ্ঞানেরও প্রয়োজন থাকে না, সে অবস্থায় ব্রহ্মাত্মিকা-বৃত্তিরও প্রয়োজন থাকে না, সে অবস্থায় আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জ্ঞানই থাকে না। বৃত্তিওত বহু এবং নানা প্রকার, সুতরাং কোন বৃত্তিই অপ্রাকৃত নহে। সুতরাং যাহা প্রাকৃত, তাহার সহিত বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্তুর কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। সেই বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্তু নিজেই ব্রহ্ম। তবে তাঁহার আবার ব্রহ্মাত্মিকা-

বৃত্তি-জ্ঞানেই বা প্রয়োজন কি? তাঁহার ব্রহ্মাত্মিকা-বৃত্তি-তেই বা প্রয়োজন কি? অপরোক্ষানুভূতির সপ্তত্রিংশাধিকশত শ্লোকে বলা হইয়াছে, 'বৃত্তি ব্রহ্মাত্মিকা ভবেৎ।' ব্রহ্মাত্মিকা-বৃত্তি হয়। সুতরাং শ্রুতি-বেদান্তানুসারে তাহা অবশ্যই নিত্য নহে। নিত্য যাহা নহে, তাহাতে বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-ব্রহ্ম-বস্তুর প্রয়োজন কি? তবে শঙ্করাচার্য্যের মতে উক্ত বস্তুও হন্। তিনি যে নিজেই তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের ষট্‌ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"অথ শুদ্ধং ভবেদ্বস্তু যদ্বৈ বাচামগোচরম্।"

সুতরাং তাঁহার মতে যে ব্রহ্মাত্মিকা-বৃত্তি হয়, তাহার সহিত যে বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্তু হন্, তাঁহার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। অথবা তাঁহার সহিত তাহার সম্বন্ধ হইলেও হইতে পারে। তবে আমাদের বিবেচনায় বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্তু, নিত্য। সুতরাং তিনি হন্ না। তিনি নির্ব্বিকার এবং অপরিবর্ত্তনীয়। শ্রুতি ও বেদান্তমতেও তিনি উক্ত প্রকার। শঙ্করাচার্য্যের সপ্তত্রিংশাধিকশত শ্লোকীয় 'শুদ্ধ-চিত্তানাং,' আত্মাকে বলা যায় না। কারণ আত্মাত বহু নন্, তিনিত এক অদ্বিতীয়। সেইজন্য ঐ শ্লোকে বহুবচনাত্মক 'শুদ্ধ-চিত্তানাং' শব্দ, আত্মাবাচক করিয়া ব্যবহার করাই অসঙ্গত হইয়াছে। বেদান্তমতে চিত্তও মায়িক। সেইজন্যই ঐ ষট্-ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে কথিত বাক্য-মনের অগোচর যে শুদ্ধ-বস্তু/ব্রহ্মাত্মা, তাঁহার সহিত সেই চিত্তের কোন সংস্রবই থাকিতে পারে না। সেইজন্যই অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের সপ্ত-ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে—

"অনেনৈব প্রকারেণ বৃত্তি র্ব্রহ্মাত্মিকা ভবেৎ।
উদেতি শুদ্ধচিত্তানাং বৃত্তি জ্ঞানং ততঃ পরম্॥"

বলা সঙ্গত হয় নাই।

ত্রি-ষষ্টি সিদ্ধান্ত।

"কারণং ব্যতিরেকেণ পুমানাদৌ বিলোকয়েৎ।
অন্বয়েন পুনঃ স্তদ্ধি কার্য্যং নিত্যং প্রপশ্যতি ॥১৩৮॥
কার্য্যে হি কারণং পশ্যেৎ পশ্চাৎ কার্য্যং বিসর্জ্জয়েৎ।
কারণত্বং ততো গচ্ছেদবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ ॥১৩৯॥"

অপরোক্ষানুভূতির উক্ত একোনচত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে কার্য্যই যদি বিসর্জ্জন করিতে হয়, এবং সেই বিসর্জ্জন যদি কারণত্ব লোপের জন্যই করা হয়, তাহা হইলে উক্ত অষ্টত্রিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে 'ব্যতিরেকানুমান' ও 'অন্বয়ানুমান' দ্বারা কারণ নির্ণয় করিবারই বা প্রয়োজন কি? অপরোক্ষানুভূতির অষ্টত্রিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে বোঝা যায়, কার্য্য দর্শনেই কারণাবধারিত হইয়া থাকে। কার্য্যই কারণ নির্ণয়ের অবলম্বন বলিয়া, অবশ্য কার্য্যই কারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। অপরোক্ষানুভূতির একোনচত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে কার্য্য বিসর্জ্জন-বশত কারণত্ব যাইলে, অবশিষ্ট কোন্ বস্তু মুনি হন্? কার্য্য-কারণাভাবে অবশিষ্ট যাহা থাকেন, তাঁহাই আত্মা, এরূপও যদি স্বীকার করা হয়; তাহা হইলে সেই নির্ব্বিকার-আত্মার আবার মুনি হইবারই বা প্রয়োজন কি? আত্মা

কারণ-উপাধি পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার আবার মুনি-উপাধি বিশিষ্ট হইবার প্রয়োজন কি? 'অবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ' বলায়, আত্মা যে মুনি ছিলেন না, এবং তিনি মুনি নহেন, ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং মুনিত্ব নিশ্চয়ই নিত্য নহে। সুতরাং মুনিও অনাত্মা, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? অতএব শ্রুতি ও বেদান্তমতে যে আত্মা নিত্য-সত্য-নির্ব্বিকার, তাঁহার অনাত্মা-মুনি হইবার প্রয়োজনই নাই।

চতুঃষষ্টি সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে—

"ভাবিতং তীব্রযোগেন যদ্বস্তু নিশ্চয়াত্মনা।
পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটবৎ ॥১৪০॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে তীব্র-যোগ দ্বারা 'এক' অপরকে ভাবিলে, সেই 'এক' অপর হইতে পারে বোঝা যায়। ঐ দৃষ্টান্তানুসারে তীব্র-যোগ দ্বারা জীব ব্রহ্ম ভাবনা করিলে, জীব ব্রহ্ম হইতে পারে যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালার একবিংশ শ্লোকানুসারে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' কখনই বলা যাইতে পারে না। কারণ ঐ শ্লোকানুসারে জীব-ব্রহ্ম অভেদ স্বীকার করিলে, জীবকে তীব্র-যোগ দ্বারা ব্রহ্ম ভাবিয়া, ব্রহ্ম হইতে হইবে কেন? কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মইত জীব। তবে আর জীবকে ব্রহ্ম ভাবিয়া, ব্রহ্ম হইতে হইবে কেন? কেহ কি আপনাকে ভাবিয়া আপনি হয়? অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকে ভ্রমর-কীট

ব্যতীত অপর কোন্ কীট সেই ভ্রমর-কীটকে ভাবনা করিয়া, সেই ভ্রমর-কীট হয় ; ঐ শ্লোকে তাহার উল্লেখই করা হয় নাই। উক্ত চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে ভ্রমর-কীট অপর কোন্ কীটকে ভাবনা করিয়া, অপর কোন্ কীট হয় ; কিম্বা অপর কোন্‌প্রকার কীট সেই ভ্রমর-কীটকে ভাবনা করিয়া, সেই ভ্রমর-কীট হয়, তাহা নিশ্চিত বুঝিবার উপায় নাই। ঐ শ্লোকে কেবল 'ভ্রমরকীটবৎ' বলা হইয়াছে।

পঞ্চষষ্টি সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে

"অদৃশ্যং ভাবরূপঞ্চ সর্ব্বমেব চিদাত্মকম্।
সাবধানতয়া নিত্যং স্বাত্মানং ভাবয়েদ্ বুধঃ ॥১৪১॥
দৃশ্যমদৃশ্যতাং নীত্বা ব্রহ্মাকারেণ চিন্তয়েৎ।
বিদ্বান্নিত্য সুখে তিষ্ঠেদ্ধিয়াচিদ্রসপূর্ণয়া ॥১৪২॥"

অপরোক্ষানুভূতির একচত্বারিংশাধিকশত শ্লোকের অর্থ এই প্রকার বুঝিতে হয় ;—"বুধ সতত সাবধানতার সহিত চিদাত্মক-সর্ব্ব-ভাবরূপ নিজ অদৃশ্য-আত্মাই ভাবিবেন।" শঙ্করাচার্য্য এক-বিংশ শ্লোকে 'আত্মা নিত্যো হি সদ্রূপো' ও ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলায়, কোন দোষ হয় না। দ্বি-চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে দৃশ্যকে অব্রহ্ম ও অদৃশ্য-ব্রহ্মাকারে চিন্তা করা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে অদৃশ্য-ব্রহ্মাকারকে দৃশ্য-অব্রহ্মাকারে চিন্তা করাই বা সঙ্গত হইবে না কেন? শঙ্করা

চার্য্য 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলায়, দৃশ্য-অব্রহ্ম এবং অদৃশ্য-ব্রহ্ম অভেদই বুঝিতে হয়। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম নিরাকারও নন্, ব্রহ্ম সাকারও নন্। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম আকার। কারণ উক্ত শ্লোকে যে 'ব্রহ্মাকারেণ' শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অনেক গ্রন্থেই ব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত শ্লোকে তিনি সেই ব্রহ্মকেই যে আকার বলিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার মতে নিরাকার-ব্রহ্ম এবং আকার-ব্রহ্ম অভেদ। শঙ্করাচার্য্যের মতেও ব্রহ্মাকার। সুতরাং পৌরাণিক এবং তান্ত্রিকমতে, আকার উপাসনা কথনই দূষনীয় নহে। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্মাকার বলিলে, ব্রহ্ম সাকার কিম্বা নিরাকার বুঝিবার কোন কারণই নাই। ঐ শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম কেবল আকারই বুঝিতে হয়। দ্বি-চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে দৃশ্যকে অদৃশ্য-বোধ করা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আকার-নিরাকার-ব্রহ্মকে সাকার-বোধ করাও সম্পূর্ণ সঙ্গত। উক্ত শ্লোকে 'বিদ্বান্নিত্য সুখে তিষ্ঠেদ্ধিয়াচিদ্রসপূর্ণয়া' বলায়, নিত্য-সুখের ন্যায় বিদ্বান্‌ও নিত্য, ধীও নিত্য এবং চিদ্রসও নিত্য স্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের ঐ অংশের অর্থ, বিদ্বান্ চিদ্রস-পূর্ণ-ধীতে নিত্য-সুখে অবস্থান করেন। বিদ্বান্ নিজে না নিত্য হইলে, তিনি কথনই নিত্য-সুখে অবস্থান করিতে পারেন না; সুতরাং বিদ্বান্ নিত্য। আবার বলা হইয়াছে, বিদ্বান্ চিদ্রস-পূর্ণ-ধীতে নিত্য-সুখে অবস্থান করেন। নিত্য-সুখেরত বিরাম নাই, ঐ নিত্য-সুখের সঙ্গেইত চিদ্রস-পূর্ণ-ধীতে অবস্থান করার কথা বলা হইয়াছে। সেইজন্য উক্ত কথিত 'ধী' ও 'চিদ্রস' নিত্য স্বীকার' করিতে হয়। কাহারও

মতে, নিত্য শব্দের অর্থ নিয়ত করিলেও, নিত্য-সুখের বিরাম আছে স্বীকার করা যায় না। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থের দ্বি-চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয়, দৃশ্যকে অদৃশ্য-বোধে ব্রহ্মাকারে চিন্তা করিতে পারিলে, তবে সেই জ্ঞানী-চিন্তক চিদ্রস-পূর্ণ-ধীতে নিত্য-সুখে অবস্থান করিতে পারেন। সুতরাং ঐ পরমেশ্বর-শ্রীকৃষ্ণের দৃশ্য-আকারকে অদৃশ্য-বোধে ব্রহ্মাকারে চিন্তা করিলে, অবশ্যই সেই অভেদ-জ্ঞানাত্মিকা-চিন্তাবশত, সেই অভেদ-জ্ঞানী-চিন্তক অবশ্যই চিদ্রস-পূর্ণ-ধীর সহিত নিত্য-সুখে অবস্থান করিতে পারেন। দৃশ্য বলিলে, যাহা কিছু দর্শন করা যায়, সে সমস্তই। দৃশ্য বলিলে, প্রকৃতিও বুঝিতে হয়। যাহা কিছু দর্শন করা যায়, অথবা যে সকল বস্তু দর্শন করা যায়, সেই সকল দৃশ্যকে অদৃশ্য-বোধে ব্রহ্মাকারে চিন্তা করিলে, যদি সেই জ্ঞানী-চিন্তকের চিদ্রস-পূর্ণ-ধীতে নিত্য-সুখে অবস্থান হয়; তাহা হইলে নানা পুরাণ-তন্ত্রানুসারে পরমেশ্বরের যে সকল দৃশ্যাকার পূজা করিতে বলা হইয়াছে, সে সকল পূজা করিলে অবশ্যই কথিত ফলাপেক্ষা অতিরিক্ত ফলই লাভ হইবার সম্ভাবনা।

ষট্‌ষষ্টি সিদ্ধান্ত।

"এভিরঙ্গৈঃ সমাযুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ।
কিঞ্চিৎ পক্বকষায়াণাং হট যোগেন সংযুতঃ ॥১৪৩॥
পরিপক্বং মনো যেষাং কেবলোঽয়ঞ্চ সিদ্ধিদঃ।
গুরুদৈবতভক্তানাং সর্ব্বেষাং সুলভো ভবেৎ॥১৪৪॥"

ত্রি-চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকে শঙ্করাচার্য্যও রাজযোগ স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত প্রকার রাজযোগ কোন শাস্ত্রসম্মত নহে। তবে যিনি শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারী, উহা তাঁহারই পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারিবে। উক্ত শ্লোকানুসারে শঙ্করাচার্য্য-কথিত রাজযোগের অনেকগুলি অঙ্গ আছে অবধারণ করা যায়। বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে ঐ প্রকার যোগকে অনাত্ম-যোগ বলা যাইতে পারে; কারণ শঙ্করাচার্য্য-কথিত রাজযোগত আত্মা নহে। শ্রুতি-বেদান্তমতে আত্মা ব্যতীত যাহা, তাহাই অনাত্মা। সেই অনাত্মার বহু বিকাশ আছে বলিয়া, সেই অনাত্মারও বহু অঙ্গ আছে স্বীকার করা যায়। অনাত্মার প্রত্যেক অঙ্গের আবার বহু বিভাগ আছে। শঙ্করাচার্য্য-কথিত রাজযোগকেও ঐ অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ বা এক প্রকার অঙ্গ বলা যায়। উক্ত চতুশ্চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে জানা যায়, যাঁহাদের গুরুতে এবং দেবতাতে ভক্তি আছে, তাঁহাদেরই শঙ্করাচার্য্য-কথিত রাজযোগ সুলভ হয়। সুতরাং জানিতে হইবে, শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়া বেদান্তমত অনুসরণ করিলেও ভক্তি অবজ্ঞেয় নহেন। ঐ শঙ্করাচার্য্যের মণিরত্নমালা নামক গ্রন্থানুসারে মুমুক্ষুগণেরও ঈশ-ভক্তিতে প্রয়োজন আছে। তাঁহার উক্ত গ্রন্থের সপ্তদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"মুমুক্ষুণা কিং ত্বরিতম্বিধেয়ং,
সৎসঙ্গতি র্নির্ম্মমতেশভক্তিঃ ॥"

ঐ পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের প্রথম শ্লোক দেখিলে, তাঁহারও দ্বৈতবাদ ও ভক্তি ছিল, স্পষ্টই বোঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন,—

"শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরম্।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্॥"

শ্রীমদ্ভগবৎ-শ্রীমদ্‌গোবিন্দ-পাদাচার্য্য-পরিব্রাজক-পরমহংস-স্বামী বিরচিত অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থের প্রথম শ্লোকও দ্বৈতবাদ ও ভক্তির পরিচায়ক। সেই শ্লোক এই প্রকার,—

"স্বর্গস্থিতিপ্রলয়হেতুমচিন্ত্যশক্তিং
বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিং।
নির্ম্মুক্তবন্ধনমপারসুখাম্বুরাশিং
শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি॥"

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের বিবিধপ্রকার স্তোত্র পাঠ করিলে তাঁহার দ্বৈতবাদ এবং ভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ আনন্দগিরি-কৃত তাঁহার সুবিখ্যাত শঙ্কর-দিগ্বিজয়ম্ এবং কেরোলোৎপত্তি নামক গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করিলেও, শঙ্করাচার্য্যের দ্বৈতবাদ, ভক্তি এবং প্রেমের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ অনুশীলন করিলে অবগত হওয়া যায়, তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈত উভয়-বাদই ছিল।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

সিদ্ধান্তদর্শন।

তৃতীয় ভাগ।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য রচিত আত্মবোধ গ্রন্থ সম্বন্ধে মত।

প্রথম সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য,—

"তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাং।
মুমুক্ষুণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥১॥"

বলায়, তাঁহার বহু-মুমুক্ষু স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারও বহু-বোধ ছিল না, বলা যায় না। তাঁহার কেবল এক ব্রহ্মাত্মা আছেন বোধ থাকিলে, তিনি 'তপোভিঃ ক্ষীণ-পাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাং' এবং 'মুমুক্ষুণাং' বলিতে পারিতেন না। বহু-বোধ যাঁহার আছে, তাঁহাকে অদ্বৈতবাদী বলা যায় না। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে মুমুক্ষুকেও অনাত্মা বলা যায় না। ঐ দুই গ্রন্থানুসারে অবশ্য মুমুক্ষুও আত্মা। সেইজন্য বহু-মুমুক্ষু স্বীকার করা যায় না। তবে যিনি অদ্বৈতবাদী নন্, তিনি অবশ্যই বহু-মুমুক্ষু স্বীকার করিতে পারেন। একাত্মার বহু-বিকাশ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে

বহু বলিলে, নির্ব্বিকার-আত্মারও বিকার আছে স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে পরিণাম-বিহীন আত্মারও পরিণাম আছে স্বীকার করা হয়।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থে দ্বিতীয় শ্লোকের শেষাংশে বলা হইয়াছে,— 'জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিধ্যতি।' বেদান্তমতের কোন গ্রন্থেই আত্মা এবং মোক্ষ অভিন্ন বলা হয় নাই। সুতরাং সেমতেও মোক্ষ সৎ নহে। সেমতেও মোক্ষকে অসৎ-অনাত্মা বলিতে হয়। সুতরাং নির্ব্বিকার-আত্মজ্ঞানীর পক্ষে, মোক্ষও অতি তুচ্ছ। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-আত্মার কথনই আত্মজ্ঞানের অভাব হয় না। সুতরাং সেই আত্মার কথন মোক্ষও প্রয়োজন হয় না। কোন ব্যক্তিকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার সেই বন্ধন মুক্ত করিতে হইলে কি কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না? তাহার সেই বন্ধন মোচন করাও যে কর্ম্ম। উক্ত উদাহরণানুসারে জানা যায়, বন্ধন মোচন করিতে হইলেও কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে 'জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিধ্যতি' স্বীকার করিলে, সেই জ্ঞানকেই এক প্রকার কর্ম্ম বলিতে হয়। আর শঙ্করাচার্য্যের এই আত্মবোধ গ্রন্থেরই—

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ ॥৫॥"

শ্লোকানুসারে জ্ঞানকেও' অসৎ বলিতে হয়, কারণ উক্ত

শ্লোকানুসারে জ্ঞানও নষ্ট হয়। নষ্ট যাহা হয়, শ্রুতি-বেদান্তানুসারে তাহা নিশ্চয়ই অনিত্য। সুতরাং সেই অনিত্য-জ্ঞান দ্বারা অনিত্য-মোক্ষে, নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-নিত্যাত্মার প্রয়োজনই হইতে পারে না। যদি আত্মার বন্ধন স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মা নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন নহেন। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে আত্মা নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন স্বীকৃত হইলে, তাঁহার অবশ্যই বন্ধন এবং মোক্ষ উভয়ই নাই। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে এবং শঙ্করাচার্য্যের কতকগুলি শ্লোকানুসারে, বন্ধনও অনাত্মার বিকাশ এবং মোক্ষও অনাত্মার বিকাশ বলা যাইতে পারে। ঐ অনাত্মার বিকাশ মোক্ষলাভের জন্য, অন্যান্য সাধনার প্রয়োজন হয় না, তাহা দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমাংশানুসারে বুঝিবার কোন কারণ নাই। ঐ শ্লোকানুসারে বোঝা যায়, মোক্ষলাভ করিতে হইলে যে সকল সাধনার প্রয়োজন হয়, সে সকলের মধ্যে মোক্ষলাভ সম্বন্ধে বোধ বা জ্ঞানই প্রধান সাধনা। কোন সাধনাই অক্রিয়া নহে। সুতরাং মোক্ষলাভ সম্বন্ধেও ক্রিয়ার প্রয়োজন আছে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে,—

"অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ ॥৩॥"

আলোকও অনাত্মার বিকাশ, অন্ধকারও অনাত্মার বিকাশ। অথচ অন্ধকার তিরোধানের কারণ আলোকই হয়। তদ্রূপ

অনাত্মা-অবিদ্যার বিকাশ কর্ম্ম, ইহাও স্বীকার করিলে, কোন প্রকার কর্ম্ম দ্বারাই যে অবিদ্যা নিরস্ত হইতে পারে না, এরূপ বলিতে পার না। কারণ এক প্রকার কর্ম্ম দ্বারায়ত অপর প্রকার কর্ম্ম নিবৃত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রহার করিতেছে; যে ব্যক্তি প্রহার করিতেছে, তাহা অপেক্ষা কোন বলবান্ ব্যক্তি দয়াবশত বল-প্রয়োগ দ্বারা সেই প্রহার কার্য্য নিবারণ করিতে পারেন। সুতরাং কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম-নিবৃত্তি হইতে পারে অস্বীকার করা যায় না। যেমন আলোকই আলোক-দর্শনের কারণ হয়, তদ্রূপ কর্ম্মই বা কর্ম্ম-নিবৃত্তির কারণ হইবে না কেন? শঙ্করাচার্য্যের মতেই যে, বিদ্যাও অনাত্মা এবং অবিদ্যাও অনাত্মা। বিদ্যা বা জ্ঞানও যে অনাত্মারই এক বিকাশ, তাহা তাঁহার এই আত্মবোধ নামক গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ পঞ্চম শ্লোকানুসারে জ্ঞানেরও নাশ আছে, সুতরাং জ্ঞান বা বিদ্যা কখনই নিত্য নহে; তাহা অবশ্যই অনিত্য। শ্রুতি-বেদান্তমতে অনিত্য যাহা, তাহাই যে অনাত্মা-অবিদ্যা। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের পঞ্চম শ্লোকানুসারে জ্ঞান বা বিদ্যাও অনাত্মা-অবিদ্যা। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য আত্মবোধের তৃতীয় শ্লোকের শেষাংশে—'বিদ্যাহ্যবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ' বলায়, সেই অনাত্মা-অবিদ্যা-বিদ্যাই অবিদ্যা নাশের কারণ হয়। অতএব প্রকারান্তরে অনাত্মা-অবিদ্যা-বিদ্যাই, সেই অনাত্মা-অবিদ্যা-বিদ্যার নাশের কারণ হয়। কেহ আপনি আপনার নাশের কারণ হইলে, সে আপনি নিশ্চয়ই থাকে না। সেইজন্যই শঙ্করাচার্য্য আত্মবোধের পঞ্চম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ॥"

চতুর্থ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব॥"

অংশুমানের অংশুত সেই অংশুকে দর্শন করে না। যদি অংশুমানের অংশু সেই অংশুকে দর্শন করিতে পারিত, তাহা হইলে সেই অংশুমানের সমস্ত অংশু, মেঘ দ্বারা আবৃত হইলেও অংশু,—অংশুকে দেখিত। আত্মা-অংশুমানেরও জ্ঞানাংশু আছে। সুতরাং তিনি অজ্ঞান-মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও তিনি আপনি আপনাকে দর্শন করেন। আত্মাংশুমান যে নিত্য-অংশুমান। সুতরাং তাঁহার আত্মজ্ঞান নামক অংশুও নিত্য। সেইজন্যই আত্মার আত্ম-দর্শনও নিয়ত হইতেছে। তাহার বাধক, অজ্ঞান-মেঘ হইতেই পারে না। অংশুমানের অংশু দর্শন করিবার জন্য অপর কেহ আছে। সেইজন্য মেঘ-রূপ বাধা-বশত সেই দর্শক 'এক' অংশুকে পরিচ্ছিন্নরূপে দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু সেই আত্মাকে দর্শন করিবার জন্যত অপর কেহ নাই। আত্মাই আত্মাকে দর্শন করেন। সুতরাং পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, অজ্ঞান-আত্মার,—আত্মাকে দর্শনের প্রতিবন্ধক হইতেই পারে না। অন্য কেহ যদি ঐ আত্মা

দর্শন করিবার জন্য থাকিত, তাহা হইলে অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক-বশত, সেই ব্যক্তি ঐ অখণ্ডাত্মাকে খণ্ড খণ্ড রূপে দর্শন করিত।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ॥"

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মনামাবলী-মালা নামক গ্রন্থে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' বলায়, তাঁহার 'অজ্ঞানকলুষং জীবং' বলা উচিত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালাতে জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ, ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। শ্রুতি-বেদান্তমতে ব্রহ্মের সঙ্গে অজ্ঞানের কোন সংস্রবই নাই। সুতরাং সেই ব্রহ্ম-জীবেরও অজ্ঞানের সহিত কোন সংস্রব থাকিতেই পারে না। অতএব শঙ্করাচার্য্যের 'অজ্ঞানকলুষং জীবং' উপদেশ, তাঁহারই 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' উপ-দেশ দ্বারাই খণ্ডন করা হইল। উক্ত পঞ্চম শ্লোকানুসারে জানা যায়, জ্ঞানও অভ্যাস করা যায়। অভ্যাসই সাধনা, এবং সাধ-নাই ক্রিয়া। সুতরাং জ্ঞান বা বিদ্যার সহিত কর্ম্ম বা ক্রিয়ার বিরোধ নাই, স্পষ্টই জানা যাইতেছে। আত্মবোধ নামক গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকানুসারে অবিদ্যার সহিতও কর্ম্ম বা ক্রিয়ার বিরোধ নাই। ঐ তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ॥

উক্ত তৃতীয় শ্লোকানুসারে জ্ঞানেরও নাশ আছে, সুতরাং জ্ঞানও নিত্য নহে। ঐ জ্ঞানেরই অপর নাম বিদ্যা।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদি সঙ্কুলঃ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেহসত্যবদ্ ভবেৎ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে, সংসার স্বপ্নের ন্যায়। স্বপ্ন-দর্শনকালে স্বপ্নকে সত্য-বোধই হয়। সেই বোধটীকে তুমিত অবোধ বা অজ্ঞান বলিতে পার না। যে অবস্থায় সংসার এবং সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারই বিদ্যমান-বোধ হয়, সে অবস্থায় সে বোধকে অবোধ বা অজ্ঞান বলিতে পার না। জাগরণে সেই দৃষ্ট-স্বপ্ন মিথ্যা-বোধ হইলে, সেই জাগরণের বোধকে অবোধ বা অজ্ঞান বলিতে পার না। যে অবস্থায় সংসার এবং সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারই মিথ্যা-বোধ হয়, সে অবস্থায় সেই বোধকেও অবোধ বা অজ্ঞান বলিতে পার না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য,—উক্ত স্বপ্ন-বোধ সত্য? না জাগরণে সেই স্বপ্নকে যে মিথ্যা-বোধ হয়, সেই জাগরণের বোধ সত্য? অদ্বৈতমতে বোধ বা জ্ঞান একই। কোন কোন অদ্বৈতমত-প্রতিপাদক গ্রন্থে, বোধ বা জ্ঞানকে নিত্য বলা হইয়াছে। কিন্তু পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্ম-বোধ নামক গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোকানুসারে জ্ঞান বা বোধকে নিত্য বলিতে পারা যায় না। কারণ ঐ শ্লোকানুসারে জ্ঞানও

নষ্ট হয়। যাহা নষ্ট হয়, তাহা নিশ্চয়ই অনিত্য। সুতরাং তাহা নিশ্চয়ই আত্মা নহে। আত্মা নহে যাহা, তাহাই অনাত্মা। সুতরাং জ্ঞান বা বোধও অনাত্মা, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? অতএব সংসার এবং সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার যে অবস্থায় সত্য-বোধ হয়, সে অবস্থার সে বোধও নশ্বর, অনিত্য এবং অনাত্মা। যে অবস্থায় সংসার এবং সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার মিথ্যা-বোধ হয়, সে অবস্থার সে বোধও নশ্বর, অনিত্য এবং অনাত্মা। ঐ প্রকার নশ্বর, অনিত্য এবং অনাত্মা যে জ্ঞান বা বোধ, তাহা নিশ্চয়ই নিত্যাত্মার অস্তিত্ব-বোধেরও কারণ হইতে পারে না; এবং সেই নিত্যাত্মা কি, তাহাও ঐ প্রকার জ্ঞান বা বোধ, কথনই অবধারণ করিতে পারে না। যে বোধ বা জ্ঞান একই বিষয়কে কথন সত্যরূপে অবধারণ করায় এবং কথন বা অসত্যরূপে অবধারণ করায়, সে জ্ঞান বা বোধের কোন্ নির্দ্দেশ বিশ্বাস করা যাইবে? অতএব সেইজন্য সংসার সত্য কিম্বা মিথ্যা বলিবে? আমি বলি, যাঁহার সংসার এবং সাংসারিক ব্যাপারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংস্রব রহিয়াছে, যাঁহার সংসার প্রত্যক্ষ হইতেছে, যাঁহার সংসার ও সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারই সত্য-বোধ হইতেছে, তিনি সংসার এবং সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার অসত্য, কি প্রকারেই বা বলিবেন?

সপ্তম সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা।
যাবন্নজ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ং॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মই সর্ব্বাধিষ্ঠান জ্ঞান থাকে। সর্ব্বের বিদ্যমানতা রহিলে, জগল্লোপেরই বা প্রয়োজন কি? শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালার একোনবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"ঘটকুড্যাদিকং সর্ব্বং মৃত্তিকামাত্রমেবহি।
তদ্বদ্‌ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি বেদান্ত ডিম্ ডিমঃ॥"

সুতরাং ঐ শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই জগৎ সত্য প্রতিপন্ন করা হইল। আত্মবোধের সপ্তম শ্লোকানুসারে জানা যায়, ভ্রমবশত শুক্তিকাকেও রজত-বোধ হয়। কিন্তু সেই ভ্রম অপসারিত হইলে, আর শুক্তিকাকে রজত-বোধ হয় না সত্য; কিন্তু তখন শুক্তিকাকে, শুক্তিকা-বোধ অবশ্যই হয়। তখন অবশ্যই শুক্তিকাও মিথ্যা-বোধ করিবার কোন কারণই থাকে না। সুতরাং উক্ত বিচারানুসারে বুঝিতে হয়, ভ্রমবশত যাহাকে জগৎ-বোধ করা হয়, তাহা সত্য; কিন্তু তাহা জগৎ নয়। ভ্রমবশতই তাহাকে জগদ্দর্শন করা হয়, ভ্রমবশতই তাহাকে জগৎ-বোধ করা হয়; বাস্তবিক তাহা অজগৎ। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যেরই মতানুসারে 'ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি' স্বীকার করিলে, জগৎ যে অসত্য ইহাত প্রতিপন্ন হয় না; তদ্দ্বারা জগৎ সত্যই প্রতিপন্ন হয়। আত্মবোধের সপ্তম শ্লোকানুসারে জগৎ নাই, অথবা কোন কারণবশত তাহা থাকে না, বুঝিবার কোন কারণ নাই। শুক্তিকা যেমন মিথ্যা নয়, তদ্রূপ রজত মিথ্যা নয়। ভ্রমবশত শুক্তিকাকে রজত-দর্শন বা বোধই মিথ্যা। কিন্তু উক্ত শ্লোকানুসারেই রজত মিথ্যা বুঝিবার

কোন কারণ নাই। ভ্রমবশত যাহাকে জগদ্দর্শন করা হয়, অথবা ভ্রমবশত যাহাকে জগৎ-বোধ হয়, সেই ভ্রমাত্মক-দর্শন অথবা সেই ভ্রমাত্মক-বোধ মিথ্যা বটে; কিন্তু উক্ত সপ্তম শ্লোকানুসারে জগৎ মিথ্যা বুঝিবার কোন কারণই নাই। ঐ শ্লোকানুসারে রজত যেমন সত্য, তদ্রূপ এই জগৎও সত্য।

অষ্টম সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"সচ্চিদাত্মন্যনুস্যূতে নিত্যে বিষ্ণৌ বিকল্পিতাঃ।
ব্যক্তয়োর্ব্বিবিধাঃ সর্ব্বা হাটকে কটকাদিবৎ ॥"

উক্ত শ্লোকে নিজে শঙ্করাচার্য্যই যে নিত্য-বিষ্ণু, সে পরিচয় প্রদান করেন নাই। তাঁহার উক্ত শ্লোকে বিষ্ণু, তিনি ব্যতীত অপর কেহ বোধ হয়। উক্ত শ্লোকেও শঙ্করাচার্য্যের দ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত শ্লোকানুসারে শঙ্করাচার্য্যও নিত্য-বিষ্ণু স্বীকার করিতেন বোঝা যায়। আত্মবোধের উক্ত অষ্টম শ্লোকে,—

"সচ্চিদাত্মন্যনুস্যূতে নিত্যে বিষ্ণৌ বিকল্পিতাঃ।
ব্যক্তয়োর্ব্বিবিধাঃ সর্ব্বা হাটকে কটকাদিবৎ ॥"

বলায়, ব্যক্ত-বিবিধ-সর্ব্ব ও নিত্য-বিষ্ণু অভেদই বুঝিতে হয়। কারণ তাঁহার মতে নিত্য-বিষ্ণু যেন হাটক, আর সেই হাটকে বিকাশিত ব্যক্ত-বিবিধ-সর্ব্ব যেন কটকাদি। হাটকই কটকাদি বিবিধপ্রকার সমস্ত অলঙ্কার হয়। সুতরাং হাটক

এবং কটকাদি বিবিধপ্রকার সমস্ত অলঙ্কারে প্রভেদ নাই। নিত্য-বিষ্ণুই ব্যক্ত-বিবিধ-সর্ব্ব হইয়াছেন, সুতরাং নিত্য-বিষ্ণু এবং তাঁহাতে ব্যক্ত-বিবিধ-সর্ব্বে কোন প্রভেদ নাই। যেমন হাটক না থাকিলে কটকাদি অলঙ্কার সকল বিকাশিত থাকিতে পারে না। তদ্রূপ বিষ্ণু না থাকিলেও ব্যক্ত-বিবিধ-সর্ব্ব বিকাশিত থাকিতে পারে না। দ্বৈতাদ্বৈতমতেই বিষ্ণু, সত্য। সুতরাং তিনি যে সকল হইয়াছেন, সে সকলও সত্য।

নবম সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের নবম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"যথাকাশো হৃষীকেশো নানোপাধিগতো বিভুঃ।
তদ্ভেদাদ্ ভিন্নবদ্ভাতি তন্নাশাদেকবদ্ভবেৎ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারেও শঙ্করাচার্য্যের দ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত শ্লোকেও তিনি নিজেই হৃষীকেশ এবং বিভু বলেন নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে হৃষীকেশ-বিভু যে অপর, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। অষ্টম শ্লোকের আলোচনায় নিত্য-বিষ্ণুই সমস্ত প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারাই আকাশ, নানোপাধি, এবং সেই নানোপাধি-বশত যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাও সেই নিত্য-বিষ্ণু প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতএব সেইজন্য একই বহু, এবং বহুই এক বলা যাইতে পারে। যেমন এক বীজই বৃক্ষ হইলে, সেই একেই বহুর প্রকাশ দৃষ্ট হয়; তদ্রূপ একই নিত্য-বিষ্ণু-হৃষীকেশ-বিভু বহুপ্রকার বহু হইয়াছেন বলিয়া, সেই একই বহুপ্রকার বহু। সেইজন্য সেই

একই বহুপ্রকার বহু দৃষ্ট হইতেছে। পুরাণ-তন্ত্রানুসারেও সেই একই বহু-রূপী। কোন কোন পুরাণানুসারে বিষ্ণুই হৃষীকেশ। পূর্ব্বোক্ত অষ্টম শ্লোকানুসারে সমস্তই নিত্য-বিষ্ণু প্রতিপন্ন করা হইয়াছে বলিয়া, হৃষীকা বা ইন্দ্রিয় সমূহও সেই নিত্য-বিষ্ণু বলিতে হয়। আর তিনিই যে ঈশ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব তিনি অবশ্যই হৃষীকেশ। হৃষীকা বা ইন্দ্রিয় সমুহত নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহে, সুতরাং নিত্য-বিষ্ণু-হৃষীকেশ নিশ্চয়ই সগুণ-সক্রিয়। হৃষীকেশ অর্থে, ইন্দ্রিয় সমূহের ঈশ্বর স্বীকার করিলেও, উক্ত নবম শ্লোকে কেবল ঐ হৃষীকেশ শব্দ ব্যবহারেই দ্বৈতবাদ স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ শব্দ দ্বারা ঈশ এবং হৃষীকা বিভিন্ন, ইহাই স্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে বিভু শব্দ প্রয়োগ করায়, এক এবং বহু স্বীকার করাও হইয়াছে। কারণ বিভু শব্দ কেবল-বাচক নহে। বিভুর যে বহু বিভূতি আছে। সুতরাং ঐ বিভু শব্দ ব্যবহার করায়, এক-বিভু এবং তাঁহার বহু-বিভূতিও স্বীকার করা হইয়াছে।

দশম সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের দশম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"নানোপাধিবশাদেব জাতিনামাশ্রয়াদয়ঃ।
আত্মন্যারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদি ভেদবৎ ॥"

পূর্ব্বোক্ত অষ্টম শ্লোকানুসারে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সমস্তই নিত্য-বিষ্ণু। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ।"

উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে 'সর্ব্বমাত্মেতি' বলা হইয়াছে। অতএব নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মাই যে সমস্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? অতএব নানোপাধিও তিনি,—জাতি, নাম ও আশ্রয়ও তিনি;—তোয় এবং রস-বর্ণাদিও তিনি,—তেজও তিনি, আরোপও তিনি;—সুতরাং উক্ত সকলগুলিই উত্তম এবং প্রয়োজনীয় বলিতে হয়। উহারা সৎ-ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে বলিয়া, উহারাও সৎ। উহাদের প্রয়োজন না থাকিলে, উহাদের বিদ্যমানতাই দেখিতাম না। তাহা না হইলে নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মা ঐ সকল হইতেনই না। নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মাই নানোপাধি রহিয়াছেন, সুতরাং সেই নানোপাধিও সত্য। নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মাই জাতি-নামাশ্রয় রহিয়াছেন, সুতরাং সেই জাতি-নামাশ্রয় প্রভৃতিও সত্য। নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মই তোয় রহিয়াছেন, সুতরাং সেই তোয়ও সত্য। নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মাই রস-বর্ণাদি রহিয়াছেন, সুতরাং সেই রস-বর্ণাদিও সত্য। নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মাই আরোপ রহিয়াছেন, সুতরাং সেই আরোপও সত্য। নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মাই ভেদ রহিয়াছেন, সুতরাং সেই ভেদও সত্য। তবে ঐ সকল কখনও ব্যক্ত রহে, এবং কখনও বা অব্যক্ত রহে।

একাদশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

পঞ্চীকৃত মহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে ॥১১॥

পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং ॥১২॥
অনাদ্যবিদ্যা নির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ ॥১৩॥"

পূর্ব্বোক্ত দশম শ্লোকের মীমাংসা-সম্বন্ধে আলোচনায়-নিত্য-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মাই সমস্ত প্রমাণ করা হইয়াছে। সুতরাং তিন প্রকার শরীরও তিনি ব্যতীত অপর কিছু বলা যায় না। সুতরাং কর্ম্মও তিনি বলিতে হয়। সুখ-দুঃখও তিনি বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে সুখ-দুঃখও তিনি প্রমাণ করা হইলেও, সে সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তির আপত্তি আছে। তাঁহারা বলেন,—যেমন মন্ত, মন্তকে মত্ত করিতে পারে না; তদ্রূপ অবশ্যই দুঃখ, দুঃখকে কাতর করিতে পারে না। তদ্রূপ অবশ্যই সুখও সুখজনিত ফলভোগ করে না। ঐ প্রকার আপত্তি যে পক্ষের, সেই পক্ষের আপত্তিতে প্রতিবাদ করিয়া অপর পক্ষ বলেন যে, যিনি সমস্ত হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই মন্তপায়ীও বটেন; তিনি নিশ্চয়ই সুখী এবং দুঃখীও বটেন। সুতরাং তাঁহার মন্ত, সুখ এবং দুঃখভোগও হইতে পারে। উক্ত তিন প্রকার ভোগ-জনিত, ত্রিবিধ-ফলও তিনি ভোগ করেন।

দ্বাদশ সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্বোক্ত একাদশ সিদ্ধান্তে আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রয়োদশ শ্লোকে অনাদি-অনির্ব্বাচ্যা-অবিদ্যাকেই কারণ-শরীর বলা

হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে কারণ-শরীরও নিত্য-বিষ্ণু ব্রহ্মাত্মা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে আত্মা-ব্রহ্মই অনাদি। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থের মতে, এবং তাঁহার আত্মবোধ নামক গ্রন্থের ত্রয়োদশ শ্লোকানুসারেও কারণ-শরীর অবিদ্যা ও অনাদি। যাহার আদি নাই, তাহা নিশ্চয়ই নিত্য। ব্রহ্ম এবং অবিদ্যা উভয়েরই আদি নাই, সুতরাং উভয়ই নিত্য। শ্রুতি ও বেদান্তে দুই প্রকার নিত্যের বা সত্যের নির্দ্দেশ নাই। সুতরাং এক প্রকার নিত্য বা সৎই স্বীকার করিতে হয়। তবে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে **'সর্ব্বমাত্মেতি'** বলিয়াছেন বলিয়া, আত্মা-ব্রহ্ম ও অবিদ্যা অভেদ স্বীকার করিলে, আর দ্বিতীয়-নিত্য বা সৎ স্বীকার করিতে হয় না। তবে আত্মা-ব্রহ্মই অনাত্মা-অবিদ্যা স্বীকার করিলে, ঐ আত্মা-ব্রহ্মকে আর শ্রুতি-বেদান্তানুসারে নির্ব্বিকার বলা হয় না। উক্ত ত্রয়োদশ শ্লোকানুসারে অনাদি-অবিদ্যা-অনির্ব্বাচ্যা। যাহা নির্ব্বাচন করা যায় না, তাহা নিশ্চয়ই অজ্ঞেয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অনাত্মা-অবিদ্যাকে নির্ব্বাচন করা যায় না, সুতরাং তাহা জানিবার উপায়-জ্ঞানও নাই। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে আত্মা-ব্রহ্মকেও জানা যায়। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞানও হইতে পারে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে বোঝা যাইতেছে, অনাত্মা-বিদ্যা জ্ঞানাতীতা। তবে তাঁহার মতে জ্ঞেয়-আত্মা-ব্রহ্ম অপেক্ষা অজ্ঞেয়া-অনাত্মা-অবিদ্যার শ্রেষ্ঠতা আছে না কি? যে তাহা নির্ব্বাচন করিবার কোন উপায় নাই?

ত্রয়োদশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময় ইব স্থিতঃ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকো যথা॥"

এক স্বচ্ছাকারে, অপর আকার প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। এক স্বচ্ছ-জড়ে, অপর জড় প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। স্ফটিক স্বচ্ছ-জড়,—তাহাতে নীল-বস্ত্রাদি প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে আত্মাকে অজড়-অনাকার বলা যাইতে পারে, সুতরাং জড়-অন্নময়-কোষ, তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেই পারে না। তোমার চতুর্দ্দিকেই অনাকার-আকাশ বিদ্যমান। তাহাতে কোন জড়ইত প্রতিবিম্বিত হয় না। তবে অনাকার-অজড়-আত্মাতেই বা কোন জড়াকার কি প্রকারে প্রতিবিম্বিত হইবে? এক অনাকার অন্য অনাকারে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। অনাকার-আকাশে কি অনাকার-বায়ু প্রতিবিম্বিত হয়? অতএব সেইজন্য অনাকার-আত্মাতে অনাকার-মন, অনাকার-প্রাণ, অনাকার-বিজ্ঞান বা বুদ্ধি এবং অনাকার-আনন্দ প্রতিবিম্বিত হইতেই পারে না। আমি-আত্মাতেই বাক্‌শক্তি রহিয়াছে, কিন্তু আমি-আত্মাইত বাক্‌শক্তি-বোধ করি না। আমি-আত্মাতেই মন রহিয়াছে, কিন্তু আমি-আত্মাইত মন-বোধ করি না। আমি-আত্মাতে প্রাণ রহিয়াছে, কিন্তু আমি-আত্মাইত প্রাণ-বোধ করি না। আমি-আত্মাতেই বিজ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু আমি-আত্মাইত বিজ্ঞান-বোধ করি না। আমি-আত্মাতেই আনন্দ রহিয়াছে, কিন্তু আমি-আত্মাইত আনন্দ-বোধ করি না।

আমাতে নিয়ত যাহারা রহিয়াছে, আমি তাহাদের সঙ্গে আপনাকেই অভেদ-বোধ করি না; তবে আমাতে কিছু প্রতি-বিম্বিত হইলে, আমি আপনাকে তাহা বোধ করিব কেন? সেই-জন্য বলি, আত্মবোধ গ্রন্থের চতুর্দ্দশ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্যের—

"পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময় ইব স্থিতঃ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকো যথা॥"

বলা সঙ্গত হয় নাই।

চতুর্দ্দশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"বপুস্তুষাদিভিঃ কোষৈর্যুক্তং যুক্ত্যবঘাততঃ।
আত্মানমন্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তণ্ডুলং যথা॥"

তণ্ডুল যে আবরণে আবৃত থাকে, সে আবরণও যাহা, তণ্ডুলও যে তাহাই। তণ্ডুল যাহার বিকাশ, তণ্ডুলের আবরণও যে তাহারই বিকাশ; সুতরাং উভয়ে অভেদ। তণ্ডুল এবং তণ্ডুলের আবরণ যেভাবে অভেদ, আত্মা এবং পঞ্চকোষও কি সেইভাবে অভেদ? তণ্ডুল এবং তণ্ডুলের আবরণ যেমন একেরই দ্বি-প্রকার বিকাশ, তদ্রূপ আত্মা এবং তাঁহার পঞ্চপ্রকার আবরণ বা কোষও কি একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ? উক্ত পঞ্চদশ শ্লোকানুসারে আত্মা যেন তণ্ডুল, সেই আত্মার আবরক পঞ্চকোষ যেন তুষাদি। সুতরাং তণ্ডুল এবং তাহার তুষাদি যে প্রকারে অভেদ, যে প্রকারে তাহারা একেরই ভিন্ন

ভিন্ন বিকাশ; সেই প্রকারে উক্ত পঞ্চদশ শ্লোকানুসারে আত্মা এবং তাঁহার আবরক পঞ্চকোষ, অভেদ এবং একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ।

পঞ্চদশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের ষোড়শ শ্লোকে বলা হইয়াছে —

"সদা সর্ব্বগতেঽপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ॥"

পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ শ্লোকানুসারে বুদ্ধিও পঞ্চকোষাদির অন্তর্গত। ঐ. শ্লোকানুসারে শুদ্ধাত্মাতেই পঞ্চকোষাদি প্রতিবিম্বিত হয় বোঝা যায়। সুতরাং ঐ শুদ্ধাত্মাতে বুদ্ধিও প্রতিবিম্বিত হয় স্বীকার করিতে হয়। ঐ শ্লোকানুসারে বোঝা যায়, আত্মা কোন কোষেই প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না। কারণ ঐ শ্লোকানুসারে আত্মা যেন স্ফটিক,—স্ফটিক শ্বেতবর্ণ; সুতরাং তাহা অন্য কোন বর্ণেই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। ঐ শ্লোকানুসারে আত্মা যেন শ্বেতবর্ণ স্ফটিক, এবং পঞ্চকোষাদি যেন নীল প্রভৃতি অন্যান্য বর্ণ-বিশিষ্ট; সুতরাং ঐ পঞ্চকোষের কোন কোষেই শ্বেত-স্ফটিকবৎ-শুদ্ধাত্মা প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না। অতএব ঐ পঞ্চকোষের অন্তর্গত স্বচ্ছ-বুদ্ধিতেও আত্মা প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না। উপরোক্ত ষোড়শ শ্লোকানুসারে ঐ স্বচ্ছ-বুদ্ধি যেন শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট স্বীকার করিলেও, শ্বেত-স্ফটিকবৎ-শুদ্ধাত্মা তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না। কারণ এক প্রকার শ্বেত-পদার্থে অন্য প্রকার শ্বেত-

পদার্থ প্রতিবিম্বিত হইতেই পারে না। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে আত্মা, স্বপ্রকাশ। সেই স্বপ্রকাশ-আত্মার প্রকাশের কারণ স্বচ্ছ-বুদ্ধিও হইতে পারে না। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের বিংশ শ্লোকের প্রথম চরণানুসারে—

"আত্মাপ্রকাশকঃ স্বচ্ছো দেহস্তামস উচ্যতে।"

সুতরাং আত্মারই প্রকাশকতা এবং স্বচ্ছতা আছে। আমি-আত্মা দেহস্থই বোধ করি, কিন্তু আমি-আত্মাত বুদ্ধিস্থ অথবা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত বোধ করি না। আমাতেই বুদ্ধি আছে বুঝিতে পারি, কিন্তু আমি বুদ্ধিতে আছি বুঝি না। উক্ত ষোড়শ শ্লোকানুসারে আত্মা সদা সর্ব্বত্রে বর্ত্তমান। তুমিওত আত্মা। তবে আত্মা যদি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তাহা হইলে তুমি-আত্মা সর্ব্বত্রই আছ, বোধ কর না কেন?

ষোড়শ সিদ্ধান্ত।

আত্মাবোধ গ্রন্থের সপ্তদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি প্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণং।
তদ্বৃত্তি সাক্ষিণং বিন্দ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা॥"

অসি নিজে কি ছেদন করে? কিছু ছেদন করিতে হইলে ছেদন-কর্ত্তার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ছেদন-কর্ত্তা নিজে ইচ্ছানুসারে অসি দ্বারায় ছেদন করিতে পারেন। অসি যেমন ছেদন করিবার কর্ত্তা নহে, তদ্রূপ দেহও কর্ম্ম-কর্ত্তা নহে, মনও কর্ম্ম-কর্ত্তা নহে এবং প্রকৃতিও কর্ম্ম-কর্ত্তা নহে। সকল প্রকার কর্ম্ম-কর্ত্তা স্বয়ং আত্মা। ছেদন-কর্ত্তার ছেদন করিবার যন্ত্র যেমন অসি, তদ্রূপ

না করিয়াও কর্ম্ম করেন বলিয়া, কাহারত বোধ হয় না? আত্মা যখন নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়, তখন তিনি আপনাকে কখনই সগুণ-সক্রিয় বোধ করেন না। আত্মা যখন সগুণ-সক্রিয়, তখনও তিনি আপনাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বোধ করিতে পারেন না। কারণ যতক্ষণ বোধ করা হয়, ততক্ষণও কর্ম্ম করা হয়। আত্মা যখন সগুণ-সক্রিয়, তখন তিনি আপনাকে সগুণ-সক্রিয়াই বোধ করেন। আপনাকে সগুণ-সক্রিয় বোধ করিয়াও যদি বলা হয় আমি নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়, সে কথা অবশ্যই অসত্য। এই জগৎ হইতে মেঘমালাও বহু দূরস্থ, এবং শশীও বহু দূরস্থ। সুতরাং কেহ ভ্রান্তিক্রমে সেই মেঘমালা ধাবিত হইলে শশী ধাবিত হইতেছে, দর্শন এবং বোধ করিতে পারেন। তবে নিজে কোন কর্ম্ম না করিয়াও, কি ভ্রান্তিক্রমে নিজেই কর্ম্ম করা হইতেছে বোধ হইতে পারে? ঐ প্রকার বোধ করাও যে কর্ম্ম। ঐ প্রকার বোধ যিনি করেন, তিনি কখনই অকর্ম্মী নহেন। যিনি ঐ প্রকার বোধ করেন, তিনিওত আত্মা। তবে আত্মাকে অকর্ম্মী-অব্যাপারী কি প্রকারে বলা যায়? তোমার ঐ দেহত অখণ্ড। তোমার ঐ দেহের কোন অংশ ছেদন করিলে কি তোমার দেহের সর্ব্বাংশই ছেদন করা হইতেছে বোধ কর? ঐ দেহের একাংশ ছেদন জন্য কি তোমার ঐ দেহের সর্ব্বাংশেই যন্ত্রণা বোধ কর? তাহা কখনই কর না। তবে তোমার ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করিলে, তাহারা স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেই বা, তাহাদের কর্ম্ম করায় তুমি কর্ম্ম করিতেছ;—তাহারা স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেই বা, তাহারা যে সকল ব্যাপারে ব্যাপৃত, সে সকল ব্যাপারে তুমিই ব্যাপৃত, ইহা তোমার বোধ হইবে

কেন? তুমিত তোমার ইন্দ্রিয়গণ হইতে বহু দূরস্থ নহ। আর তুমি তোমা হইতে বহু দূরেও অবস্থান করিতে পার না। তবে ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করিলে তুমি কর্ম্ম করিতেছ, তোমার এ বোধই বা হইবে কেন? আমি কর্ম্ম করিলেও যদি আমি কর্ম্ম করি না বলা হয়, তাহা হইলে আমি যে আছি বোধ করিতেছি, তাহাও অসত্য, তুমি অনায়াসেই বলিতে পার। শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার নির্ব্বাণষট্‌ক ও আত্মষট্‌ক অনুসারে, তিনি সম্পূর্ণ নিগু´ণ-নিষ্ক্রিয়। অথচ ঐ দুই গ্রন্থে যে সমস্ত ভাব আছে, সে সকলও তাঁহাতে উদয় হইয়াছিল। তখনও কি তিনি সগুণ-সক্রিয় ছিলেন না? ঐ দুই গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলী যখন লিখিয়াছিলেন, তখনও কি তিনি সগুণ-সক্রিয় ছিলেন না? যিনি আত্মষট্‌কে বলিতেছেন,—

"নাহং দেহো নেন্দ্রিয়ান্যং তরঙ্গং,
নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ।
দারাপত্য ক্ষেত্র বিত্তাদি দূরে,
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোঽহং ॥ ১ ॥
রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জুর্যথাহি,
স্বাত্মজ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ।
আপ্তোক্ত্যাহি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জু-
র্জীবো নাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোঽহং ॥ ২ ॥
মত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদস্তীহ বিশ্বং,
সত্যং ব্রাহ্মং বস্তু মায়োপক্লিপ্তং।

বোধ করিবার কারণ কি আছে? কাহারও গাত্রাবরক জামাকে কি গাত্র বোধ হয়? তদ্রূপ সচ্চিদাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়গণ ও দৈহিক এবং ইন্দ্রিয়গণের গুণ-কর্ম্ম-সকল ঐ অমল-সচ্চিদাত্মাকে আবৃত করিয়া থাকিলেও, ঐ সচ্চিদাত্মার আপনাকে দেহ, ইন্দ্রিয়গণ অথবা গুণ-কর্ম্ম-সকল বোধ করিবার কোন কারণই নাই। যদি বল, ঐ প্রকার বোধ সচ্চিদাত্মার হয় না, তোমার নিজের হয়, তাহাও বলিতে পার না; কারণ শঙ্করাচার্য্যের অনেক গ্রন্থানুসারেই সেই সচ্চিদাত্মা, তুমি। তুমি-সচ্চিদাত্মাই, ঐ উপাধানটী যে বস্ত্রাবরণে আবৃত রহিয়াছে, তাহাত বুঝিতেছ। তুমি কি ঐ উপাধান এবং তাহার আবরণ, অভেদ-বোধ করিতেছ? তুমি অপরের আবরণ এবং অপর, অভেদ-বোধই কর না; তবে তোমার কোন প্রকার আবরণকে তুমি স্বয়ং, কি প্রকারে বোধ করিবে? তাই বলি, তোমার আবরণ,—দেহেন্দ্রিয়ের গুণ এবং কর্ম্ম-নিচয়, তোমার নিজের গুণ এবং কর্ম্ম-নিচয় বলিয়া বোধ হইতে পারে না। আর অমল-সচ্চিদাত্মা যে তুমি, তোমার অবিবেক আছে কিম্বা হইতে পারে, কি প্রকারেই বা স্বীকার করা যায়?

বিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের একবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অজ্ঞানান্মানসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি।
কল্প্যতেঽম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদির্যথাম্ভসঃ॥"

চন্দ্র-প্রতিবিম্বের সহিত আত্মার তুলনাই হইতে পারে না।

কারণ আত্মাত কিছুর প্রতিবিম্ব নয়? বরঞ্চ চন্দ্রের সহিত আত্মার তুলনা করিলে কতক পরিমাণে সঙ্গত হয়। জল এবং অন্যান্য স্বচ্ছ-পদার্থেই চন্দ্র-প্রতিবিম্ব দর্শন করা যায়। ঐ সকলের অভাবে একই গগণ-চন্দ্র দর্শন করা যায়। সেইজন্যই শ্রুতি-বেদান্তমতে প্রতিবিম্ব মিথ্যা। উক্ত একবিংশ শ্লোকানুসারে আত্মা যেন চন্দ্র-প্রতিবিম্ব। তবে কি শঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মা মিথ্যা? চন্দ্রে প্রকাশকতা আছে, চন্দ্র কিরণ বিকীর্ণ করে, অতএব চন্দ্রও সগুণ-সক্রিয়; কিন্তু চন্দ্র-প্রতিবিম্বে প্রকাশকতা নাই এবং তাহা কিরণ বিকীর্ণও করে না, তাহা সম্পূর্ণ নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়। শঙ্করাচার্য্যও আত্মবোধের একবিংশ শ্লোকে ঐ প্রকার নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়ের সহিতই আত্মার তুলনা করিয়াছেন। সুতরাং তাহারই মতে আত্মাকে এক প্রকার অ-কিছুই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আর উক্ত একবিংশ শ্লোকেই 'অজ্ঞানান্মানসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি' বলায়, আত্মা অকর্ত্তাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। জড়েরওত কর্ত্তৃত্ব নাই। তবে শঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মাও কি অকর্ত্তা-জড়ের মতন কোন-কিছু? অকর্ত্তা-জড়কে কর্ত্তা-অজড়, যে কোন প্রকারে ব্যবহার করিতে পারেন। অকর্ত্তা-জড় কর্ত্তা-অজড়ের সম্পূর্ণ অধীন। উক্ত একবিংশ শ্লোকানুসারে মানসোপাধিই কর্ত্তা। উক্ত শ্লোকানুসারে মানসোপাধিরই কর্ত্তৃত্ব। উক্ত শ্লোকানুসারে অজ্ঞানবশত ঐ মানসোপাধির কর্ত্তৃত্বকে, অকর্ত্তা-আত্মার কর্ত্তৃত্ব বলিয়া বোধ হয়। ঐ প্রকার বোধ, শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে অকর্ত্তা-আত্মারই হয়। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে আত্মার আত্মবোধ হয় স্বীকার করিলে, ঐ প্রকার বোধ

অন্য কিছুর হয়, কি প্রকারেই বা স্বীকার করা যায়? শ্রুতি-বেদান্তানুসারে বোধ বা জ্ঞান বহু নহে। বোধ বা জ্ঞানের বহুত্ব স্বীকার করিলে, বোধ বা জ্ঞানও অনাত্মা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং শ্রুতি-বেদান্তানুসারে বোধ বা জ্ঞান, কেবল আত্মারই হইয়া থাকে। শ্রুতি, বেদান্ত এবং শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে আমিই আত্মা। আমি কত প্রকার কর্ম্মইত করিয়া থাকি, সুতরাং আমি অকর্ত্তা কি প্রকারে? আমি-আত্মা কোন কর্ম্ম না করিলে, আমি-আত্মা নানাপ্রকার কর্ম্ম করি, আমি-আত্মার বোধই হইত না। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে, ক্ষুধার উদ্রেক বোধ হয় না। যদি ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও ক্ষুধার উদ্রেক বোধ হইত, তাহা হইলে ঐ প্রকার বোধ নিয়ত হয় না কেন? তদ্রূপ আমি যখন কর্ম্ম করি, তখনই আপনাকে কর্ত্তা বোধ করি। আমি সুষুপ্তি-বশত যখন কিছু করি না, তখন আমি কর্ত্তা, ইহাও বোধ করি না। সুতরাং নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে, আমি যখন কর্ম্ম করি, তখনই আমাকে আমার কর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়; এবং আমি যখন কর্ম্ম করি না, তখন আমাকে কর্ত্তা বলিয়া আমার বোধ হয় না। সেইজন্যই বলি, কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্ম করি এবং আপনাকে কর্ত্তা-বোধ, হইতেই পারে না। আর আমি-আত্মা, নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়-চন্দ্র-প্রতিবিম্বের ন্যায় সলিল-আলোড়নেও আলোড়িত হই না; নিজে কর্ম্ম না করিয়াও কর্ম্ম করিতেছি, বোধ করি না। চন্দ্র-প্রতিবিম্বের যদি বোধ থাকিত, তাহা হইলে সে কি সলিলের চলনাদি, নিজের চলনাদি বোধ করিত? ঐ রক্তবস্ত্রের আভা আমার দেহে দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া, কি আমার

দেহই রক্ত-বস্ত্র বোধ করিতেছি? তদ্রূপ আমি কিছু না করিয়া কিছু করি, কখনই বোধ করিতে পারি না। আমার দেহে আঘাত লাগিলে দেহ কষ্ট-বোধ করে না, তাহাত অনেক সময় বুঝিয়াছি। দেহে আঘাত লাগিলে আমারই যন্ত্রণা-বোধ হয়। ক্ষুধা-বশত আমিই কাতর হই, সুখ-দুঃখ আমিই বোধ করি, তাহাত আমি জানি; নানাপ্রকার কথা আমিই কহি, তাহাওত আমি জানি; তবে আমি-আত্মা নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়-অকর্ত্তা কি প্রকারে?

একবিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের দ্বাবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"রাগেচ্ছা সুখদুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ॥"

দর্শন এবং উপলব্ধির দ্বারা যাহা নিশ্চয় করা যায়, তাহা কেবল তর্ক দ্বারা খণ্ডন করিলে কি উপকার হইতে পারে? আমি ইচ্ছা করি, তাহা আমি উপলব্ধির দ্বারা জানি। রাগ এবং সুখ-দুঃখাদিও আমি বোধ করি, তাহাও আমি জানি। অদ্বৈত-মতের কোন কোন শ্লোকানুসারে আমি দেহ নই, আমার দেহ; অথচ সেই দেহের দ্বারা আমি কত প্রকার কর্ম্মই করিয়া থাকি। সেইজন্য কি বলিতে হইবে, সে সমস্ত কর্ম্ম আমি করি না, সে সমস্ত দেহই করে? অদ্বৈতমতানুসারে বুদ্ধি আমি নই, তবে যে প্রকারে দেহ আমার, সেই প্রকারে বুদ্ধিও আমার বলা যাইতে পারে। আমার দেহাবলম্বনে আমি যেমন নানাপ্রকার

কর্ম্ম করি, তদ্রূপ আমার বুদ্ধি অবলম্বনেই বা আমি নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইব না কেন? আমার বুদ্ধি অবলম্বনে আমি ইচ্ছা করিতে পারি, রাগ করিতে পারি এবং সুখ-দুঃখাদি বোধও করিতে পারি। সেজন্য ঐ সমস্ত করিবার অথবা বোধ করিবার কর্ত্তা কি বুদ্ধি বলিতে হইবে? আমি যাহা সম্ভোগ করি, তাহা অন্য কেহ সম্ভোগ করে, কখনই বলা যায় না। আমি সুখ-দুঃখ ভোগ করি,—তবে অন্য কেহ ঐ দুই আমার পরিবর্ত্তে ভোগ করে, কি প্রকারে বলি? আমি আছি বোধ থাকিলে, মৎ-সংক্রান্ত বুদ্ধি প্রভৃতির কোনটীই অব্যক্ত অথবা নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়-ভাবে থাকে না। সুষুপ্তিকালে বুদ্ধির নাশও হয় না কিম্বা সেকালে বুদ্ধি থাকে নাও বলিতে পার না। সুষুপ্তিকালে আমি আছি-বোধ, আমার নিজেরই থাকে না। সেইজন্য কি বলিতে হইবে, তখন আমি নষ্ট হই, অথবা তখন আমি থাকি না? সুষুপ্তিকালে আমি যেমন আমিকেও ব্যক্ত-বোধ করি না, তদ্রূপ আমার বুদ্ধি প্রভৃতিকেও ব্যক্ত-বোধ করি না। সেইজন্য সে অবস্থায় আমার বুদ্ধি প্রভৃতির নাশ হয় কি বলিতে পারি? না ঐ প্রকার বলা উচিত? আমাতে সুষুপ্তির প্রভাব যখন থাকে না, তখন আমি আছি-বোধ যেমন করি, তদ্রূপ আমার দেহ-বুদ্ধি প্রভৃতিও আছে, বোধ করি। এই জাগ্রতাবস্থাতেও তোমার মধ্যে অব্যক্তভাবে রাগ রহিয়াছে। এক্ষণে তোমাতে যে রাগ রহিয়াছে, তাহা তুমি অনুভূতির দ্বারা জানিতেছ না; অথচ প্রয়োজনানুসারে সেই রাগ তোমা হইতে প্রকাশ হয় বলিয়া, সে রাগের প্রকাশ যখন তোমাতে থাকে না; তখনও সে রাগ নষ্ট হয় না, স্বীকার করিতে

হয়। বুদ্ধিও কোন অবস্থায় তোমাতে অব্যক্ত এবং নিষ্ক্রিয়-ভাবে থাকিলে তুমি বলিতে পার না, সে অবস্থায় তোমার বুদ্ধির নাশ হয়, অথবা তাহা থাকে না। পরে যখন তাহা তোমাতেই প্রকাশ হয়, তখন অবশ্যই অব্যক্তভাবে এবং নিগুর্ণ-নিষ্ক্রিয়-ভাবে তাহা তোমাতেই থাকে; প্রয়োজনানুসারে তাহার প্রকাশ হয়।

দ্বাবিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনির্ম্মলতাত্মনঃ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে স্পষ্টই জানা যায়, অর্কের যেমন স্বভাব আছে, তোয়ের যেমন স্বভাব আছে, অগ্নির যেমন স্বভাব আছে, তদ্রূপ আত্মারও স্বভাব আছে। উক্ত শ্লোকানুসারে জানা যায়, আত্মার স্বভাব এক প্রকার নহে। উক্ত শ্লোকানুসারে তাঁহার সৎ-স্বভাব, চিৎ-স্বভাব, আনন্দ-স্বভাব, নিত্য-স্বভাব এবং তাঁহার সেই স্বভাবে নির্ম্মলতা আছে বলিয়া নির্ম্মল-স্বভাব। স্বভাব যাঁহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই সগুণ-সক্রিয়। কারণ স্বভাবই গুণ-কর্ম্মের পরিচায়ক। আর গুণ-কর্ম্মের প্রভেদানুসারে সকলের স্বভাবও এক প্রকার নহে, তাহা স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই অর্ক প্রভৃতির স্বভাবের বিভিন্নতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বুঝাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যেরই উক্ত ত্রয়োবিংশ শ্লোকানুসারে আত্মার স্বভাব আছে বলিয়া, আত্মাও সগুণ-সক্রিয় বলিতে হয়। অর্ক-প্রকাশক, তাঁহাতে প্রকাশকতা আছে বলিয়া;

প্রকাশকতা যাহা, তাহাই প্রকাশক নহে;—সুতরাং অর্ক অদ্বৈত নহে। তোয় শীতল, তাহাতে শীতলতা বা শৈত্য আছে বলিয়া; শীতলতা বা শৈত্য যাহা, তাহাই শীতল নহে;—সুতরাং তোয় অদ্বৈত নহে। অগ্নি উষ্ণ, তাহাতে উষ্ণতা আছে বলিয়া; উষ্ণতা যাহা, তাহাই উষ্ণ নহে;—সুতরাং অগ্নি অদ্বৈত নহে। আত্মা সৎ-সম্পন্ন, তাঁহাতে সৎ আছেন বলিয়া; সৎ যাহা, তাহাই সৎ-সম্পন্ন নহে;—সুতরাং সৎ-সম্পন্ন-আত্মা অদ্বৈত নহেন। আত্মা চিৎ-সম্পন্ন, তাঁহাতে চিৎ আছেন বলিয়া; চিৎ যাহা, তাহাই চিৎ-সম্পন্ন নহে;—সুতরাং চিৎ-সম্পন্ন-আত্মা অদ্বৈত নহেন। আত্মা আনন্দ-সম্পন্ন, তাঁহাতে আনন্দ আছেন বলিয়া; আনন্দ যাহা, তাহাই আনন্দ-সম্পন্ন নহে;—সুতরাং আনন্দ-সম্পন্ন-আত্মা অদ্বৈত নহেন। আত্মা নিত্য-সম্পন্ন, তাঁহাতে নিত্য আছেন বলিয়া; নিত্য যাহা, তাহাই নিত্য-সম্পন্ন নহে;—সুতরাং নিত্য-সম্পন্ন-আত্মা অদ্বৈত নহেন। আত্মা নির্ম্মল, তাঁহাতে নির্ম্মলতা আছে বলিয়া; নির্ম্মলতা যাহা, তাহাই নির্ম্মল নহে;—সুতরাং নির্ম্মল-আত্মাও অদ্বৈত নহেন। পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অনেক গ্রন্থেই আত্মা সচ্চিদানন্দ ও আত্মা নিত্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আত্মবোধের উক্ত ত্রয়োবিংশ শ্লোকানুসারে, আত্মা সচ্চিদানন্দ কিম্বা আত্মা নিত্য বলা যায় না। উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মার স্বভাব সচ্চিদানন্দ, নিত্য ও নির্ম্মলতা। স্বভাব এবং যাঁহার স্বভাব, উভয়ে অভেদ নহে; সেইজন্য আত্মা এবং তাঁহার স্বভাব সচ্চিদানন্দ, নিত্য ও নির্ম্মলতা অভেদ নহে।

ত্রয়োবিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশ শ্লোকানুসারে আত্মারও অংশ আছে। ঐ শ্লোকে বলা হইয়াছে, 'আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ।' যাহার অংশ আছে, বা যাহাকে অংশ করা যাইতে পারে, তাহাকে অবশ্যই অখণ্ড বলা যায় না; অথচ অদ্বৈতমতের অনেক গ্রন্থেই আত্মাকে অখণ্ড বলা হইয়াছে। আর আত্মার সচ্চিদংশ স্বীকার করিলে, আত্মার অন্যান্য অংশ আছে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সৎ এবং চিৎ, এক বস্তু নহে। সৎ অর্থে, সত্য বা নিত্য। চিৎ অর্থে, সম্বিত, বোধ বা জ্ঞান। সুতরাং সৎ এবং চিৎ, এক বস্তু নহে। যদি বল, একই আত্মার সৎ এক প্রকার বিকাশ এবং চিৎ তাঁহারই অন্য প্রকার বিকাশ, তাহাও বলিতে পার না। কারণ অনাত্মা-প্রকৃতির ন্যায় আত্মার বহু-প্রকারতা আছে স্বীকৃত হইলে, আত্মারও পরিবর্ত্তন আছে, আত্মারও বিকার আছে, স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে আত্মাকেও আত্মা না বলিয়া অনাত্মাই বলিতে হয়। কিন্তু কত শ্রুতি ও অদ্বৈতমতের গ্রন্থে, আত্মাকে অনাত্মার সঙ্গে অভেদ বা অনাত্মা আত্মার একটি নাম, বলা হয় নাই। ঐ সকল গ্রন্থানুসারে অনাত্মা, আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা স্বতন্ত্র।

চতুর্ব্বিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্ব্বৃত্তিরিতিদ্বয়ং।
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে॥"

কিন্তু ঐ প্রকার স্বীকার করিলে, জ্ঞানকেও অনিত্য, অসত্য বা প্রাকৃত স্বীকার করিতে হয়। কারণ উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মার সচ্চিদংশ এবং বুদ্ধি-বৃত্তি সংযোগ দ্বারা অবিবেক-বশত আমি জানি, এই বোধ বা বাক্য-স্ফূরিত হয় স্বীকৃত হইলে, অবশ্যই জ্ঞানের নিত্যতা বা সত্যতা স্বীকার করা যায় না। কারণ উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে, অবিবেক-বশত আমি জানি, এই বোধ প্রবর্ত্তিত হয়। অবিবেক দ্বারা যাহা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাও অবশ্যই নিত্য এবং সত্য নহে। কারণ অবিবেকও অসত্য-অনিত্য-অজ্ঞান বা অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ। অদ্বৈতমতানুসারে কথিত-চিত্ত ও চিত্ত-বৃত্তি বা চিত্ত-বৃত্তি-নিচয়ও অজ্ঞান বা অনাত্মার বিকাশ। সৎ এবং চিৎ এক হইলে, সৎ এবং চিৎ বিভিন্ন দুই শব্দই বা কেন আছে? এবং উভয়ের অর্থ-গত বিভিন্নতাই বা কেন আছে? সুতরাং ঐ উভয়ই আত্মা নহে। সুতরাং ঐ উভয়ই নিত্য-সত্য নহে। সুতরাং ঐ দুইও প্রকৃতি অথবা অনাত্মারই অংশ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অবিবেক-বশত চিত্ত-বৃত্তির সহিত ঐ দুয়ের অংশ যোগ দ্বারা যে আমি জানি বোধ করি, সেই বোধ কথনই নিত্য-সত্য নহে। তাহা কথনই ব্রহ্মাত্মা নহে।

পঞ্চবিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ নামক গ্রন্থের পঞ্চবিংশ শ্লোকানুসারে 'আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি' স্বীকার করিলে, আত্মাকে অবিকৃত বলিতে হয়। আত্মা অবিকৃত স্বীকার করিলে, তাঁহার নিজ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আছেও স্বীকার করা

যায় না। কারণ আত্মা ও আত্মজ্ঞান অভেদ নহে, তাহা এই সিদ্ধান্তদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য, আত্মারও আত্মজ্ঞান হয়, তাহা তাঁহার অনেক স্থলেই স্বীকার করিয়াছেন। আত্মা ও আত্মজ্ঞান অভেদ স্বীকার করিলেও, আত্মা ও আত্মজ্ঞান উভয়-কেই প্রাকৃত বলিতে হয়। কারণ প্রসিদ্ধ শ্রুতিমতে, বেদান্ত-দর্শনমতে এবং শঙ্করাচার্য্যের অনেক গ্রন্থের অনেক শ্লোকানু-সারেই আত্মার কোন প্রকার বিকাশ নাই। ঐ সকল মতে আত্মার বহু-প্রকারতা নাই। ঐ সকল মতে আত্মার কেবল এক-প্রকারতা। ঐ সকল মতে আত্মার কোন প্রকার পরি-বর্ত্তনই নাই। আত্মা এক প্রকার এবং আত্মজ্ঞান অন্য প্রকার। সুতরাং উভয়ই এক প্রকার নহে বলিয়া, অদ্বৈতমতানুসারে ঐ উভয়কে অভেদ ও এক বলা যায় না। তাহা বলিলে, আত্মা এবং আত্মজ্ঞানকে প্রাকৃত বলিতে হয়। কারণ প্রকৃতির বিকার আছে বলিয়া, তাহার বহু-প্রকারতা এবং বহু-পরিবর্ত্তনও আছে। এক প্রকৃতিকে বহু-প্রকার দর্শনও করা যায়।

ষড়বিংশ সিদ্ধান্ত।

বোধ যাহার নাই, তাহাকেই জড় বলা যাইতে পারে। জড় যাহা, তাহা আত্মা নহে। পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ শ্লোকে 'বুদ্ধের্বোধো ন জাত্বিতি' বলায়, তাঁহার মতেও বুদ্ধি জড়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে যাহার বোধ নাই, তাহাই জড় এবং তাহাই অনাত্মা। সুতরাং সেইজন্য শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই

বুদ্ধিকে অনাত্মা-জড়া বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য 'আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধো ন জাত্বিতি' বলায়, আত্মা এবং বুদ্ধি অভেদ বুঝিবার কোন কারণই নাই। শঙ্করাচার্য্যের উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মাই বুদ্ধি নহে বলিয়া, বুদ্ধি অনাত্মা। অনাত্মা যাহা, তাহাই প্রকৃতি ও তাহাই অবিদ্যা। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে ভবাণীকেও অনাত্মা বলিতে হয়, কারণ তিনি বুদ্ধিকেই ভবাণী বলিয়াছেন। তাঁহার যতি-পঞ্চক নামক গ্রন্থে আছে, 'বুদ্ধির্ভবানী'। আবার তিনি সেই অনাত্মা-বুদ্ধি-ভবাণীর স্তবও করিয়াছেন। তাঁহার সেই স্তবটির নাম ভবান্যষ্টক। সেই স্তব পাঠ করিলে, তাহাতেও শঙ্করাচার্য্যের দ্বৈতবাদ-স্বীকার দৃষ্ট হয়।

সপ্তবিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ শ্লোক পাঠ করিলে, আত্মা এবং জীব অভেদ বুঝিবার কোন কারণ নাই। অথচ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মনামাবলী-মালার একবিংশ শ্লোকে 'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' বলায়, জীব এবং ব্রহ্ম অভেদই বুঝিতে হয়। অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থে ঐ শঙ্করাচার্য্যের গুরুদেব শ্রীমদ্ভগবৎ-গোবিন্দ-পাদাচার্য্য-পরিব্রাজক-পরমহংস-স্বামীও জীবেশ্বরের অভেদত্ব বা ঐক্যও স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত মদ্ভগবৎ-গোবিন্দ-পাদাচার্য্য-পরিব্রাজক-পরমহংস-স্বামী তাঁহার অদ্বৈতানুভূতিতে বলিয়াছেন,—

"জীবেশ্বরাদিভাবেন ভেদং পশ্যতি মূঢ়ধীঃ।
নির্ভেদনির্বিশেষেঽস্মিন্ কথং ভেদো ভবেদ্ধ্রুবং ॥৭৩॥"

অষ্টবিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ শ্লোকের শেষ চরণানুসারে, জীব এবং আত্মা অভেদ বুঝিবার কোন কারণই নাই। ঐ পঞ্চবিংশ শ্লোকানুসারে আত্মা কিম্বা বুদ্ধি,—জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা নহেন। ঐ শ্লোকানুসারে জীবই জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা। ঐ শ্লোকানুসারে জীবই আত্মা, অথবা আত্মাই জীব, যদি বুঝিবার কোন কারণ না থাকে; তাহা হইলে জীবকেও সৎ, সত্য বা নিত্যও বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে সেই জীবের জ্ঞানকেই বা কি প্রকারে সৎ, সত্য বা নিত্য বলা যায়? তাহা হইলে সেই জীবের জ্ঞানকে সৎ, সত্য বা নিত্য বলা যায় না। আর যে জ্ঞান দ্বারা আত্মা এবং বুদ্ধিই সমস্ত বোধ হয়, সে জ্ঞানকে কথনই সৎ বলা যায় না। কারণ আত্মজ্ঞান দ্বারা বহু-বোধ হয় না। তদ্দ্বারা কেবল এক অদ্বৈতাত্মাই বোধ হয়। আত্মার আত্মজ্ঞান হইলে, সেই আত্মার মোহ হইতে পারে না। যে জ্ঞানের সহিত মোহের সংস্রব আছে, সে জ্ঞান কথনই নির্ম্মল-আত্মজ্ঞান নহে। তাহা নিশ্চয়ই অনাত্মজ্ঞান। সেই জ্ঞানকে এক প্রকার অজ্ঞানও বলা যায়। সেইজন্যই—

"আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধো ন জাত্বিতি।
জীবঃ সর্ব্বমলং জ্ঞাত্বা জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহ্যতি ॥২৫॥"

শ্লোকানুসারে জীবের যে জ্ঞান, তাহা আত্মজ্ঞান নহে। তাহাকে অনাত্মজ্ঞান বা আত্মা-সম্বন্ধে তাহা অজ্ঞানই বলা উচিত।

একোনত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের ষড়বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"রজ্জুঃ সর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানশ্চেন্নির্ভয়ো ভবেৎ॥"

রজ্জুর ভ্রমবশত আপনাকে সর্প-বোধ হয় না। রজ্জুর সেই প্রকার ভয় হইয়া, তাহা তিরোহিত হয় না। যে অন্ধকারে প্রত্যেক সামগ্রী অস্পষ্ট দর্শন হয়, সেই অন্ধকারে অজ্ঞাত রজ্জু দর্শনে কোন কোন ব্যক্তির ভ্রমবশত সেই রজ্জুকে সর্প-বোধ হইতে পারে। কিন্তু অন্ধকারে ভ্রমবশত আপনাকে কি কাহারও আপনি নহেন বোধ হইতে পারে? তাহা কখনই হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্যের মতে ভ্রমবশত যাহার রজ্জুতে সর্প-বোধ হয়, সে ব্যক্তি যদি নিজে রজ্জু হইত, তাহা হইলে তাহার কখনই অন্ধকারে ভ্রমবশত আপনাকে সর্প-বোধ হইত না। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালার মতে সত্য-ব্রহ্ম এবং জীব অভেদ। অদ্বৈতমতানুসারে সেই ব্রহ্মই আত্মা। সুতরাং ব্রহ্মাত্মা ও জীব অভেদ। তবে আত্মা-রজ্জুকে, জীব-সর্প বোধ বা দর্শন হইলে, সেই জীব-সর্পের ভয়ের কারণ কি আছে? কারণ সর্পের আপনাকে আপনার ভয় হয় না। আর যদি বলা হয়, আত্মা-রজ্জুর ভ্রমবশত আপনাকে সর্প-বোধ হইয়া তাঁহার ভয় হয়, তাহাও বলা যায় না। কারণ আপনাকে সর্প-বোধ হইলে,

আপনি আপনার ভয়ের কারণই বা হইবেন কেন? প্রকৃত-পক্ষে, কোন সর্পের কি আপনাকে সর্প-বোধ থাকায়, আপনার ভয়ের কারণ আপনি হয়? তবে আত্মা-রজ্জুর যদি ভ্রমবশতও সর্প-বোধ হয়, তাহা হইলেও সেই আত্মা-রজ্জুর আপনাকে ভয় হইতে পারে না। কোন অত্যন্ত বলবান্-ভয়ঙ্কর-দস্যু অন্য কত লোকেরই ভয়ের কারণ হয়। সেই বলবান্-ভয়ঙ্কর-দস্যু কি নিজে, নিজের ভয়ের কারণ হইয়া থাকে? তাহা কখনই হয় না। তাহা হইলে আত্মাও আত্মার ভয়ের কারণ, কোন কারণেই হইতে পারেন না। অথবা জীবও নিজে, নিজের ভয়ের কারণ কোন মতেই হইতে পারে না। অনেক অদ্বৈত গ্রন্থমতেই আত্মা নির্ব্বিকার। সেইজন্য সেই আত্মার, নিজেকে জীব-বোধ হইয়াও নিজেব ভয় হইতে পারে না। কারণ ভয়ও এক প্রকার বিকার। সেইজন্য সেই ভয়ের সঙ্গে নির্ব্বিকার-আত্মার কোন সংস্রবই হইতে পারে না। আর সেই আত্মা অভয় বা নির্ভয় স্বীকার করিলেও, সেই আত্মার কোন কারণে ভয়ের উদ্রেক হইতেই পারে না। আর আত্মার আপনাকে জীব বলিয়া যদি ভ্রম হইতে পারে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শ্রৌত-উপনিষদাবলী ও বেদান্ত প্রভৃতি মতে, সেই আত্মাকে যে নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ও শুদ্ধ প্রভৃতি বলা হইয়াছে; তাহাই বা কি প্রকারে অস্বীকার করিয়া, ঐ সকল গ্রন্থের পক্ষীয়গণ কি প্রকারেই বা আত্মা জীবত্ব-রূপ বিকার প্রাপ্তে, আত্মা জীব হইয়া, শোক-দুঃখ-লজ্জা-ঘৃণা-কাম-ক্রোধের বেগ প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন হন্, স্বীকার করিতে পারেন? জীব ঐ সকল ভোগ করে স্বীকার করিলেও, সেই সকল ভোগ ব্রহ্মাত্মারও করা হইয়া

থাকে, অবশ্যই শঙ্করাচার্য্যের পক্ষীয়গণের স্বীকার করা উচিত। কারণ পূর্ব্বেই শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, ব্রহ্ম, আত্মা এবং জীব অভেদ। সুতরাং জীব বিকৃত হয় স্বীকার করিলে, ব্রহ্ম বা আত্মাও বিকৃত হন্, স্বীকার করিতে হয়। অথচ শঙ্করাচার্য্যই স্বীয় আত্মবোধ গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

'আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি।'

ত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য আত্মবোধ গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত ষড়বিংশ শ্লোকে—'নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানশ্চেন্নির্ভয়ো ভবেৎ' বলায়, ভ্রান্তিক্রমে পরাত্মাই নিজেকে জীব-বোধ করেন ও করিতে পারেন, বুঝিতে হয়। তাহার কারণ প্রথমতঃ 'রজ্জুঃ সর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ' শ্লোকাংশ বিবেচনা পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া, পশ্চাৎ 'নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানশ্চেন্নির্ভয়ো ভবেৎ' শ্লোকাংশ পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অগ্রে পরাত্মার ভ্রমবশত আপনাকে জীব-বোধ না হইয়া থাকিলে, তিনি কখনই জ্ঞানলাভের পরে বলিতে পারেন না, 'নাহং জীবঃ পরাত্মেতি'। উক্ত শ্লোকাংশ অনুসারে প্রতিপন্ন হয়, অগ্রে যিনি আপনাকে জীব-বোধ করিতেছিলেন, তিনিই পরে জ্ঞান-প্রভাবে আপনাকে জীব-বোধ না করিয়া পরাত্মাই বোধ করিতে পারেন এবং বোধ করেন। তাহা হইলে পরাত্মার ভ্রান্তি হইতে পারে এবং তাঁহার সেই ভ্রান্তি জ্ঞান-প্রভাবে অপসারিত হইতে

পারে, পূর্ব্ব বৃত্তান্তানুসারে নিশ্চয়ই বোধ হয়। তাহা হইলে পরাত্মার বিকার নাইও স্বীকার করা যায় না, এবং তিনি বিকার-বিহীন হইয়া নির্ব্বিকার হইতে পারেন, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তবে তিনি কখনও সবিকার এবং কখনও নির্ব্বিকার স্বীকার করিলে, তাঁহাকে নিত্য-নির্ব্বিকার বলা হয় না। তাহা হইলে জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়েরই প্রভাব তাঁহার উপর আছে স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে তিনি জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়েরই অধীন, স্পষ্টই স্বীকার করিতে হয়।

একত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"আত্মাবভাসয়ত্যেকো বুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়াণি চ।
দীপো ঘটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্ন্নাবভাস্যতে॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণ জড়। তাহারা আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, আপনারাও প্রকাশিত হইতে পারে না; আত্মাই তাহাদের প্রকাশ করেন। সুতরাং উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা উচিত নহে। যাহা প্রকাশ করে, তাহা কখনই নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহে। দীপ ঘটাদিকে প্রকাশ করে, দীপ কি নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়? প্রত্যক্ষ দেখি, দীপ সগুণ-সক্রিয়। সেইজন্য দীপকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। আত্মা যদি নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেন

না। আত্মা স্বয়ং গুণ নহেন বলিয়া, তাঁহাকে নির্গুণ বলা যাইতে পারে বটে।

দ্বাত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টবিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা বোধরূপতয়াত্মনঃ।
নদীপস্যান্যদীপেচ্ছা তথা স্বাত্মা প্রকাশতে॥"

এক দীপকে প্রকাশ করিবার জন্য, অন্য দীপের প্রয়োজন হয় না সত্য। কিন্তু সেই এক দীপকে প্রকাশ করিবার জন্য কি তৈল, সলিতা বা কার্পাস-বর্ত্তিকা, অগ্নি, অগ্নির আলোক, এবং সেই দীপ প্রকাশের আধারের প্রয়োজন হয় না? তবে কেবল এক দীপই, সেই এক দীপের প্রকাশক কি প্রকারে বলা যাইবে? একাত্মাকে প্রকাশের জন্য অন্য আত্মার প্রয়োজন হয় না বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই একাত্মার প্রকাশের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, বলা যাইতে পারে না। আর আত্মবোধ বা আত্মজ্ঞানই আত্মা, এবং সেই আত্মজ্ঞান-আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানা যায়, এবং তদ্দ্বারাই আত্মা প্রকাশিত হয়, ইহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ যাঁহাকে জানিতে হয়, তিনি এবং যাহা দ্বারা তাঁহাকে জানিতে হয়, তাহা পরস্পর অভেদ এক-বস্তু, তাহা অদ্বৈত-তত্ত্বানুসারে বুঝিবার কোন কারণই দেখি না। কারণ আত্মা এবং আত্মজ্ঞানের এক-প্রকারতা নাই, তাহা অতি সহজেই বোঝা যায়। যে সকল বস্তু দৃষ্টি-শক্তি-প্রভাবে দর্শন

করা যায়, সেই দৃষ্টি-শক্তি এবং তাহারা কি পরস্পর অভেদ? তাহা কথনই নহে, তাহা কোন্ বুদ্ধিমান না বোঝেন? তবে যাহাকে জানা যায়, তিনি—এবং যে জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়, সেই জ্ঞান—পরস্পর অভেদই বা কি প্রকারে বলা যাইবে? অবিনশ্বর-নিত্যাত্মাকে বোধ-রূপও বলা যায় না। কারণ বোধ অর্থেই জ্ঞান। শঙ্করাচার্য্যের মতেই জ্ঞানত নিত্য নহে। তাঁহারই মতে জ্ঞানও বিনষ্ট হয়।

ত্রয়স্ত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের একোনত্রিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥"

অদ্বৈতমতানুসারে আমি-আত্মা বা আমি-পরমাত্মা ভিন্ন অপর আত্মা বা পরমাত্মা না থাকিলে, এবং আমি-আত্মা বা আমি-পরমাত্মা বিনা ঐ অদ্বৈতমতানুসারেই নিত্য-নির্ব্বিকার এবং নিত্য-নিরঞ্জন স্বীকৃত হইলে, অপর জীবাত্মা কোথা পাওয়া যাইবে? সুতরাং জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য-বাচক মহাবাক্যের সাহায্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে অভেদ, ইহাই বা জানিতে হইবে কেন? তাহা হইলে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের প্রয়োজনই বা হইবে কেন? তাহা হইলে 'অয়মাত্মা-ব্রহ্ম' নামক মহাবাক্যেরই বা প্রয়োজন হইবে কেন? তাহা হইলে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই যে মহাবাক্য, ইহারই বা প্রয়োজন হইবে কেন? তাহা হইলে এই আমি-নিরঞ্জন-আত্মার বা পরমাত্মার,

জীবাত্মা বা জীব-সংজ্ঞাই বা হইবে কেন? তাহা হইলে এই নিরঞ্জন-নির্ব্বিকার-আমি-আত্মাতে নিখিল-উপাধি-সমূহ সংক্রামিত হইয়া আমিই বা সবিকার এবং অঞ্জনবিশিষ্ট জীবাত্মা বা জীব হইব কেন? আমার আবার 'নেতি নেতীতি' বাক্য দ্বারা আমি হইতে নিখিল-উপাধি সকল অপসারিত বা নিষেধ করত, জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য-বাচক কোনও মহাবাক্য দ্বারা আমি-জীবাত্মাই পরমাত্মা, ইহাই বা আমার বোধ করিবার প্রয়োজন হইবে কেন?

চতুস্ত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"আবিদ্যকং শরীরাদিদৃশ্যং বুদ্বুদবৎ ক্ষরং।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রহ্মেতি নির্ম্মলং॥"

বৃক্ষ হইতে যাহা প্রকাশ হয়, তাহাও বৃক্ষ। অবিদ্যা হইতে যাহা প্রকাশিত, তাহাও অবিদ্যা। আত্মবোধের ত্রিংশ শ্লোকানুসারে অবিদ্যা হইতেই শরীরাদি দৃশ্য। সুতরাং অবিদ্যা এবং শরীরাদি অভেদ। শঙ্করাচার্য্যের আত্মনাত্মবিবেকানুসারে অবিদ্যা, অনাদি। সুতরাং সেমতে তাহা অবশ্যই নিত্য। তবে তাহা হইতে যে শরীরাদি হইয়াছে, তাহারা অবশ্যই নিত্য। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতিতে 'সর্ব্বাত্মেতি' আছে। সুতরাং শরীরাদি-দৃশ্যও তাঁহারই মতে আত্মা বলিতে হয়। সুতরাং তাঁহারই মতে শরীরাদি-দৃশ্যও অনিত্য নহে।

পঞ্চত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থে বলা হইয়াছে,—

"দেহান্যত্বান্নমে জন্মজরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ।
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গো নিরিন্দ্রিয়তয়া ন চ ॥ ৩১ ॥
অমনস্ত্বান্ন মে দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ ॥৩২॥"

উক্ত একত্রিংশ শ্লোকানুসারে দেহ এবং আত্মা অভেদ নহে। কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষানুভূতির কোন কোন শ্লোকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, দেহ এবং আত্মা অভেদ। অদ্বৈতমতানুসারে জন্ম-জরা-কার্শ্য-লয় প্রভৃতি ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি বিষয় সকল, অনাত্মা বা অবিদ্যার বিবিধ-বিকাশ। অপরোক্ষানুভূতি অনুসারে—

"এবং দেহদ্বয়াদন্য আত্মাপুরুষ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বাতীতোহমব্যয়ঃ ॥৪০॥"

উক্ত শ্লোকে আত্মা সর্ব্ব-রূপ স্বীকার করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা অবিদ্যা-অনাত্মা এবং আত্মা অভেদও স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ সর্ব্ব-রূপ, অবিদ্যা-অনাত্মারই বিকাশ। জন্ম-জরা-কার্শ্য-লয় ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতিও সেই অনাত্মা-অবিদ্যার বিবিধ-বিকাশ। সুতরাং ঐ গুলিও অনাত্মা-অবিদ্যা। অনাত্মা-অবিদ্যার বিকাশ সর্ব্ব-রূপকে যদি অপরোক্ষানুভূতির চত্বারিংশ শ্লোকে আত্মা বলা অসঙ্গত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অনাত্মা-অবিদ্যার জন্ম-জরা-কার্শ্য-লয় ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ

প্রভৃতি বিকাশ গুলিকেই বা আত্মার বিবিধ-বিকাশ বলা অসঙ্গত হইবে কেন? অপরোক্ষানুভূতি অনুসারে 'সর্ব্বাত্মেতি' স্বীকার করিলে, জন্ম-জরা-কার্শ্য-লয় ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতিও আত্মার বিবিধ-বিকাশ বলা যাইতে পারে। উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে ইন্দ্রিয়গণকে, মনকে, প্রাণকে এবং দুঃখ-রাগ-দ্বেষ-ভয় প্রভৃতিকেও কথিত আত্মারই বিবিধ-বিকাশ বলা যাইতে পারে। অতএব ঐ সকলের সহিত ত্রিবিধ-দেহের জন্ম, জরা, কার্শ্য, লয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ প্রভৃতি বিষয় সকলের সহিত আমি-আত্মার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই বলা যায় না। কারণ আমি-আত্মাই ঐ সকল, পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আমি-আত্মার সহিত আমি-আত্মার যত ঘনিষ্ট-সম্বন্ধ, তত ঘনিষ্ট-সম্বন্ধ আর অন্য কিছুর সহিতই হইতে পারে না। কোন শাস্ত্র এবং যুক্তিমতে, দেহ ভোগী নহে। তুমি-আত্মা কি দেহকে কিছু ভোগ করিতে দেখিয়াছ? কখনই দেখ নাই। তুমি-আত্মা নিজেই ত্রিবিধ-দেহাবলম্বনে সমস্ত ভোগ করিয়া থাক। আমি-আত্মাও নিজেই সমস্ত ভোগ করিয়া থাকি। তবে কি প্রকারে বলিব, তুমি-আত্মা জরা প্রভৃতি ভোগ কর না? তবে কি প্রকারে বলিব, আমি-আত্মা জরা প্রভৃতি ভোগ করি না? তুমি-আত্মা অথবা আমি-আত্মার জরা প্রভৃতি যে ভোগ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে কোন পুস্তক, কোন রচনা কিম্বা কোন উদাহরণ দ্বারা আর প্রমাণ করিতে হইবে না। তাহা তুমি-আমি যখন বুঝি, তখন আর অপর প্রমাণের প্রয়োজন কি আছে? তুমি-আত্মা ও আমি-আত্মাই জরা প্রভৃতি ভোগ করি প্রমাণ করা হইয়াছে বলিয়া, তুমি-আত্মার সহিত

এবং আমি-আত্মার সহিত জরা প্রভৃতির সম্বন্ধ-স্বীকারও করা যায়।

ষট্‌ত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থে বলা হইয়াছে,—

"নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ।
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিত্যমুক্তোঽস্মি
নির্ম্মলঃ ॥৩৩॥
অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গতোঽচ্যুতঃ।
সদা সর্ব্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গো নির্ম্মলোঽচলঃ ॥৩৪॥
নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ং।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ ॥৩৫॥
এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যা বিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নং ॥৩৬॥"

আত্মার সহিত অহঙ্কারের সংস্রব ব্যতীত, আত্মা 'আমি' বলিতে পারেন না। তিনি আমি-বোধও করিতে পারেন না। 'অহঙ্কার, অনাত্মার অংশ বা অনাত্মার বিকাশ, তাহা এই সিদ্ধান্তদর্শনের প্রথম ভাগের 'দ্বৈতমত এবং যুক্তি অনুসারে বিবৃত হইয়াছে। অহঙ্কারের সহিত আত্মার সংস্রব থাকিতে, সেই আত্মাকে আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকানুসারে নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, নিত্য-মুক্ত, এবং নির্ম্মল; চতুস্ত্রিংশ

শ্লোকানুসারে শুদ্ধ, নিঃসঙ্গ ও নির্ম্মল এবং পঞ্চত্রিংশ শ্লোকানুসারে নিত্য-শুদ্ধ ও বিমুক্ত বলা যাইতে পারে না। কারণ অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মার, অহঙ্কারই এক প্রকার অঞ্জন,—সুতরাং সেইজন্য অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মা নিরঞ্জন নহেন। অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মার, অহঙ্কারই যে বিষম-বিকার,—সুতরাং সেই-জন্য অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মা নির্ব্বিকার নহেন। অহঙ্কারের সহিত আত্মার সংস্রব থাকিতে, আত্মাকে 'কেবল' বলা যায় না; অহঙ্কারের সহিত আত্মার সংস্রব থাকিতে, আত্মাকে মুক্ত বা নিত্য-মুক্ত বলাও যায় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে যদি অহঙ্কারের সহিত আত্মার সংস্রব না থাকিত, তাহা হইলে সেই আত্মাকে 'কেবল' বলিতে পারিতাম। তাহা হইলে সেই আত্মাকে মুক্ত বা নিত্য-মুক্ত না বলিয়া 'অবদ্ধ-কেবল' বলিতে পারিতাম। কারণ আত্মা,—নিত্য, নিরঞ্জন এবং নির্ব্বিকার স্বীকার করিলে, তাঁহাকে মুক্ত কিম্বা নিত্য-মুক্ত বলা যায় না। কারণ যে আত্মার কখন বন্ধনই হয় নাই, তাঁহার কখন মুক্তিরও প্রয়োজন হয় নাই; সুতরাং সেইজন্য সেই আত্মাকে মুক্ত অথবা নিত্য-মুক্ত বলাও অসঙ্গত হইত। আত্মার সহিত অন্য কিছুর অসংস্রবই আত্মার নির্ম্মলতা। আত্মার সহিত অন্য কিছুর অসংস্রবই আত্মার শুদ্ধতা বা শুদ্ধি। আত্মার সহিত অন্য কিছুর অসংস্রবই আত্মার নিঃসঙ্গতা। অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মার অহঙ্কারই মালিন্য; সুতরাং সেই অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মাকে নির্ম্মল না বলিয়া, স-মল বলাই সঙ্গত। অহঙ্কারও অশুদ্ধ-অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ,—সুতরাং সেই অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মাকে শুদ্ধ না বলিয়া অশুদ্ধ বলাই সঙ্গত। অহঙ্কারের সহিত

আত্মার সংস্রব থাকিতে, আত্মাকে নিঃসঙ্গ বলা যায় না। সেই-জন্য অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মাকে নিঃসঙ্গ না বলিয়া, বরঞ্চ সেই আত্মাকে স-সঙ্গ বলাই সঙ্গত। যাহার সহিত কখন অশুদ্ধতার সংস্রব হয় নাই, তিনি নিত্য-শুদ্ধ। অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মাকে নিত্য-শুদ্ধও বলা যায় না, শুদ্ধও বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য আপনাকে আমি-আত্মা বা অহমাত্মা যদি বোধ না করিতেন, তিনি তাঁহার কোন গ্রন্থে আপনাকে আমি-আত্মা বা অহমাত্মা বলিয়া যদি পরিচয় না দিতেন; তাহা হইলে 'তিনি' শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন, আমিও শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতাম। তাহা হইলে তিনি-আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-রূপে প্রতিপন্ন হইতেন, আমি-আত্মাও নিত্য-শুদ্ধ-রূপে প্রতিপন্ন হইতাম। শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের চতুস্ত্রিংশ ও পঞ্চত্রিংশ শ্লোকোক্ত আত্মার সহিত যদি অহঙ্কারের সংস্রব না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে বিমুক্ত বলিলেও সঙ্গত হইত। অহঙ্কার-রূপ বন্ধন থাকিতে আত্মাকে মুক্ত কিম্বা বিমুক্ত বলা যাইতে পারে না।

সপ্তত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থের চতুস্ত্রিংশ শ্লোকের প্রথম চরণে বলিয়াছেন,—

"অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গতোঽচ্যুতঃ।"

উক্ত চরণানুসারে দেখিতেছি, শঙ্করাচার্য্য 'সর্ব্ববহিরন্তঃ'ও স্বীকার করিতেন। দেখিতেছি, তিনি সর্ব্বও মিথ্যা বলিতেছেন না। দেখিতেছি, তিনি সর্ব্বের বহির্দ্দেশ এবং মধ্যদেশও

মিথ্যা বলিতেছেন না। উক্ত শ্লোকানুসারে বোঝা যায়, আমি আকাশবৎ সর্ব্বদা সর্ব্ব-বস্তুতে সমভাবে থাকি। আমি সর্ব্ব-বস্তুতে সমভাবে থাকি বলিয়াই, যে সকল বস্তুতে এবং যে সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে থাকি, সে সকলও আমি-আত্মার ন্যায় নিত্য প্রতিপন্ন হইতেছে।

অষ্টত্রিংশ সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্বোক্ত ষট্‌ত্রিংশ সিদ্ধান্তে পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্ম-বোধ গ্রন্থোক্ত পঞ্চত্রিংশ শ্লোকানুসারে আমি-পরব্রহ্ম-আত্মাকে 'নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকং,' 'অখণ্ডানন্দং,' 'অদ্বয়ং,' 'সত্যং,' 'জ্ঞানং' ও অনন্তং' বলিলে, আমি-পরব্রহ্মাত্মার এক-প্রকারতা বুঝিবার কোন কারণই থাকে না। কারণ আমি-পরব্রহ্মাত্মাকে ঐগুলি বলায়, আমি-পরব্রহ্মাত্মার নানা-প্রকার উপাধি ও নাম আছেও স্বীকার করা হইতেছে। প্রসিদ্ধ অনেক অদ্বৈতমতের গ্রন্থানুসারেই আমি-পরব্রহ্মাত্মা একই প্রকার। সে সকল মতে 'আমি'র বহু-প্রকারতা নাই। অদ্বৈতমতে অনাত্মা-অবিদ্যারই বহু-প্রকারতা। বহু-প্রকারতা যাহাতে আছে, অথবা বহু-প্রকারতার সঙ্গে যাহার সংস্রব, তাহা অসঙ্গ-কেবলাত্মা নহে। আর আমি-আত্মা নিত্য কেন, তাহাওত বুঝিতে পারি না? কারণ, আমি-আত্মা ছিলাম কি না, তাহাও আমার বোধ নাই। আমি-আত্মা ইহ-জীবন পরে থাকিব কি না, তাহাওত বুঝিতে পারিতেছি না;—তবে আমি-আত্মা যে নিত্য, ইহাই বা কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করা

যায়? আমি-আত্মার কতই অশুদ্ধতা,—সে সকল অদ্বৈতমতানুসারে আমি-আত্মার যে সকল দেহে বিকাশ, সেই সকল দেহেই বোঝা যায়। কত দুষ্প্রবৃত্তির সঙ্গে ঐ প্রকার আত্মার সম্বন্ধ, সে গুলি নিশ্চয় ঐ প্রকার আত্মার বিষম-বন্ধন। নানাপ্রকার রোগ-শোক-তাপ, নানাপ্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা-অবমাননা ও উৎপীড়ন প্রভৃতিও ঐ প্রকার আত্মার বিষম-বন্ধন। তবে আমি-আত্মা বিমুক্ত কি প্রকারে বলি? সর্ব্ব-সচল-চেতনা-বিশিষ্ট-দেহে একই আমি-আত্মা আছি স্বীকৃত হইলে, তাহা আমি-আত্মার বোধ থাকা উচিত ছিল। প্রত্যেক দেহী-আত্মাই নিজের সঙ্গে অন্যান্য দেহস্থ-আত্মা, অভেদ বোধ করেন না এবং অভেদ বোধ করিও না; সুতরাং কেবল একাত্মাই বা কি প্রকারে স্বীকৃত হইতে পারে? সুতরাং বহু-দেহে বহু-আত্মাই স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য কেবল একাত্মাই স্বীকার করা যায় না। অতএব আমি-আত্মা 'এক,' সেইজন্য বলিতে পারা যায় না। বহু-আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈতমতানুসারে একাত্মা স্বীকৃত হইলেও বহু-দেহে সেই একাত্মারই বহু-খণ্ড অনুভূত হইতেছে। কারণ সর্ব্ব-দেহেই এক অখণ্ড-আত্মার বিদ্যমানতা, আমি-আত্মা বোধ করি না, তুমি-আত্মা বোধ কর না, কিম্বা তিনি বা অন্য কোন আত্মাও বোধ করেন না। এই দেহে কেবল আমি-আত্মাই আছি, বোধ করি। ঐ দেহে কেবল তুমি-আত্মাই আছ, বোধ কর। কিন্তু ঐ দেহে আমি-আত্মাই আছি, তাহাত বোধ করি না? ঐ প্রকারে কোন দেহস্থ-আত্মাই সর্ব্ব-দেহস্থ-আত্মার সঙ্গে আপনাকে অভেদ, অভিন্ন অথবা এক-বোধ করেন না,

তাহা আমি-আত্মাকে দিয়াই বুঝিতেছি। তুমি-আত্মার পিতা যিনি, তিনিও অবশ্যই আত্মা। অথচ তুমি-আত্মার সহিত তোমার পিতা-আত্মা যে অভেদ বা এক এবং অখণ্ড, তাহাত বুঝিতে পার না? তুমি-আত্মার সহিত যদি তোমার পিতা-আত্মা অভেদ বা এক এবং অখণ্ড হইতেন, তাহা হইলে তুমি-আত্মার সুখ-দুঃখে তোমার পিতা-আত্মার তোমারই ন্যায় সুখ-দুঃখ বোধ হইত। তাহা হইলে তুমি-আত্মার ক্ষুধা-বোধ হইলে, তোমার পিতা-আত্মারও ক্ষুধা-বোধ হইত। সেইজন্যই বলি, তোমার পিতা-আত্মা হইতে তুমি বিকাশিত হইয়াছ স্বীকার করিলেও, তুমি ও তোমার পিতা-আত্মা পরস্পর অভেদ বা এক এবং অখণ্ড বলা যায় না। আমার ক্ষুধা এবং আমি অভেদ নই যে প্রকারে, সেই প্রকারে আমার আনন্দ এবং আমি অভেদ নহি। সকল সচেতন-দেহেই আত্মা বিদ্যমান, অথচ সকল দেহের আত্মাই অখণ্ড নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং আমি-আত্মাই 'অদ্বয়' বলিতে পার না। আমি-আত্মা সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত বলিলেও, আমি-আত্মার ত্রি-প্রকারতা স্বীকার করা হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বহু-প্রকারতা যাহার আছে, তাহাই অনাত্মা। সুতরাং আমি-আত্মাকেও কি অনাত্মা বলিতে হইবে? আমি-আত্মাই জ্ঞান স্বীকার করিলে, আমি-আত্মা জ্ঞানীও স্বীকার করা যায় না; যেমন যাঁহার দয়া এবং দয়া অভেদ নহে, তদ্রূপ যাঁহার জ্ঞান এবং যিনি জ্ঞানীও অভেদ বলা যাইতে পারে না। চক্ষু দ্বারা যাহা দর্শন করা হয়, তাহা ও চক্ষু কি অভেদ? তদ্রূপ যাহাকে জানিতে হয়, তাহা এবং জ্ঞান, অভেদ বলিতে পারা যায় না। আমি-আত্মা অনন্তই বা কি

প্রকারে বলা যায়? কারণ এই পরিমিত দেহ ব্যতীত অন্য কিছুতে আমি-আত্মা আছি বোধ করি না; সুতরাং আমি-আত্মা অনন্ত নহি।

একোনচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকানুসারে 'ব্রহ্মৈবাস্মীতি'। বাসনা করিলেই যদি আমি-ব্রহ্ম বোধ হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিত না। ঐ প্রকার বাসনা দ্বারা আমি-ব্রহ্ম বোধ হইতে পারে যদি স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে অবিদ্যার এক প্রকার বিকাশ-বাসনা দ্বারা বা সাহায্যে আত্মজ্ঞান বা আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান হইতে পারে স্বীকার করা যায়। অবিদ্যার বিকাশ-বাসনার সাহায্যে আমি-ব্রহ্ম এই জ্ঞান যদি হইতে পারে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অন্ধকার দ্বারা আলোক দর্শন করা যায়, ইহা স্বীকার করা হয় না কেন?

চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তত্রিংশ, অষ্টত্রিংশ, একোনচত্বারিংশ, চত্বারিংশ, একচত্বারিংশ ও দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকে অদ্বৈততার পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, ঐ সকল শ্লোকের কোনটী-তেই শঙ্করাচার্য্য আত্মা বা পরমাত্মার সহিত নিজের একতা বা অভেদত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তিনিই ঐ গ্রন্থের সপ্তত্রিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"বিবিক্তদেশ আসীনো বিরাগো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্যধীঃ ॥"

'ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্যধীঃ' বলায়, আমি-আত্মার পরিচয় দেওয়া হয় নাই। ঐ শ্লোকাংশমতে বোঝা যায়, শঙ্করাচার্য্য যেন ঐ শ্লোকাংশে আপনি ব্যতীত অন্য কোন আত্মার বিষয় বলিতেছেন। আত্মবোধের অষ্টত্রিংশ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"আত্মন্যেবাখিলং দৃশ্যং প্রবিলাপ্য ধিয়া সুধীঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং নির্ম্মলাকাশবৎ সদা ॥"

উক্ত শ্লোকেও শঙ্করাচার্য্য, আমি-আত্মা নিজে আমি-আত্মাকে নির্ম্মলাকাশবৎ সর্ব্বদা ভাবনা করি, বলেন নাই। সুতরাং উক্ত শ্লোকেও অদ্বৈততার অভাব। একোনচত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"রূপবর্ণাদিকং সর্ব্বং বিহায় পরমার্থবিৎ।
পরিপূর্ণচিদানন্দ স্বরূপেণাবতিষ্ঠতি ॥"

উক্ত শ্লোকে পরমার্থবিৎ সমস্ত রূপ-বর্ণাদি পরিহার করত পরিপূর্ণ-চিদানন্দ-স্বরূপে অবস্থান করেন বলায়, উক্ত শ্লোকেও অহমোপাধি-বিশিষ্ট-শঙ্করাচার্য্যাত্মার সহিত পরিপূর্ণ-চিদানন্দ-স্বরূপের সহিত তাঁহার অভেদত্ব বা ঐক্য বুঝিবার কোন কারণ নাই। সেইজন্য উক্ত শ্লোকেও অদ্বৈততার অভাব বুঝিতে হইবে। চত্বারিংশ শ্লোকে—

"জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দ স্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি॥"

বলায় বুঝিতে হয়, জ্ঞাতৃ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, এই যে তিন প্রকার প্রভেদ, ইহারা পরাত্মাতে দৃষ্ট হয় না। কারণ পরাত্মা যিনি, তাঁহার এক-প্রকারতাই বিদ্যমান। সুতরাং সেইজন্য তাঁহাকে জ্ঞাতৃও বলা যায় না, সেইজন্য তাঁহাকে জ্ঞানও বলা যায় না, সেইজন্য তাঁহাকে জ্ঞেয়ও বলা যায় না। ঐ তিনের কোনটিও তাঁহাকে বলা যায় না বলিয়া, তিনি অবশ্যই অজ্ঞাতৃ, তিনি অবশ্যই অজ্ঞান, তিনি অবশ্যই অজ্ঞেয়। সুতরাং আত্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাও স্বীকার করা হয়। কোন-কিছুতে বিদ্যমান যাহা বা যাহারা এবং কোন-কিছু, এক বস্তু নহে। সেইজন্য কোন-কিছুতে বিদ্যমান যাহা বা যাহারা এবং কোন-কিছু, অভেদও বলা যায় না। 'জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে' বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞাতৃ, জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরাত্মা বা পরমাত্মা, অভেদ বলা যাইতে পারে না। কারণ চত্বারিংশ শ্লোকের প্রথমাংশে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, যে পরাত্মাতে জ্ঞাতৃ বা জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই ত্রিবিধ-ভেদ বা পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। যাঁহাতে ঐ ত্রিবিধ-ভেদ বা বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না বলা হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই স্বয়ং ঐ ত্রিবিধ-ভেদ বা পার্থক্য নহেন। শঙ্করাচার্য্য জ্ঞাতৃ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়কে ভেদ, প্রভেদ বা পার্থক্য বলিয়াছেন বলিয়া, ঐ তিনের কোনটিকে শঙ্করাচার্য্যের এবং অন্যান্য অদ্বৈতবাদীদিগের মতে আত্মা বলা যায় না। অদ্বৈতমতে আত্মার বহু-প্রকারতা নাই। সেইজন্য ঐ তিনকে

অনাত্মা অবিদ্যারই তিন প্রকার বিকাশ বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য উক্ত চত্বারিংশ শ্লোকে স্বয়ং পরাত্মাও স্বীকার করেন নাই। সেইজন্য শঙ্করাচার্য্যের সহিত ঐ পরাত্মা-চিদানন্দেরও অভেদত্ব উক্ত শ্লোকানুসারে প্রতিপন্ন করা যায় না। সেইজন্য উক্ত শ্লোকেও অদ্বৈততা নাই বলিতে হয়। একচত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতিজ্জ্বালা সর্ব্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা-অরণিতে জ্ঞানাগ্নি আছে। ধ্যান দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই আত্মারণি হইতে প্রকাশিত জ্ঞানাগ্নি, সমস্ত অজ্ঞান-কাষ্ঠই দহন করে। অতএব অদ্বৈতমতে ধ্যানও হেয় নহে। সেমতে ধ্যান-সাহায্যেই আত্মারণি হইতে জ্ঞানাগ্নি প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের মতে ধ্যান দ্বারা জ্ঞানও আত্মা হইতে প্রকাশিত হয়। সেই ধ্যান দ্বারা প্রকাশিত জ্ঞানই, সমস্ত অজ্ঞান-কাষ্ঠ দহনেরও কারণ হয়। চকমকির পাথরেও অব্যক্ত-ভাবে অগ্নি আছে, অথচ চকমকির পাথর ও তাহার মধ্যস্থিত অগ্নি, অভেদ বা এক পদার্থ নহে। ঐ প্রকারে আত্মারণি ও তাহার মধ্যস্থিত অগ্নি, অভেদ বা এক বলা যাইতে পারে না। উক্ত চত্বারিংশ শ্লোকের মন্তব্যেও মীমাংসিত হইয়াছে, পরাত্মা এবং জ্ঞান অভেদ নহে। আত্মারণি বলিলে, আত্মার এক-প্রকারতা বা অদ্বৈততা প্রতিপাদিত হয় না। কারণ আত্মাকে অরণি বলিলেই, আত্মার দ্বি-প্রকারতা স্বীকার করা হয়। অরণি

অর্থে, অগ্নি-সম্পন্ন কোন প্রকার কাষ্ঠ স্বীকার করিলেও দ্বি-প্রকারতা স্বীকার করা হয়; কারণ সেই কাষ্ঠ এবং তন্মধ্যস্থ অগ্নি, এইত দ্বি-প্রকার। অরণি অর্থে, চকমকির পাথর স্বীকার করিলেও দ্বি-প্রকারতা স্বীকার করা হয়; এক প্রকার চকমকির পাথর এবং অন্য প্রকার তন্মধ্যস্থ অগ্নি। অতএব আত্মাকে অরণি কহিলেও অদ্বৈততা, সেই আত্মা শব্দ দ্বারায় স্বীকার করা হয় না। শঙ্করাচার্য্য উক্ত একচত্বারিংশ শ্লোকে 'আত্মারণৌ' বলায়, তিনি নিজেই আত্মারণি, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই। সুতরাং সেইজন্যও উক্ত একচত্বারিংশ শ্লোকে অদ্বৈততা বা অভেদত্ব নাই। দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"আরুণেনৈব বোধেন পূর্ব্বস্তুং তিমিরে হতে।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব॥"

যে সময় সূর্য্য-প্রকাশ দর্শন করা যায়, সে সময় সূর্য্যালোকও দর্শন করা যায়। সূর্য্য-প্রকাশের পূর্ব্বেও সূর্য্যে আলোক থাকে। তবে তিনি যতক্ষণ না আমাদের দৃষ্টিগোচর হন্, ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে এবং তাঁহার আলোক দেখিতে পাই না। তজ্জন্য বলিতে পারি না, সূর্য্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্ব্বে আলোক-বিহীন থাকেন। সূর্য্য-মধ্যস্থ অন্ধকার, সূর্য্যোদয়ে তিরোহিত হয়, কোন শাস্ত্রেও নাই, কোন জ্যোতিষেও নাই। জ্যোতিষ্ এবং অন্যান্য শাস্ত্রানুসারে সূর্য্যালোকে অন্ধকার দূর হয় বটে, কিন্তু সে অন্ধকার সূর্য্য-মধ্যস্থ নহে। উক্ত দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকে আকাশস্থ-সূর্য্য তিমির নাশ করেন বুঝা যায়, কিন্তু

আত্মা-সূর্য্য বা অংশুমান কি প্রকার তিমির বা অন্ধকার দূর করেন, তাহা দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হয় নাই। যদি আত্মা-সূর্য্য অজ্ঞান-অন্ধকার তিরোহিত করেন স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই অজ্ঞান-অন্ধকারের স্থান কোথা, তাহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। যদি বলা হয়, সেই অজ্ঞান-অন্ধকারের স্থান আত্মা, তাহা হইলেও তাহা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ চত্বারিংশ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, **'জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।'** পরাত্মাতে জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই ত্রিবিধ-ভেদ বা বিভিন্নতা যদি না থাকে, তাহা হইলে সেই পরাত্মাতে বা আত্মাতে অজ্ঞান-অন্ধকারের স্থানই বা কি প্রকারে নির্দ্দেশ করা যাইবে? শঙ্করাচার্য্যের মতে, যে পরাত্মা বা আত্মার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ নাই, যাঁহাতে জ্ঞানরূপ আলোকের বিগুমানতা নাই, তাঁহাতে অজ্ঞান-অন্ধকারের বিদ্যমানতাই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? তবে আত্মা-সূর্য্য বা অংশুমান, কোথাকার অন্ধকার হত বা বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হন্? অপরন্তু উক্ত দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকে অংশুমান-সূর্য্যের সহিত আত্মার তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া, আত্মা-সূর্য্যে বা অংশুমানে কোনকালেই অজ্ঞান-অন্ধকারের অবস্থিতি স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে, যে সূর্য্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্ব্বেও তাঁহাতে আলোকাভাব থাকে না। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিতে হইবে, আত্মা-সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত বা আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বেও তাঁহাতে জ্ঞানালোকের অভাব থাকে না; সুতরাং তাঁহাতে অজ্ঞান-অন্ধকারেরও বিগুমানতা

থাকিতে পারে না। যেমন এক সঙ্গে আলোক এবং অন্ধকারের প্রকাশ কথনই থাকিতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞানাজ্ঞানের প্রকাশ এক সঙ্গে কথনই থাকিতে পারে না। উক্ত দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকানুসারে, আত্মাকে অংশুমানের সঙ্গে তুলনা করায় অনেকে বলেন, অংশুমানের যেমন অংশু বা আলোক আছে, তদ্রূপ আত্মাংশুমানেও জ্ঞানাংশু বা জ্ঞানালোক আছে; কিন্তু উপরোক্ত চত্বারিংশ শ্লোকানুসারে তাহা স্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উক্ত শ্লোকমতে জ্ঞান নামক ভেদ বা পার্থক্য, পরাত্মা বা আত্মাতে নাই; সুতরাং উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মার জ্ঞানাভাব স্বীকার করিতে হয়। পরমাত্মাতে জ্ঞানাভাব স্বীকার করিলে কেহ কেহ বলেন, তবে সেই পরমাত্মাতে বা পরাত্মাতে অজ্ঞানেরই কি বিদ্যমানতা স্বীকার করা যাইবে? তাহাও নানা উপনিষৎ, বেদান্ত এবং বেদান্ত-প্রতিপাদক নানা গ্রন্থানুসারে স্বীকার করা যায়; কারণ ঐ সকল গ্রন্থমতে অজ্ঞানটা বিকার। ঐ সকল গ্রন্থমতে আত্মা, পরাত্মা বা পরমাত্মা,—নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন এবং নির্ম্মল; সুতরাং সেই নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-নির্ম্মলতার সহিত বিকার-অজ্ঞানের কোন সংস্রবই স্বীকার করা যায় না। সুতরাং সেই নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-নির্ম্মলাত্মাকে অজ্ঞানাতীতও বলিতে হয়। উক্ত দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকানুসারে, সেই আত্মার সহিত শঙ্করাচার্য্য নিজের অভেদতা প্রতিপন্ন করেন নাই। তজ্জন্য ঐ আত্মার সহিত শঙ্করাচার্য্যের অভেদতা বা ঐক্যও স্বীকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত শ্লোকেও দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

একচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রি-চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"আত্মাতু সততং প্রাপ্তোঽপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যয়া।
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে সতত আত্মা প্রাপ্ত হইয়াও, অবিদ্যার দ্বারা তিনি অপ্রাপ্তবৎ বলা যায় না। কারণ, কে সতত আত্মা প্রাপ্ত হইয়াও, অবিদ্যা দ্বারা সেই আত্মাকে অপ্রাপ্তবৎ বোধ করেন? যিনি ঐ প্রকার বোধ করেন, তিনি কি আত্মা ব্যতীত অপর কিছু? যিনি ঐ প্রকার বোধ করেন, তিনি নিশ্চয়ই আত্মা ব্যতীত অপর কিছু নহেন। সে সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকীয়—

"আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে॥"

বচনই প্রমাণ করিতেছে, ভ্রান্তি-বশতও কি নিজে থাকিতে, কাহারও নিজে নাই বোধ হয়? তাহা কখনই হয় না। তবে আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত ত্রি-চত্বারিংশ শ্লোকে—

"আত্মাতু সততং প্রাপ্তোঽপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যয়া।
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা॥"

কি অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে? শঙ্করাচার্য্যের মতেও আত্মা, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল প্রভৃতি। সুতরাং সেই আত্মার কখন ভ্রান্তি হয়, স্বীকার করা যায় না। সুতরাং সেই আত্মার আত্মজ্ঞান কখন লুপ্ত থাকে, অপ্রকাশ থাকে বা থাকে না,

স্বীকার করা যায় না। সেইজন্য কথনই সতত-প্রাপ্ত-আত্মা, সেই সতত-প্রাপ্ত-আত্মা অপ্রাপ্তবৎ-বোধ, অবিদ্যা প্রভাবেও হইতে পারেন না। কারণ, নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-নির্ম্মল-নিত্যাত্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন-আত্মার উপর কথনই অবিদ্যার প্রভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং সেইজন্য উক্ত ত্রি-চত্বারিংশ শ্লোকের শেষ চরণানুসারে '**তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা**'ও বলা যাইতে পারে না। আর শঙ্করাচার্য্যেরই আত্মানাত্ম-বিবেকানুসারে ঐ অবিদ্যার নাশও হয় স্বীকার করা যায় না। উক্ত গ্রন্থে অবিদ্যাকেও অনাদি বলা হইয়াছে। অনাদি যাহা, ন্যায়ত তাহার নাশ, স্বীকারই করা যাইতে পারে না। অদ্বৈতমতে ব্রহ্মও অনাদি,—সেমতে তাঁহার কি নাশ স্বীকার করা হয়? তবে আত্মবোধ গ্রন্থে অনাদ্যা-বিদ্যারই বা নাশ হয়, স্বীকার করা হইয়াছে কেন? আমি-আত্মা, আপনাকে কথন প্রাপ্তও হই না এবং কথন অপ্রাপ্তও হই না। আমার পক্ষে আমিত সততই রহিয়াছি। তবে আমি-আত্মার, আমি-আত্মাকে প্রাপ্ত হইবারই বা প্রয়োজন কি? আমি-আত্মার পক্ষে আমি-আত্মা সতত রহিয়াছি বলিয়া, আমি-আত্মাকে আমি-আত্মার কথনই অপ্রাপ্তবৎ বলিয়া বোধ হয় না। ঐ প্রকার বোধ হইতেই পারে না, ঐ প্রকাব বোধ হয়ও বলা বৃথা প্রসঙ্গ; কারণ ঐ প্রকার বলাও অসত্য। আমি-আত্মা ব্যতীত অপব কোন্ বস্তু, আমি-আত্মা প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত হইতে পারি? আমি-আত্মা আপনাকে প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত হইতে পারি না।

দ্বি-চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"স্থাণৌ পুরুষবদ্ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে॥"

স্থাণুত ভ্রান্তি-বশত আপনাকে পুরুষ-বোধ করে না। সুতরাং ব্রহ্ম বা ব্রহ্মণও ভ্রান্তি-বশত আপনাকে জীব-বোধ করেন, স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম বা ব্রহ্মণ আপনাকে কখন ভ্রান্তি বশত জীব-বোধ করেন স্বীকার করিলে, ব্রহ্ম বা ব্রহ্মণকে নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন প্রভৃতিও বলা যায় না। নিবিড় অন্ধকার রাত্রে একজন মনুষ্যের দূরস্থ স্থাণু-দর্শনে, তাহাকে আপনি ব্যতীত অপর কোন মনুষ্য বা পুরুষ-বোধ হইতে পারে সত্য; কিন্তু যে জীব ভ্রান্তি-বশত ব্রহ্মকে জীব-বোধ করেন, সেই কল্পিত-জীবটী মিথ্যা স্বীকার করিলেও, যে জীব সেই ব্রহ্মকে কল্পিত-জীব দর্শন করেন, সেজন্য তিনি স্বয়ং কল্পিত বলিয়া কখনই প্রতিপন্ন হইবেন না। কারণ, যে মনুষ্য বা পুরুষ নিবিড় অন্ধকার রাত্রে দূরস্থ কোন স্থাণুকে ভ্রান্তিক্রমে আপনি ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য বা পুরুষ-বোধ করে, তাহার সেই ভ্রান্তি অপনীত হইলে স্থাণুকে, স্থাণুই দর্শন করে বটে। কিন্তু ঐ প্রকার ভ্রান্তি অপনীত হইলে, সেই মনুষ্য বা পুরুষত আপনাকে স্থাণু-দর্শন বা বোধ করে না। উক্ত চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে যদি বলা হইত, ভ্রান্তিক্রমে স্থাণু আপনাকে পুরুষ-বোধ বা দর্শন করে, তাহা হইলেও বরঞ্চ বলা যাইতে পারিত, যে ভ্রান্তিক্রমে ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম আপনাকে জীব-বোধ করেন; এবং সেই ভ্রান্তি

তিরোহিত হইলে, সেই ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম আপনাকে আর জীব-বোধ করেন না। তখন তিনি আপনাকে ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম-বোধই করেন। সেপক্ষেও নানা অদ্বৈতমতের গ্রন্থাবলী এবং স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যেরও কোন কোন গ্রন্থের কোন কোন শ্লোকানুসারে আপত্তি করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই অনেকবার বলা হইয়াছে, যে অদ্বৈতমতের গ্রন্থাবলী এবং শঙ্করাচার্য্যের কতকগুলি শ্লোকানুসারেই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মণ, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ও নির্ম্মল। সুতরাং ভ্রান্তিক্রমে কখনও সেই ব্রহ্মের আপনাকে সবিকার-সমল-অঞ্জন-বিশিষ্ট জীব-বোধ হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের—

"স্থাণৌ পুরুষবদ্‌ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে ॥"

বলা যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। আর শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালা অনুসারে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' স্বীকার করিয়া লইলে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য বা অভেদত্বই স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলেও ব্রহ্মণের বা ব্রহ্মের আপনাকে ভ্রান্তি-বশত জীব-বোধ হইতে পারে না। তাহা হইলে সেই ভ্রান্তি অপসারিত হইলেও, সেই ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম, আপনাকে অজীব-বোধ করিতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে সেই ব্রহ্ম-জীবকে নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ও নির্ম্মলই বলিতে হয়। কারণ, ব্রহ্মত নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন এবং নির্ম্মল,—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও বেদান্তানুসারে ভূয়োভূয়ঃ বলা হইয়াছে? তবে জীব শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে যদি ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নন্ প্রতিপন্ন করা

যায়, তাহা হইলে সেই জীবও নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল ও শুদ্ধ স্বীকার করিতে হয়।

ত্রি-চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নং জ্ঞানমঞ্জসা।
অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্‌ভ্রমাদিবৎ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে অহং এবং মম, এই উভয়ই অজ্ঞান। আমি আছি-বোধ এবং আমি-বোধ না থাকিলে, অন্য কোন প্রকার বোধই হইতে পারে না। আত্মবোধ হইবার প্রয়োজন হইলেও আমি-আত্মা বা অহমাত্মা, এই বোধ হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমি-আত্মা বা অহমাত্মা এই বোধ হইলে, অবশ্যই আমি-আত্মা, আমার এই বোধও হইয়া থাকে। আত্মার আত্মজ্ঞান হইলে, আত্মা কি তখন নিজে, নিজের অস্তিত্ব-বোধ করেন না? সম্ভবতঃ অবশ্যই করেন। আমি কি,—এই বোধ হইবার পূর্ব্বে 'আমি'র অস্তিত্ব-বোধের অবশ্যই 'আমি'র প্রয়োজন হয়। সুতরাং আত্মা কি,—ইহা আত্মার বোধ হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই আত্মার অস্তিত্ব-বোধ, আত্মার হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আত্মার কেবল আত্মজ্ঞান হইবার প্রয়োজন হইলেও, আত্মার নিজের অস্তিত্ব-বোধ এবং আত্মা কি,—এই বোধ বা জ্ঞান, আত্মারই প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মজ্ঞানই অদ্বৈতজ্ঞান নহে, বলা যাইতে পারে। কারণ তোমার মতে যাহা আত্মজ্ঞান, তাহাতেও দুই প্রকার জ্ঞান বা-বোধের বিশু-

মানতা থাকে। সেই দুই প্রকার বোধের তুমি কোন্‌টিকে সত্য, এবং কোন্‌টিকে অসত্য বলিবে? অথবা ঐ আত্মজ্ঞানে অদ্বৈততার অভাব-বশত কি ঐ উভয় জ্ঞানকেই মিথ্যা বলিবে? কারণ তোমাদের অদ্বৈতমতে একাধিক জ্ঞানও অজ্ঞান। এই দুই প্রকার জ্ঞানকেও অদ্বৈতমতে অজ্ঞানের অন্তর্গত বলা যায়। এক প্রকার জ্ঞানের অতিরিক্ত যে জ্ঞান, তাহাকেই দ্বৈতজ্ঞান বলা যায়। অথবা ঐ দুই প্রকার জ্ঞানকে অদ্বৈত-জ্ঞান বলা যায় না। তবে আমিই আত্মা—বলিলেই বা দোষ হইবে কেন? তবে আমি-আত্মার অস্তিত্ব-বোধ এবং আমি-আত্মা কি,—এই জ্ঞানই বা দূষনীয় হইবে কেন? তুমি আত্মা যাঁহাকে বল, আত্মা শব্দ যেমন তাঁহার একটি উপাধি; তদ্রূপ 'আমি' শব্দও তাঁহার অপর একটি উপাধি স্বীকার করিলেই বা দোষ কি হয়? অদ্বৈতমতে আত্মা শব্দ ব্যতীত তুমি যাঁহাকে আত্মা বল, তাঁহারত আরও অনেক উপাধি আছে? অদ্বৈত-মতে আত্মাকে শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, নির্ম্মল, নিত্য, সত্য, সৎ, চিৎ, আনন্দ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মণ, দৃক্‌ প্রভৃতি নানা উপাধি-বিশিষ্টই স্বীকার করা হয়। তবে সেই আত্মার 'আমি' এই শব্দ, একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? সেই আত্মার 'তুমি' এই শব্দ, একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? সেই আত্মার 'তিনি' এই শব্দ, একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? সেই আত্মার 'যিনি' এই শব্দ, একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? সেই আত্মার 'ইনি' এই শব্দ, একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? অদ্বৈতমতাবলম্বী শঙ্করাচার্য্যও আপনাকে তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক স্থলেই অহমুপাধি-বিশিষ্ট-আত্মা বলিয়া পরিচয়

দিয়াছেন বা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী যে বিদ্বান্ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ং।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ॥"

তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই অহং শব্দ আত্মাবাচকও বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই অহং শব্দ ব্রহ্মবাচকও বলা যাইতে পারে; কারণ তিনি উক্ত পঞ্চত্রিংশ শ্লোকেই বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মাহমেব'। অথর্ব্ব-বেদীয় মহাবাক্যেও অহং শব্দ ব্রহ্মবাচক বা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যবাচক। উক্ত বেদের এই প্রকার মহাবাক্য, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। আত্মা বা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যবাচক যে অহং, সে অহংকে কি প্রকারেই বা অজ্ঞান বলা যায়? আমি-ব্রহ্ম বা আমি-আত্মা বলিলে কিম্বা বোধ হইলে, আমি-ব্রহ্ম বা আমি-আত্মা, আমার নিশ্চয়ই বোধ হইয়া থাকে; সুতরাং সেই আত্মা কখনও অজ্ঞান বলা যায় না। আমি-ব্রহ্ম বোধ হইলে, যদি আমি-ব্রহ্ম বা আমি-আত্মার সে বোধ থাকে, তাহা হইলে সে 'বোধ' হওয়াটাও এক প্রকার অজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

চতুশ্চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

শ্রুতি-বেদান্তানুসারে আত্মজ্ঞানই অদ্বৈতজ্ঞান। শঙ্করাচার্য্যও তাহা তাঁহার অনেক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে—

"তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নং জ্ঞানমঞ্জসা।
অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্‌ভ্রমাদিবৎ ॥"

বলিয়াছেন কেন? তত্ত্ব-স্বরূপানুভবইত এক প্রকার জ্ঞান। অনুভবেরই অপর নাম অনুভূতি,—অনুভূতিই জ্ঞান;—তাহা শঙ্করাচার্য্যের গুরু ভগবৎ-গোবিন্দ-পাদাচার্য্য-পরিব্রাজক-পরম-হংস-স্বামী-রচিত অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেই বোঝা যায়। তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের মতে কি তত্ত্ব-স্বরূপানুভবই ব্রহ্মজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান নহে? তাহা হইলে তৎকথিত তত্ত্ব-স্বরূপানুভবটী, তাঁহার মতে কি? সেটিকে অজ্ঞান বলা যায় না, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে। তাহা হইলে সেই তত্ত্ব-স্বরূপানুভব বা তত্ত্ব-স্বরূপ-জ্ঞান হইতে যে জ্ঞানোৎপত্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেটীই বা কোন্ শ্রেণীর জ্ঞান? উক্ত শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য দ্বি-প্রকার জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন দেখিতেছি। দুই প্রকার জ্ঞান স্বীকার করায়, জ্ঞানও অবিকৃত বলা যায় না; কারণ অদ্বৈতজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান যাহা, তাহা একই প্রকার। তাহারত বহুতা বা বহু-প্রকার বিকাশ, কোন শাস্ত্রানুসারেই নির্দ্দেশিত হয় নাই? আর শঙ্করাচার্য্যের মতে তত্ত্ব-স্বরূপানুভব বা তত্ত্ব-স্বরূপ-জ্ঞান হইতে অন্য এক প্রকার জ্ঞানোৎপত্তির বিবরণ আছে। সুতরাং সেই জ্ঞান উৎপন্ন বলিয়া তাহা নিত্যজ্ঞান নহে, তাহা অদ্বৈতজ্ঞান নহে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান নহে, তাহা আত্মজ্ঞান নহে। তাহা উৎপন্ন বলিয়া অনিত্য। কারণ শ্রুতি-বেদান্ত প্রভৃতি কোন শাস্ত্রমতেই নিত্য-জ্ঞানের, অদ্বৈতজ্ঞানের, ব্রহ্মজ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের, উৎপত্তি এবং বিনাশ

হয় না। নানা শাস্ত্রানুসারে যাহার উৎপত্তি আছে, তাহারই বিনাশ আছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে তত্ত্ব-স্বরূপানুভব বা তত্ত্ব-স্বরূপ-জ্ঞান হইতে যে জ্ঞান, তাহা উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব যুক্তি-প্রমাণানুসারে তাহা নিশ্চয়ই অবিনশ্বর নহে। সেইজন্যই সেই জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বলা যায় না, সেইজন্যই সেই জ্ঞানকে অদ্বৈতজ্ঞান বলা যায় না, সেইজন্যই সেই জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞানও বলা যায় না। যে জ্ঞান আত্মজ্ঞান নহে, বেদান্ত-মতে তাহা নিশ্চয়ই অজ্ঞানেরই এক প্রকার বিকাশ। সুতরাং সেই প্রকার অজ্ঞানোদয়ে অহং এবং মমতা নষ্ট হয়, কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? কোন কোন অদ্বৈতমতে আত্ম-জ্ঞান উদয় হইলেই, অহং এবং মমতা থাকে না।

পঞ্চচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"সম্যক্ বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
একঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা॥"

জ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞান, শ্রেষ্ঠই বুঝিতে হয়। উক্ত শ্লোকানু-সারে শঙ্করাচার্য্যের মতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানী-যোগী নিজ আত্মাতে অখিল-জগৎ দর্শন করেন, এবং জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা এক-আত্মা-কেই সমস্ত দর্শন করেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতেই জগৎ বা জগতের কিছুই অনিত্য এবং অসত্য নহে বুঝিতে হয়। নিজের, আত্মাতে অখিল-জগৎ দর্শন হয়ই বলা হইয়াছে, কিন্তু অখিল-জগৎকে অনিত্য বলা হয় নাই বলিয়া, অখিল-জগৎ

অনিত্য ও অসত্য নহে। উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়-চরণানুসারে সমস্তই আত্মা, সুতরাং অখিল-জগৎও নিশ্চয় সমস্তেরই অন্তর্গত; তাহা হইলেও অখিল-জগৎ, অনিত্য এবং অসত্য বলা যায় না। জ্ঞান-চক্ষু স্বীকার করিলে, জ্ঞানকেও অনিত্য বলিতে হয়। কারণ চক্ষু, প্রাকৃত এবং অনিত্য। জ্ঞানকে চক্ষু বলিলে, সুতরাং জ্ঞানকেও প্রাকৃত এবং অনিত্য বলিতে হয়। অদ্বৈত-মতানুসারে এক-আত্মা ব্যতীত অন্যান্য সমস্তই অনাত্মার বিবিধ-বিকাশ। সুতরাং অদ্বৈতমতে সে বিকাশ সকলকে অনিত্য-অসত্যই বলিতে হয়। অদ্বৈতমতে আত্মার একতা। সেমতে আত্মার বহুতা নাই, আত্মার বহু-বিকাশও নাই। সুতরাং ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে 'সর্ব্বাং,' সেই একাত্মার বিবিধ-বিকাশও বলা যায় না। সেজন্য 'সর্ব্বাং' অনাত্মারই বিবিধ-বিকাশ। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা ও 'সর্ব্বাং' অভেদ। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে 'সর্ব্বাং'কে অনাত্মার বিকাশ বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালা প্রভৃতি মতে জানা যায়,—আত্মা, ব্রহ্ম ও জীব অভেদ। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে যোগ ও যোগীর প্রয়োজন নাই। জীবই আত্মা-ব্রহ্ম স্বীকার করিলে, সেই জীবের আর কাহার সঙ্গে যোগ হইবে? তবে জীব, যোগীই বা কি প্রকারে হইবে? যদি কেহ জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য, যোগ দ্বারা হয় স্বীকার করেন, তাহা হইলেও যোগকে অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ স্বীকার করা হয়। কারণ কোন শাস্ত্রেই যোগকে আত্মা বলা হয় নাই। সেইজন্য যোগও অনাত্মার বিকাশ। যোগের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আছে। সেই নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এক প্রকারও নহে। সুতরাং

যোগেরও এক-প্রকারতা নাই, স্বীকার করা হইয়াছে। যোগের এক-প্রকারতা নাই বলিয়াই, যোগকেও অনাত্মা বলিতে হয়। যোগ অনাত্মারই এক প্রকার বিকাশ বলিয়া, আত্মার যোগী উপাধি হওয়াও সঙ্গত নহে। শঙ্করাচার্য্যের মতে জীবের সহিত ব্রহ্মের যোগ, আবশ্যকই নাই বলিতে হয়। কারণ তিনি জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বলিয়াছেন। সেইজন্য জীবের, ব্রহ্মের সহিত যোগের প্রয়োজন নাই। অতএব সেইজন্য আত্মাকে, জীবাত্মাকে বা ব্রহ্মাত্মাকে যোগী বলা যায় না।

ষট্‌চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে দ্বৈতাদ্বৈত অভেদ বলা যাইতে পারে। কারণ উক্ত শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয়, যে প্রকার মৃৎ বা মৃত্তিকাই ঘট্ প্রভৃতি বিবিধ মৃৎ-পাত্র সকল; তদ্রূপ আত্মাই সমস্ত জগৎ। আত্মা ব্যতীত অন্য পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব সকল পদার্থই আত্মা দেখিতে হয়। আত্মাই সমস্ত জগৎ স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া, আত্মাকে প্রকারান্তরে অনাত্মাই বলিতে হয়। কারণ 'জগৎ সর্ব্বং'ত অনাত্মারই বিকাশ। সেইজন্যই শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে আত্মা এবং অনাত্মা, অভেদ বলিতে হয়। সেইজন্যই দ্বৈত এবং অদ্বৈত, অভেদ বলিতে হয়। উক্ত সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকের মতানুসারে আত্মা ও অনাত্মা

অভেদ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া, আত্মা ও অনাত্মা উভয়েরই নিত্যতা এবং সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। কারণ শ্রৌত, উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন ও বেদান্তসারমতে, আত্মা নিত্য-সত্য। সেই আত্মার সঙ্গে যাহা অভেদ, সুতরাং তাহাও নিত্য-সত্যাত্মা স্বীকার করিতে হয়। অথবা অনাত্মা অনিত্য-অসত্য বলিয়া,—আত্মাও সেই অনাত্মা বলিয়া,—সেই আত্মাকেও অনিত্য-অসত্য বলিতে হয়; কিম্বা আত্মাকে নিত্য-সত্যও বলিতে হয়। এক্ষণে অনাত্মার সঙ্গে নিত্য-সত্য-আত্মার অভেদত্ব প্রদশিত হইয়াছে বলিয়া, সেই অনিত্য-অসত্য-অনাত্মাকেও নিত্য-সত্য বলিতে হয়। আর সেই অনাত্মা অদ্বৈতমতানুসারে অনিত্য-অসত্য বলিয়া সেই অনিত্য, নিত্য-অসত্যও স্বীকার করিতে হয়। তবে এক্ষণে দেখিতে হইবে, ঐ দুই প্রকার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুর পরস্পর ঐক্য হইতে পারে কি না? ঐ প্রকার ঐক্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় কি না? পুরাণ প্রভৃতি অনুসারে দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, এবং পরস্পর অভেদ। নানা পুরাণানুসারে অগ্নি হইতেই জল বিকাশিত, সুতরাং অগ্নি এবং জল পরস্পর অভেদ। কিন্তু ঐ উভয় বস্তু দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে উক্ত উভয় বস্তুতে পরস্পর বিশেষ পার্থক্য এবং বৈপরীত্য আছে। স্ত্রী ও পুরুষ আকারে পরস্পর বিভিন্ন, কিন্তু দেহস্থ সমস্ত বস্তুই প্রায় উভয়ের একই প্রকার। তাঁহারা আত্মাতেও উভয়ে এক। কেবল পুরুষ-ভাব এবং স্ত্রী-ভাববশত পরস্পর আপনারা বিভিন্ন মনে করিয়া থাকেন।

সপ্তচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টচত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"জীবন্মুক্তস্তু তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ।
সচ্চিদানন্দরূপত্বং ভজেদ্ভ্রমরকীটবৎ॥"

উক্ত শ্লোকীয় জীবন্মুক্ত-পুরুষ, আর স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য পরস্পর অভেদ বলা হয় নাই বলিয়া, উক্ত শ্লোকেও দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য দ্বৈতবাদী নহেন, এ কথাও বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্যের সমস্ত গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে, শঙ্করাচার্য্যকে দ্বৈতবাদীও বলা যায়, অদ্বৈতবাদীও বলা যায়। শঙ্করাচার্য্যের মতে জীবন্মুক্ত হইয়া, তবে পূর্ব্বোপাধি ও গুণ সকল পরিত্যাগ করা যায়। সেইজন্যই তিনি তাঁহার আত্ম-বোধ গ্রন্থের অষ্টচত্বারিংশ শ্লোকের প্রথমাংশে বলিয়াছেন,—

'জীবন্মুক্তস্তু তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ।'

কিন্তু আমাদের মতে জীবন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই ঐ প্রকার উপাধি এবং গুণ সকল পরিত্যাগের প্রয়োজন; নতুবা জীবন্মুক্ত হওয়াই যায় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে প্রগাঢ় চিন্তা দ্বারা তৈল-পায়িক যেমন ভ্রমর-কীট হয়, তদ্রূপ শঙ্করাচার্য্য-কথিত সেই জীবন্মুক্ত-পুরুষও প্রগাঢ় চিন্তা দ্বারা সচ্চিদানন্দ-রূপত্ব পাইতে পারেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে জীবন্মুক্ত-পুরুষ ঐ প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন্ না, কেবল তিনি সচ্চিদানন্দ রূপত্বই প্রাপ্ত হন্। তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের মতে সচ্চিদানন্দও কি রূপ? তাঁহার মতে তিনি কি স্বরূপ বা আত্মা নহেন? যদি বলা হয় 'সচ্চিদানন্দরূপত্বং' অর্থে, উক্ত শ্লোকে সচ্চিদা-

নন্দের রূপত্ব বা রূপতা; তাহা হইলে আমাদের মতে তাহাও বলা যায় না। কারণ শঙ্করাচার্য্যের এই আত্মবোধ গ্রন্থে, আত্মা এবং আত্মবোধের প্রাধান্য প্রদর্শনই প্রধান উদ্দেশ্য। উক্ত গ্রন্থে রূপের প্রাধান্য প্রদর্শন, উদ্দেশ্য নহে। ঐ গ্রন্থের প্রধান টীকাকারগণ এবং ভাষ্যকারগণের মতে, রূপের অনিত্যতা ও রূপের অসত্যতা প্রতিপাদন করাই উক্ত গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। শঙ্করাচার্য্যের '**সচ্চিদানন্দরূপত্বং**' লিখিবার উদ্দেশ্য না থাকিলে কি তাঁহার অগোচরেই ঐ প্রকার লিখিত হইয়াছে? '**সচ্চিদানন্দরূপত্বং**' বলিলে, কেহ উহার অর্থ, সচ্চিদানন্দই রূপ বুঝেন। অপর কেহ বা অর্থ করেন, সচ্চিদানন্দের রূপত্ব। তাঁহাদের মতে সচ্চিদানন্দই রূপত্ব নহে। উক্ত শ্লোকানুসারে তৈলপায়িকের রূপ, ভ্রমর-কীটের রূপ হয় স্বীকার করিলে, জীবন্মুক্তের রূপও সচ্চিদানন্দের রূপ হয়, স্বীকার করিতে হয়; অথবা জীবন্মুক্তের রূপ, সচ্চিদানন্দ—এই যে রূপ, তাহাই হয়। '**ভ্রমরকীটবৎ**' বলায় বুঝিতে হয়,—ভ্রমর-কীটের সমস্তই তৈলপায়িকের হয়; তাহা হইলে জীবন্মুক্তের কেবল সচ্চিদানন্দের রূপ-প্রাপ্তিই হয়, স্বীকার করা হইবে কেন? তাহা হইলে উক্ত উদাহরণানুসারে জীবন্মুক্তের,—সচ্চিদানন্দের সমস্তই হয় স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু '**সচ্চিদানন্দরূপত্বং**' অর্থে, সচ্চিদানন্দের রূপ, স্বরূপ এবং অন্যান্য সমস্ত বুঝিবার কোনই কারণ নাই। কারণ রূপ অর্থে বা রূপত্ব অর্থে, ঐ সকল হয় না। তবে উক্ত শ্লোকের '**সচ্চিদানন্দরূপত্বং**' অর্থে কি কেবল সচ্চিদানন্দের রূপত্ব বা রূপতা বুঝিতে হইবে? তাহাই বা কি প্রকারে বোঝা যায়। উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে,—জীবন্মুক্ত, সচ্চিদানন্দ-

রূপত্ব প্রাপ্ত হন্। অদ্বৈতমতের কোন গ্রন্থমতেই জীবন্মুক্ত অর্থে, কোন প্রকার রূপ বুঝিতে হয় না। আত্মার জীবত্ব-নাশ হইলেই তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। সেই জীবত্ব-বিমুক্তাত্মাই, সচ্চিদানন্দের রূপত্ব বা রূপতা পানই বা, কি প্রকারে বলা যায় ? কারণ অদ্বৈতমতের বহু গ্রন্থের মধ্যে কোন গ্রন্থেই বলা হয় নাই, জীবন্মুক্ত হইলে রূপের পরিবর্ত্তন হইয়া অন্য-রূপ হয়। কেহ জীবন্মুক্ত হইলে, নানা শাস্ত্রানুসারে তাঁহার পূর্ব্ব রূপই থাকে। তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য কোন রূপ হয় না। সুতরাং উক্ত শ্লোকে বোধ করি, জীবন্মুক্ত-আত্মা—সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হন্ বলা উদ্দেশ্য। তাহা হইলে অনর্থক 'রূপত্বং,' এই শব্দ ব্যবহার না করিলেই হইত। কেবল মাত্র 'সচ্চিদানন্দত্বং' শব্দ ব্যবহার করিলেই চলিত। অথবা 'সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বং' ব্যবহার করিলেও চলিত। শঙ্করাচার্য্যের নানা গ্রন্থমতে আত্মাই সৎ, আত্মাই চিৎ এবং আত্মাই আনন্দ। জীবন্মুক্তও আত্মা। তবে শঙ্করাচার্য্যের মতে সেই জীবন্মুক্তের সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হইবারই বা প্রয়োজন কি ? অদ্বৈতমতানুসারে জীবন্মুক্ত এবং সচ্চিদানন্দ অভেদ। তবে সেই জীবন্মুক্তের সচ্চিদানন্দত্বেরই বা প্রয়োজন কি ?

অষ্টচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত ।

আত্মবোধ গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"তীর্ত্ত্বা মোহার্ণবং হত্বা রাগদ্বেষাদিরাক্ষসান্।
যোগী শান্তিসমাযুক্তো হ্যাত্মারামো বিরাজতে ॥"

নানা যোগ-শাস্ত্র অনুশীলন করিলে জানিতে পারা যায়, যোগীর মোহ নাই, যোগীর রাগ-দ্বেষ প্রভৃতিও নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে,—

"তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি-
মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী
ভবার্জ্জুন॥" ৬ অঃ। ৪৬ শ্লোঃ।

উক্ত গীতা-শাস্ত্রমতে, জ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। অনেক শাস্ত্রানুসারেই জ্ঞানলাভ হইলে, মোহ এবং রাগ-দ্বেষ প্রভৃতিও থাকে না। যোগী সেই মোহ-রাগ-দ্বেষ-বিহীন-জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য সেই যোগীব মোহ এবং রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি থাকিতেই পারে না। তবে যোগ-সাধকের মোহ এবং রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি থাকিতে পারে, স্বীকার করা যায়। সেই যোগ-সাধককে ঐ সকল হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য নানাপ্রকার যোগ-সম্বন্ধীয় সাধনাও করিতে হয় সত্য। তিনি মোহ এবং রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি পাইলে, তিনি আর তখন যোগ-সাধক থাকেন না। তখন তাঁহাকে যোগ-সিদ্ধ বা যোগী বলা যায়। সম্পূর্ণ-রূপে যোগ-সিদ্ধ না হইলে, সেই যোগ-সাধককে যোগী বলা যাইতে পারে না। যোগ-সিদ্ধ বা যোগী হইলে, তাঁহাকে শান্তি-সমাযুক্তও বলা যায়। তখন তাঁহাকে আত্মারামও বলা যায়। তখন বাস্তবিক তিনি সর্ব্ব-বন্ধন-বিমুক্ত-শান্তি-সমাযুক্ত-আত্মা-রামও বটেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে ঐ প্রকার যোগী কি আত্ম-জ্ঞানী নহেন? আত্মজ্ঞান হইলেই অদ্বৈতজ্ঞান হয়। তবে সেই

যোগী শান্তি-সমাযুক্ত হন, কি প্রকারে বলা হইয়াছে? আত্মজ্ঞানী যে 'কেবল';—তাঁহার সহিত কিছুরই যোগ থাকিতে পারে না। সেইজন্য তাঁহার সহিত শান্তিরও যোগ থাকিতে পারে না। প্রসিদ্ধ অদ্বৈতমতে ও বেদান্তানুসারে, শান্তির সহিত আত্মার ঐক্য বা অভেদত্ব প্রদর্শন করা হয় নাই। অতএব সেই কারণে আত্মা এবং শান্তি অভেদও বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়ানুসারে যোগী, আত্মা এবং শান্তি অভেদ হইলে, তিনি,—যোগী শান্তি-সমাযুক্ত হইয়া আত্মারাম-রূপে বিরাজিত হন্ বলিতেন না।

একোনপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"বাহ্যানিত্যসুখাসক্তিং হিত্বাত্মসুখনির্ব্বৃতঃ।
ঘঠস্থদীপবৎ স্বস্থঃ স্বান্তরেব প্রকাশতে॥"

উক্ত শ্লোকেও দ্বৈতবাদ প্রকাশিত। কারণ উক্ত শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত অপর কোন যোগী উদাহৃত হইয়াছেন, এইরূপই বুঝিতে হয়। উক্ত শ্লোক, শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত অপর কোন যোগী-সম্বন্ধীয় বলিয়া, উহা দ্বৈতবাচক বলিতে হয়। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য দ্বৈতবাদ স্বীকার করিতেন না, বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য-কথিত উক্ত পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয়, যোগী বাহ্য-অনিত্য-সুখাসক্তি পরিত্যাগ করত আত্ম-সুখে বিরত হইয়া, ঘটস্থ-দীপবৎ নিজ অন্তরে প্রকাশিত থাকেন। যোগী আত্ম-সুখে বিরত হন্ স্বীকার করিলে, যোগী

আত্ম-দুঃখে রত হন্‌ও স্বীকার করিতে হয়। কারণ যেমন আলোকাভাব বলিলেই অন্ধকার বুঝিতে হয়, তদ্রূপ আত্ম-সুখের অভাব বলিলেই আত্ম-দুঃখের বিদ্যমানতা বুঝিতে হয়। সেইজন্যই শঙ্করাচার্য্যের উক্ত পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে যোগী আত্ম-সুখে বিরত হন্‌ স্বীকার করিলে, সেই আত্ম-সুখ-বিরতি হইলে, তিনি অবশ্যই আত্ম-দুঃখে রত হন্‌। যদি বল, তিনি কেবল আত্ম-সুখেই বিরত হন্‌, তিনি সেজন্য আত্ম-দুঃখে রত হন্‌ না, তাহাও বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে উক্ত শ্লোকে, তিনি আত্ম-দুঃখে রত হন্‌ নাও বলা উচিত ছিল। যদি বলা হয়, উক্ত শ্লোকে তিনি আত্ম-সুখে বিরত হইলে, তিনি আত্ম-দুঃখে রত হন্‌ বলা হয় নাই, তবে কি প্রকারে তিনি আত্ম-সুখে বিরত হইলে, আত্ম-দুঃখে রত হন্‌ স্বীকার করা যাইবে? আমরা বলি, সেই যোগী আত্ম-সুখে বিরত হইলে, তিনি আত্ম-দুঃখে রত হন্‌ না, বলা হয় নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে, যে তিনি আত্ম-সুখে বিরত হইলে আত্ম-দুঃখে রত হন্‌। তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে অবস্থাও যোগীর আকাঙ্ক্ষনীয় হওয়া উচিত নহে। আর উক্ত শ্লোকানুসারে যোগীর নিজ-অন্তরে প্রকাশ হওয়াটাই বা কি,—তাহাও অনেকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অতি দুষ্কর। ঘটস্থ-দীপ ও ঘট অভেদ নয়। যোগী এবং যোগীর দেহ-ঘট অভেদ নয়। সেইজন্য সেই যোগীর দেহটীকে, সেই যোগীর বহির্ভাগ বলা যায় না। তাহা হইলে সেই যোগীর বহির্ভাগ কোন্‌টী, আর তাঁহার অন্তরই বা কোন্‌টী? যোগীত আত্মা। অতএব সেইজন্য অদ্বৈতমতানুসারেই তাঁহার অন্তর-বাহ্যের পার্থক্য কিছুই নাই। ঘটস্থ-দীপ যাহা,—তাহার অন্তরে কেবল

প্রকাশকতা আছে বলা যায় না, তাহার বাহিরেও প্রকাশকতা আছে। যোগী-আত্মার সহিত ঐ ঘটস্থ-দীপের তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া, যোগী-আত্মার বাহিরেও প্রকাশ নাই বলা যায় না। যোগী-আত্মার অন্তরে-বাহিরে প্রকাশ। কারণ অদ্বৈতমতে আত্মা সর্ব্বব্যাপী ;—সুতরাং তাঁহার কোথায় না প্রকাশ ? তিনি অন্তরেও প্রকাশিত, তিনি বাহিরেও প্রকাশিত, তিনি সর্ব্বত্রেই প্রকাশিত।

পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের একপঞ্চাশৎ ও দ্বি-পঞ্চাশৎ শ্লোকে পরমহংস শঙ্করাচার্য্য, মুনি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"উপাধিস্থোঽপি তদ্ধর্ম্মৈর্নির্লিপ্তো ব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ॥
উপাধিবিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।
জলে জলং বিয়দ্ব্যোম্নি তেজস্তেজসি বা যথা॥"

উক্ত দুই শ্লোকও দ্বৈতবাদ প্রকাশক। উক্ত দুই শ্লোকেব কোনটীতেই মুনির সহিত শঙ্করাচার্য্য নিজে অভেদ, তাহা স্বীকার করেন নাই। উক্ত দুই শ্লোকের প্রথম শ্লোকানুসারে মুনি এবং ব্রহ্ম, অভেদ বুঝিবারও কোন কারণ নাই। তবে উক্ত দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম চরণানুসারে 'উপাধিবিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।' তাহা হইলেও

মুনি ও বিষ্ণু অভেদ হন্, বুঝিবার কোন কারণ নাই। উক্ত শ্লোকাংশে বলা হইয়াছে, উপাধি বিষ্ণুতে লীন হইলে, সেই মুনিও সেই বিষ্ণুতে প্রবেশ করেন, এবং তজ্জন্য তিনি নির্ব্বিশেষ হন। উপাধি বিষ্ণুতে লয় হয়, বলা হইল; কিন্তু মুনি বিষ্ণুতে লয় হন্ত বলা হইল না। উপাধি-লয়ান্তে মুনিও সেই বিষ্ণুতে প্রবেশ করেন বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে 'বিলয়াৎ' এবং 'বিশেষ' একার্থে প্রয়োগ হইলে, ঐ উভয় শব্দের কেবল একটি থাকিলেও চলিতে পারিত। তাহা হইলে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইত, উপাধি এবং মুনি, উভয়ই বিষ্ণুতে লীন হন্। উক্ত শ্লোকের অর্থানুসারে বোধ হয়, কেবল উপাধিই বিষ্ণুতে লীন হয়; কিন্তু মুনি বিষ্ণুতে লীন হন্ না, কেবল প্রবেশ করেন মাত্র। নানা শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণুই আত্মা, বিষ্ণুই পরমাত্মা, বিষ্ণুই ব্রহ্ম। আর অদ্বৈতমতে উপাধি বা উপাধি সকল, অনাত্মার নানাপ্রকার বিকাশ। সেই কারণে ঐ সকলও অনাত্মা স্বীকার করিতে হয়। অনাত্মা-উপাধি বা উপাধি সকল আত্মাতে লীন হয়, স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ সত্যাত্মাতে অসত্য মিশাইতে পারে না। কারণ যাহা অনাত্মা ও যাহা অসত্য, তাহাত প্রকৃত পক্ষে নাই বলিতে হয়। নাই যাহা,—যাহা আছে, যাহা সত্য ও যাহা নিত্য, তাহা কি প্রকারে মিশিবে? আত্মা-বিষ্ণুতে অনাত্মা-উপাধি বা উপাধি সকল মিশ্রিত হইতে পারেও, স্বীকার করা যাইতে পারে। জলে শর্করা মিশ্রিত হয় স্বীকার করিলে, অবশ্যই শর্করাতেও জল মিশ্রিত হয় স্বীকার করিতে হয়। অদ্বৈতমতানুসারে মুনিকেও অনাত্মা বলা যায় না। কারণ উক্ত একপঞ্চাশৎ

শ্লোকানুসারে নির্লিপ্ত-আত্মার লক্ষণ সকলের কয়েকটী লক্ষণ, মুনির বলা হইয়াছে। উক্ত একপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"উপাধিস্থোঽপি তদ্ধর্ম্মৈর্নির্লিপ্তো ব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ॥"

সুতরাং আত্মা-মুনি এবং আত্মা-বিষ্ণু পরস্পর অভেদ। তবে আত্মা-মুনির আত্মা-বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হইবারই বা প্রয়োজন কি? অদ্বৈতমতানুসারে উভয়ে অখণ্ডাত্মা এবং অভেদ হইলে, আত্মা-মুনির কিসে প্রবেশ বা লয় হইবে? আমি-আত্মার আমি-আত্মাতে প্রবেশ বা লয়, কি প্রকারে হইতে পারে? সুতরাং আত্মা-মুনি আত্মা-বিষ্ণু বলিয়া, আত্মা-বিষ্ণুতে আত্মা-মুনির প্রবেশ বা লয় হইতে পারে, স্বীকার করা যায় না। আর শঙ্করাচার্য্য যদি দ্বৈতবাদী হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই বিষ্ণু এবং মুনির পরস্পর ভিন্নতা বা পার্থক্য স্বীকার করিতে পারিতেন।

একপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

প্রাচীন কত শাস্ত্রেই কত মুনি, মহামুনিগণের উপাখ্যান ও উপদেশ সকল পাঠ করা হইয়াছে। তাঁহাদের চরিত্র সকল আলোচনা করিয়া, তাঁহারা যে সগুণ-সক্রিয় ছিলেন, তাহাই বোঝা গিয়াছে। যদি বল, তাঁহারা কখন কখন নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হইতেন, তাহা স্বীকার করিলেও, তাঁহাদের কাহাকেও আত্মা-ব্রহ্মের সহিত অভেদ বলিতে পার না। কারণ বেদান্তানুসারে আত্মা-ব্রহ্ম, নিত্য-নির্ব্বিকার এবং নিত্য-নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়

বুঝিতে হয়। তাহা হইলে তাঁহাদের চরিত্র-সম্বলিত উপাখ্যান সকল পাঠে, তাঁহাদের কাহাকেও নিত্য-নির্ব্বিকার, নিত্য-নির্গুণ এবং নিত্য-নিষ্ক্রিয় বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত এক-পঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"উপাধিস্থোঽপি তদ্ধর্ম্মৈর্নির্লিপ্তো ব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ॥"

অজ্ঞান-ব্যোম স্বভাবত সগুণ-সক্রিয় নহে। তাহা স্বভাবত নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়। সুতরাং স্বভাবতই তাহা কোন উপাধিতে লিপ্ত নহে। কিন্তু সজ্ঞান-সগুণ-সক্রিয়-মুনি উপাধিস্থ হইয়া বা উপাধিতে লিপ্ত হইয়াও সেই উপাধি-ধর্ম্মে কি প্রকারে নির্লিপ্ত রহেন্? উক্ত শ্লোকের শেষ চরণানুসারে, সেই মুনি সর্ব্ববিৎ হইয়াও মূঢ়বৎ থাকেন বলিলে, তিনি সর্ব্ববিৎ এবং মূঢ় উভয়ই, ইহা বুঝিতে হয় না। যেমন কোন পুরুষ স্ত্রী-লোকের বেশের মতন বেশ করিলে, তাহাকে স্ত্রীলোক বলা যায় না, তদ্রূপ কোন সর্ব্ববিৎ-মুনি নিজ ইচ্ছানুসারে মূঢ় বা অজ্ঞের ন্যায় থাকিলে, তাঁহাকে কখনই মূঢ় বা অজ্ঞ বলা যাইতে পারে না। ঐরূপ থাকিলেও তাঁহাকে সর্ব্ববিৎ বলিতে হয়। যেহেতু সর্ব্ববিৎ এবং অসর্ব্ববিৎ, এক ব্যক্তিকেই বলা যায় না। সর্ব্ববিৎ যিনি, তিনি কেবল সর্ব্ববিৎ,—তিনি তখন অসর্ব্ববিৎ নহেন্; অসর্ব্ববিৎ যিনি, তিনি কেবল অসর্ব্ববিৎ,—তখন তাঁহাকে সর্ব্ববিৎ বলা যায় না। উক্ত উদাহরণানুসারে একজন মুনিকে, সর্ব্ববিৎ এবং অসর্ব্ববিৎ বলা যায় না। সর্ব্ববিৎ-মুনিকে কেবল সর্ব্ববিৎ বলিতে হয়। একজন মুনি এক সঙ্গে সর্ব্ববিৎ এবং

অসর্ব্ববিৎ, উভয়ই হইতে পারেন না। উপাধিস্থ-সর্ব্ববিৎ-মুনি যিনি, তাঁহাকে সোমবৎ নির্লিপ্ত বলা যায় না। তাঁহাকে লিপ্তই বলিতে হয়। সেই কারণে তাঁহাকে সগুণ-সক্রিয় বলিতে হয়। সগুণ-সক্রিয়,—সম্পূর্ণ নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় না হইলে, নির্লিপ্ত হইতে পারেন না। যে মুনি বায়ুবৎ বিচরণ করেন, তাঁহাকে সর্ব্ব-বিষয়ে আসক্তি-শূন্যও বলা যায় না। কারণ বায়ুকে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের সঙ্গে লিপ্ত হইতে হয়। প্রত্যক্ষ দর্শন করা হইয়াছে, পুষ্পোদ্যান দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে, যে বায়ুতে সুগন্ধ লিপ্ত হয়;—সেই বায়ু বিষ্ঠা-রাশির উপর দিয়া প্রবাহিত হইলে, তাহাতেই দুর্গন্ধ লিপ্ত হয়। অতএব ঐ প্রকার বায়ুর সঙ্গে যে মুনির তুলনা হইয়াছে, সে মুনিকে সম্পূর্ণ আসক্তি-বিহীন কি প্রকারে বলা যাইবে? তাঁহাকে কি প্রকারেই বা নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় এবং নির্লিপ্ত বলা যাইবে?

দ্বি-পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থে ব্রহ্মের যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, সে সকলের কতকগুলি শ্লোক নিম্নে বলা হইতেছে;—

"যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎ সুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥৫৩॥
যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥৫৪॥

তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥৫৫॥
অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ম্।
অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
অনণ্বস্থূলমহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ম্।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
যদ্ভাসা ভাস্যতেঽর্কাদির্ভাস্যৈর্যত্তু ন ভাস্যতে।
যেন সর্ব্বমিদং ভাতি তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥৬০॥"

উক্ত সকল শ্লোকানুসারে পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম কি, এবং সেই ব্রহ্মের লক্ষণ সকল কি, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বোঝা যাইতে পারে। উপরোক্ত শ্লোকের মধ্যে কোনটীতেই শঙ্করাচার্য্য নিজেই ব্রহ্ম বলেন নাই। ঐ সকল শ্লোকানুসারে তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু বুঝিতে হয়। সুতরাং ঐ সকল শ্লোকানুসারে শঙ্করাচার্য্যের দ্বৈতবাদ ছিল বুঝিতে হয়। ঐ সকল শ্লোকের অনেক স্থলেই শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মে দৃঢ়-বিশ্বাস, বিশেষ অনুরাগ, বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিশেষ ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে 'যল্লাভান্নাপরো লাভো,' কিনা যাঁহাকে লাভ করিলে, অপর লাভের বাসনা থাকে না। একথা প্রকৃত কৃষ্ণানুরাগীরই কথা। সেই পরমব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলে, যথার্থই অন্য সকল লাভকে তুচ্ছ ও অতি হেয় বোধ হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতে 'যৎ সুখান্নাপরং সুখম্,' কিনা যে সুখ অপেক্ষা অন্য সুখ শ্রেষ্ঠ নহে। বাস্তবিক, যথার্থ কৃষ্ণ-প্রেমিকের

পক্ষে সেই পরমব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণই সুখ। কৃষ্ণ-সুখাপেক্ষা সেই কৃষ্ণ-প্রেমিকের অন্য সুখকে যথার্থই হেয় বোধ হয়। তাঁহার যথার্থ, অন্য সুখকে নিকৃষ্টই বোধ হয়। সুখ অর্থে, আনন্দ। অদ্বৈতমতের অনেক গ্রন্থেই, ব্রহ্মকে আনন্দ বলা হইয়াছে। পৌরাণিক-মতে শ্রীকৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ। সেইজন্য সেই কৃষ্ণ-ব্রহ্মই আনন্দ। কোন কোন পুরাণে ও কোন কোন তন্ত্রে, শিবকে সদানন্দ বলা হইয়াছে, সেইজন্য শিবও আনন্দ। মাণ্ডুক্যোপনিষদের মতে, সেই শিবই ব্রহ্ম। সুতরাং সেই শিবই কৃষ্ণ-ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের মতে 'যজ্‌জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং,' অর্থাৎ যে জ্ঞান অপেক্ষা অন্য, জ্ঞানই নহে। প্রকৃত কৃষ্ণ-প্রেমিকের পক্ষে, যে জ্ঞান দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়; সেই জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না। কত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলায়, সেই শ্রীকৃষ্ণই, চিৎ বা জ্ঞান স্বীকার করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে 'যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং,' অর্থাৎ যাঁহাকে দর্শন করিয়া অন্য কোন পদার্থকেই দর্শনযোগ্য বোধ হয় না। পুরাণমতে—যাঁহারা কৃষ্ণ-হরিকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর অন্য কোন ব্যক্তিকে,—তাঁহারা আর অন্য কোন পদার্থই দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণে নির্হেতু প্রগাঢ় প্রেম হইলে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া অপর আর কিছুকেই দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় না,—তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত নানা-পুরাণে আছে। শঙ্করাচার্য্য 'যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং' বলায় বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম—দর্শন করা যায়। ঐ কথায় বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম আকার। ঐ কথানুসারে ব্রহ্ম আকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আকারই দর্শন করা যায়।

ঐ কথানুসারে ব্রহ্ম সাকার না বলিবার কারণ,—সাকারই নিরাকার; এবং তাহা দর্শন করা যায় না বলিয়া, সাকারের অস্তিত্ব, কেবল অনুভূতি দ্বারা অবধারিত হয়। উক্ত প্রমাণানুসারেই আকার-শালগ্রামকে ব্রহ্ম-শীলা বলা যাইতে পারে। উক্ত প্রমাণানুসারেই আকার-জগন্নাথকে দারু-ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। উক্ত প্রমাণানুসারেই গঙ্গাকারকে ব্রহ্ম-বারি বলা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের মতে 'যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ,' অর্থাৎ যাহা হইয়া, পুনরায় অন্য কিছু হইতে হয় না। উক্ত শ্লোকাংশে 'যৎ' শব্দ, ব্রহ্ম শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে; সুতরাং বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম হইলে অন্য কিছু হইতে হয় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে দেখিতেছি, অব্রহ্মও ব্রহ্ম হইতে পারেন। প্রকৃত কথায়,—মহর্ষি-ব্রহ্মবিৎ-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, অষ্টাবক্র, পরমহংস-গোবিন্দ-ভগবৎ, শঙ্করাচার্য্য ও প্রসিদ্ধ পঞ্চদশী নামক গ্রন্থ রচয়িতার মতে, অব্রহ্মই অনাত্মা। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে অব্রহ্ম-অনাত্মাও আত্মা-ব্রহ্ম হইতে পারেন। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে অব্রহ্ম-জীব ব্রহ্ম হয়, বলা যায় না; কারণ তাঁহার মতে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' সেইজন্য তাঁহারই মতে, জীবকে আর ব্রহ্ম হইতে হয় না। তাঁহার ব্রহ্মনামাবলী-মালা গ্রন্থে, তিনি যে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং,' অর্থাৎ যাঁহাকে জ্ঞাত হইলে অন্য কিছুকেই জানিবার যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না; অথবা যাঁহাকে জ্ঞাত হইলে অন্য কিছু জানিবার আর অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, জ্ঞেয়ত সেই একমাত্র ব্রহ্মই। শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম যে কি,—ইহা যে ভক্ত,—ইহা যে কৃষ্ণ-প্রেমিক

বুঝিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জ্ঞেয় বা জানিবার যোগ্য, আর অন্য কি হইতে পারে? তাঁহার আর অন্য কিছু জানিবার আস্থাই থাকে না; তাঁহার আর অন্য কিছু জানিবার প্রয়োজনই থাকে না। শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রি-পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে ব্রহ্মই জ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে, সেই ব্রহ্মই জ্ঞেয়। অথচ শঙ্করাচার্য্যের উক্ত গ্রন্থেরই চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে, 'জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।' তাহা হইলে সেই পরাত্মা বা পরমাত্মা-ব্রহ্মকে আত্মবোধের ত্রি-পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে জ্ঞান ও চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে জ্ঞেয়, কি প্রকারেই বা বলা যায়? শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে, সেই শ্রুতি, বেদান্ত, স্মৃতি ও পুরাণ-সম্মত নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, শুদ্ধ, অপরিবর্ত্তনীয় ও অদ্বিতীয়-ব্রহ্মকে যদি কখন জ্ঞান এবং কখন বা জ্ঞেয় বলিতে হয়; তাহা হইলে তাঁহাকে পুরাণানুসারে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি বলিবারই বা কি আপত্তি হইতে পারে? তাহা হইলে মহাভাগবতানুসারে, সেই ব্রহ্মকে মহাকালী বলা সম্বন্ধেই বা কি আপত্তি হইতে পারে? তাহা হইলে সেই ব্রহ্মকে স্কন্ধ-পুরাণ, শিব-পুরাণ, লিঙ্গ-পুরাণ ও সৌর-পুরাণ প্রভৃতি অনুসারে, শিব বলিলেই বা কি দোষ হইতে পারে?—কি আপত্তি হইতে পারে? যিনি জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, এই দ্বি-প্রকার ভেদ হইতে পারেন, তিনি ঐ দুইও হইতে পারেন। আবার বহু হইতে পারেনই বা স্বীকার করা যাইবে না কেন? তাঁহাকে জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বলিলে, যদি তাঁহার অদ্বৈততার হানি না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে রাম, কৃষ্ণ, মহাকালী, শিব প্রভৃতি বলিলেই বা তাঁহার অদ্বৈততার হানি বা বাধা হইবে

কেন? একই বীজ বৃক্ষ হইলে, সেই একেই কি বহু প্রকাশিত হয় না? ঐ প্রকারে সেই একই ব্রহ্ম বহু-রূপে পরিণত হইলেই বা ক্ষতি কি? কারণ শ্রুতিতেই আছে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' পঞ্চ-পঞ্চাশৎ শ্লোকীয় 'তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দ-মদ্বয়ম্' স্বীকার করিলে, ব্রহ্ম যে সান্ত বা অন্ত-বিশিষ্ট, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ উক্ত শ্লোকাংশে তাঁহাকে বা ব্রহ্মকে ঊর্দ্ধভাগে, অধোভাগে এবং চতুর্দ্দিকে পূর্ণ বলা হইয়াছে। সেইজন্যইত তাঁহাকে সান্ত বা অন্ত-বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে—বলা হইতেছে। কারণ প্রাকৃত-ঊর্দ্ধভাগের, অধোভাগের এবং চতুর্দ্দিকের অন্ত আছে। তজ্জন্য সেই ব্রহ্ম ঐ তিনে পরিপূর্ণ বলা হইয়াছে বলিয়া, তিনি যে অনন্ত নহেন্, ইহাও প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। তবে পুরাণানুযায়ী সেই ব্রহ্ম কোন পরিমিত দেহ-বিশিষ্ট হইলেই বা শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীগণের কি আপত্তি হইতে পারে? সর্ব্বশক্তিমান-পরমেশ্বর-ব্রহ্ম যিনি, তাঁহার পক্ষে কি অসম্ভব? তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতে পারেন। সামান্য জীব তাঁহাকে কোন কথা বলিয়া বাড়াইতেও পারে না,—সামান্য জীব তাঁহাকে কোন কথা বলিয়া কমাইতেও পারে না। জীবের প্রতি কৃপা-বশত তিনি কত কি করিয়া থাকেন। জীবের প্রতি কৃপা-বশত তিনি কত কি হইয়া থাকেন। এই সিদ্ধান্তদর্শনের প্রথম ভাগে বেদান্তানুসারে, বেদান্তের অসত্যতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ষট্পঞ্চাশৎ শ্লোকীয় 'অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ম্' বলিলেই বা কি হইতে পারে?

আমি আর 'আমি'র আনন্দ, কথনই অভেদ বলা যাইতে পারে না। তদ্রূপ ব্রহ্ম আর ব্রহ্মের আনন্দ, কথনই অভেদ বলা যায় না। সেই কারণে অথণ্ডানন্দ, ব্রহ্মকে না বলিয়া ব্রহ্মেরই অথণ্ডানন্দ বলা উচিত। অথণ্ডানন্দার্থে, অথণ্ডানন্দ-বিশিষ্টও বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ব্রহ্মকে অথণ্ডানন্দ বলিলেও বলিতে পারা যায়। ষট্পঞ্চাশৎ শ্লোকের 'একম্' শব্দকেও নিত্য বলিতে পার না। কারণ 'একম্' শব্দও সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত ভাষাতেও বহুতা আছে। সেইজন্য সে ভাষাও আত্মা-ব্রহ্ম নহে। বহু সংখ্যার মধ্যে 'একম্' শব্দও একটী সংখ্যা। সেইজন্য 'একম্' প্রাকৃত। সেইজন্য 'একম্,' অনাত্মারই এক প্রকার বিকাশ। সেইজন্য ব্রহ্ম 'একম্' নহেন্। 'একম্' শব্দ আত্মা নহেন্ বলিয়া, 'একম্' শব্দকেও নিত্য বলা যায় না। সুতারাং 'একম্' শব্দের অর্থ যাহা, তাহাও ব্রহ্ম নহেন্ স্বীকার করিতে হয়। তুমি এক-ব্রহ্ম বলিলেই কি তিনি বাড়িবেন? কারণ সেই 'এক'ত কেবল তাঁহাকেই বলা হয় না। এক-চন্দ্র এক-সূর্য্য একাকাশ প্রভৃতিও বলা যায়। একোনষষ্টি শ্লোকে ব্রহ্মকে 'অনণু,' 'অস্থূলম্,' 'অহ্রস্বম্,' 'অদীর্ঘম্,' 'অজম্,' 'অব্যয়ম্' ও 'অরূপগুণবর্ণাখ্যং' বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকে আত্মা-ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

"আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে॥"

সুতরাং উক্ত শ্লোকানুসারে সেই আত্মা-ব্রহ্মকে 'অণু,' 'স্থূলম্,'

'হ্রস্বম্,' 'দীর্ঘম্,' 'জম্,' 'ব্যয়ম্' ও 'রূপগুণবর্ণাখ্যং' বলিতে পারা যায়। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালার একোনবিংশ শ্লোকেও, উক্ত সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকের পোষকতা করে। ব্রহ্মনামাবলী-মালার সেই শ্লোক এই প্রকার,—

"ঘটকুড্যাদিকং সর্ব্বং মৃত্তিকামাত্রমেবহি।
তদ্বদ্‌ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি বেদান্ত ডিম্ ডিমঃ॥"

ত্রি-পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের ষষ্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"যদ্ভাসা ভাস্যতেঽর্কাদির্ভাস্যৈর্যত্তু ন ভাস্যতে।
যেন সর্ব্বমিদং ভাতি তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥"

উক্ত শ্লোকের 'যদ্ভাসা' অর্থে, যে প্রভা অথবা যাঁহার প্রভাও বলা যাইতে পারে। 'যদ্ভাসা' অর্থে, যে প্রভা স্বীকার করিলে, অবশ্যই সেই প্রভা যাঁহার, তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হয়। উক্ত 'যদ্ভাসা' অর্থে, যাঁহার প্রভা বলিলেওত অসঙ্গত হয় না? সুতরাং উক্ত 'যদ্ভাসা' অর্থে, যে ব্রহ্মের প্রভা এবং যে ব্রহ্ম-প্রভা, উভয়ই বলা যাইতে পারে। কারণ ব্রহ্ম অর্থে, শক্তি ও শক্তিমান উভয়ই। কারণ ব্রহ্ম অর্থে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই। অদ্বৈতমতের গ্রন্থ সকলে ব্রহ্ম-শব্দ, যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্রহ্ম-শব্দ, সে অর্থে সকল স্থলে ব্যবহৃত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থমতে ব্রহ্ম অর্থে, যোনি বা প্রকৃতি। নানা শাস্ত্রানুসারে সেই প্রকৃতি-ব্রহ্মই

শক্তি। সুতরাং সেই শক্তি-ব্রহ্ম আর শক্তিমান-ব্রহ্ম অভেদ্। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ প্রভৃতির মতে, ব্রহ্ম সগুণ-সক্রিয়। সগুণ-সক্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তিমান। কিন্তু শ্রুতি-বেদান্তমতে, ব্রহ্ম নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়। শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত ষষ্টি শ্লোকানুসারে, সেই ব্রহ্মকে সগুণ-সক্রিয়ই বলিতে হয়। কারণ উক্ত শ্লোকানুসারে যে ব্রহ্মকে 'যদ্ভাসা,' অর্থাৎ যে প্রভা, যে জ্যোতি কিম্বা যে আলোক বলা যায়; আবার ঐ শ্লোকানুসারেই সেই ব্রহ্মকে 'যদ্ভাসা' না বলিয়া, কেবলমাত্র 'যৎ'ও বলা যায়। তিনি কেবলমাত্র 'যৎ' স্বীকার করিলে, 'ভাসা'টী তাঁহারই স্বীকার করা হয়। আবার উক্ত শ্লোকানুসারেই অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্মের ভাসা বা প্রভায়, সূর্য্য প্রভৃতি ভাস্বর-জ্যোতিষ্কগণও প্রকাশিত রহিয়াছে। কিন্তু যিনি নিজে ঐ সূর্য্য প্রভৃতি ভাস্বর-জ্যোতিষ্কগণ কর্ত্তৃক প্রকাশ পান্ না,—যিনি প্রকাশ থাকায় এই সমস্তই প্রকাশ রহিয়াছে,—তিনিই ব্রহ্ম, ইহাই অবধারণ করিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্ব-প্রকাশক-ব্রহ্মকে সগুণ-সক্রিয়ই বলিতে হয়,—কারণ কোন-কিছু প্রকাশ করাওত ক্রিয়া ও গুণের পরিচায়ক।

চতুঃপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অখণ্ডানন্দরূপস্য তস্যানন্দলবাশ্রিতাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনো ভবাঃ॥"

'অখণ্ডানন্দরূপস্য' বলিলে, যাঁহার অখণ্ডানন্দ-রূপ, ইহাই বুঝিতে হয়। সুতরাং যে ব্রহ্মের অখণ্ডানন্দ-রূপ, তিনি নিশ্চয়ই সাকার। কারণ নানা শাস্ত্রানুসারে বলা হইয়াছে, যাঁহার রূপ আছে, তিনিই সাকার। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্মের অখণ্ডানন্দ-রূপ, সুতরাং ব্রহ্ম সাকার; এবং অখণ্ডানন্দই, সেই ব্রহ্মের রূপ বা আকার। অখণ্ডানন্দ-রূপার্থে, যিনি অখণ্ডানন্দ-রূপও বুঝিতে হয়। ব্রহ্মকে অখণ্ডানন্দ-রূপ বলিলে, ব্রহ্মও রূপ স্বীকার করা হয়। উক্ত শ্লোকানুসারে, ব্রহ্ম অখণ্ডানন্দ-রূপ। অপরোক্ষানুভূতির মতে, ব্রহ্ম সদাকার। উক্ত সপ্তপঞ্চাশৎ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, যাঁহার অখণ্ডানন্দ-রূপ, ব্রহ্মা প্রভৃতি তারতম্যানুসারে,—তাঁহারই অত্যল্প-আনন্দাশ্রিত হইয়া আনন্দী হন্। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্মই অখণ্ডানন্দ-রূপ। ব্রহ্মা প্রভৃতি, সেই অখণ্ডানন্দ-রূপ-ব্রহ্মের অত্যল্প-আনন্দাশ্রিত। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই অখণ্ডানন্দ-রূপ নহেন্; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই অখণ্ডানন্দ-রূপ-ব্রহ্ম নহেন্। তাঁহারা সেই অখণ্ডানন্দ-রূপ-ব্রহ্মের অত্যল্প-আনন্দাশ্রিত। উক্ত শ্লোকানুসারে তাঁহারা সেই অখণ্ডানন্দ-রূপ-ব্রহ্মেরও আশ্রিত নহেন্। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে তাঁহারা অব্রহ্ম, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। অদ্বৈতমতানুসারে অব্রহ্মইত অনাত্মা-বিদ্যা। সুতরাং উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্মা প্রভৃতিকেও অনাত্মা বলিতে হয়। উক্ত শ্লোকানুসারে শঙ্করাচার্য্যের মতে, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলেই এক প্রকার নহেন্। তাঁহারা সকলে এক শ্রেণীরও নহেন্। তাঁহাদের মধ্যেও তারতম্য আছে। সেই তারতম্যানুসারে তাঁহাদের আনন্দ-

সম্ভোগেরও তারতম্য আছে। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক শ্রেণীর আনন্দী নহেন্। সেইজন্যই তাঁহাদের পরস্পরের অদ্বৈততা স্বীকার করা হয় নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে শঙ্করাচার্য্যের সহিত, কথিত ব্রহ্মা প্রভৃতির এবং অখণ্ডরূপ-ব্রহ্মেরও অদ্বৈততা স্বীকার করা যায় না। সেইজন্য বলিতে হয়, উক্ত শ্লোকটীও সম্পূর্ণ দ্বৈতবাচক।

পঞ্চপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"তদ্‌যুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদন্বিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে॥"

'তদ্‌যুক্তমখিলং বস্তু,' অর্থাৎ সেই ব্রহ্মে অখিল-বস্তু-যুক্ত। এস্থলে ব্রহ্মের ন্যায় অখিল-বস্তুরও অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এস্থলে ব্রহ্ম সত্য এবং অখিল-বস্তু মিথ্যা বুঝিবার কোন কারণ নাই। এস্থলে সেই ব্রহ্ম এবং অখিল-বস্তু অভেদ বুঝিবারও কোন কারণ নাই। এস্থলে বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মে অখিল-বস্তু-যুক্ত। অখিল-বস্তু এবং সেই ব্রহ্ম অভেদ স্বীকার করিলে, সেই ব্রহ্মে অখিল-বস্তু-যুক্ত, বলাই যায় না। শঙ্করাচার্য্যের অনেক গ্রন্থের অনেক শ্লোকানুসারে অখিল-বস্তু এবং ব্রহ্ম অভেদ বুঝিতে হয়। তিনি পূর্ব্বোক্ত সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে॥"

'তদ্‌যুক্তমখিলং বস্তু' বলার পরেই বলা হইয়াছে,

'ব্যবহারস্তদন্বিতঃ,' অর্থাৎ ব্যবহারও সেই ব্রহ্মে সম্মিলিত। সেই ব্রহ্মের সহিত ব্যবহারও অন্বিত বা সম্মিলিত বলিয়া, সেই ব্যবহারকেও অসত্য বলা যায় না। কারণ, ব্যবহার কখন ব্রহ্মে অন্বিত থাকে এবং কখন থাকে না, এ কথা বলাত হয় নাই; সুতরাং সেইজন্য ব্রহ্মে অন্বিত-ব্যবহারেরও নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। ঐ প্রকার বলার পরে বলা হইয়াছে, 'তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে।' দুগ্ধে ঘৃত-ব্যাপ্ত সত্য,—কিন্তু ঘৃত, দুগ্ধ ব্যতীত অপর কিছু নহে। দুগ্ধের বিদ্যমানতা-বশতই ঘৃতের বিদ্যমানতা। কিন্তু অখিল-বস্তু এবং ব্যবহারের বিদ্যমানতা-বশত ব্রহ্মের বিদ্যমানতা নহে; বরঞ্চ শঙ্করাচার্য্যের কোন কোন শ্লোকে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের বিদ্যমানতা-বশতই অন্যান্য যে সমস্ত বস্তু আছে, সে সমস্তের বিদ্যমানতা। সেই ব্রহ্ম, অখিল-বস্তু ও ব্যবহার, পরস্পর অভেদ বুঝিবারও কোন কারণ নাই। সেইজন্য ক্ষীরে ব্যাপ্ত-সর্পি বা ঘৃতের সহিত, সেই ব্রহ্মের তুলনাই হইতে পারে না; কারণ উক্ত শ্লোকানুসারে ক্ষীর এবং সর্পি পরস্পর যেমন অভেদ, তদ্রূপ অখিল-বস্তু, ব্যবহার এবং ব্রহ্ম পরস্পর অভেদ নহেন্।

ষট্পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের একষষ্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"স্বয়মন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নিখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নিঃ প্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে, বহ্নি যেমন প্রতপ্ত লৌহ-পিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়া নিজে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ব্রহ্ম নিখিল-জগতের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়া, স্বয়ং প্রকাশ হওত ঐ নিখিল-জগৎকেও প্রকাশ করেন। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম, কেবল নিখিল-জগতেরই অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত। সেইজন্য তাঁহাকে অনন্ত বলা যায় না। কারণ তিনি,—যে নিখিল-জগতের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত, সে জগতেরও সীমা আছে। তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জগৎ অপেক্ষা বৃহৎ নহেন্। সুতরাং তিনি জগৎ যত বড়, তত বড় বলিয়াও, তিনি অনন্ত নহেন্। উক্ত শ্লোকানুসারে সেই ব্রহ্ম ঐ নিখিল-জগতে কখন ব্যাপ্ত হইয়া, আপনি প্রকাশ হওত, ঐ নিখিল-জগৎ প্রকাশিত করেন, বুঝিতে হয় না। উক্ত শ্লোকে সেই ব্রহ্ম, কতকালের জন্য নিখিল-জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া, আপনি প্রকাশ হওত, ঐ নিখিল-জগৎ প্রকাশ করেন? সেই-জন্যই বুঝিতে হয়, নিয়তই ঐ প্রকার ব্যাপ্ত হইয়া, সেই ব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশ করত, ঐ নিখিল-জগৎ প্রকাশ করেন। সুতরাং ব্রহ্মের ন্যায় ঐ নিখিল-জগৎকেও নিত্য-সত্য ও অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। লৌহ প্রতপ্ত না হইলেও, আপনি প্রকাশিত থাকে। অগ্নি দ্বারা প্রতপ্ত হইলেই যে লৌহ প্রকা-শিত হয়, এরূপ বোধ করিবার কোন কারণই নাই। তবে নিখিল-জগৎ সেই ব্রহ্মের প্রকাশে—প্রকাশিত, ইহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে। নিখিল-জগৎ প্রকাশ করেন যে ব্রহ্ম,—তাঁহাকে সগুণ-সক্রিয়ই বলিতে হয়। সেই ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত স্বীকার করিলেও, তাঁহাকে সগুণ-সক্রিয় বলিতে

হয়। উক্ত একষষ্টি শ্লোকানুসারে নিখিল-জগতে ব্রহ্ম চির-ব্যাপ্ত স্বীকার করিলে, নিখিল-জগতেরও নিত্য-সত্যতা স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে নিখিল-জগতের নিত্য-সত্বাও স্বীকার করা হয়। তাহা স্বীকার না করিয়া, যদি মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে তিনি এই নিখিল-জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মের স্পষ্টই সগুণত্ব ও সক্রিয়ত্ব স্বীকার করিতে হয়। উক্ত শ্লোকানুসারে নিখিল-জগৎকে অনিত্য বুঝিবারও কোন অভ্রান্ত কারণ নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে যেমন লৌহ এবং অগ্নি, একই পদার্থ বুঝিবার কোন কারণ নাই; তদ্রূপ নিখিল-জগৎ এবং ব্রহ্ম, একই পদার্থ বুঝিবারও কোন কারণ নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে নিখিল-জগৎ, ব্রহ্ম এবং স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য পরস্পর অভেদ, ইহা বুঝিবারও কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই।

সপ্তপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের দ্বি-ষষ্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
ব্রহ্মান্যদ্ভাসতে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে 'জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম' স্বীকার করিলে, এই আত্মবোধেরই 'আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে,' এই শ্লোকাংশের সহিত অনৈক্য প্রকাশ পায়। 'ব্রহ্মণোঽন্যন্ন কিঞ্চন' স্বীকার করিলে, বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থানুসারে অবিদ্যার অনাদিত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ উক্ত গ্রন্থানুসারে অবিদ্যার অনাদিত্ব স্বীকার করিলে, সেই

অবিদ্যার নিত্য-সত্যত্বও, স্পষ্টই স্বীকার করা হয়। যাহার আদি নাই, তাহা নিশ্চয়ই নিত্য-সত্য। শঙ্করাচার্য্যের বিবেক-চূড়ামণির মতে, অবিদ্যারও ব্রহ্মের ন্যায় আদি নাই। সুতরাং তাহাও ব্রহ্মের ন্যায় অনাদি স্বীকার করিতে হয়। অনাদিই নিত্য-সত্য,—তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সুতরাং কেবল 'ব্রহ্মণোঽন্যন্ন কিঞ্চন,' কি প্রকারেই বা বলা যায়? শঙ্করাচার্য্যের মতে নিত্য-সত্য-অনাত্মা-বিদ্যাও রহিয়াছেন। সুতরাং ঐ শঙ্করাচার্য্যেরই মতানুসারে, ব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য কিছুই নাই বলা যায় না। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যেরই বিবেক-চূড়ামণির মতানুসারে 'ব্রহ্মান্যদ্ভাসতে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা'ও বলা যায় না।

অষ্টপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রি-ষষ্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"দৃশ্যতে শ্রূয়তে যত্তদ্ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে যাহা দর্শন করা যায়, তাহাকে যদি ব্রহ্ম বলিতে হয়, তাহা হইলে শ্রুতি-বেদান্তানুসারে নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মকেও অনাত্মা বলিতে হয়; কারণ অনেক প্রকার পদার্থই দর্শন করা হইয়া থাকে। শ্রুতি, বেদান্ত এবং অন্যান্য অদ্বৈত-মতের গ্রন্থানুসারে যাহা দর্শন করা যায়, তাহাই অনাত্মা। যাহা দর্শন করা যায়, তাহা অনেক শাস্ত্রমতে এবং অনেক অদ্বৈতবাদীর মতেই জড়। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম, দৃশ্য

স্বীকার করা হইয়াছে। সেইজন্য অবশ্যই ব্রহ্মও আকার, প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে। বেদান্তানুসারে আকারের নিত্যতা স্বীকার করা হয় নাই। এই আত্মবোধানুসারেই যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহাকেও ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, সেই ব্রহ্মকে অনাত্মাই বলিতে হয়। কারণ যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহাকে কোন শাস্ত্রেই আত্মা-ব্রহ্ম বলা হয় নাই। বিশেষত অদ্বৈতমতানুসারে তাহা অনাত্মাই বটে। কেবল এক প্রকার কিছুইত শ্রবণ করা হয় না, কত প্রকার কত কি শ্রবণ করা হয়। অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের বহুত্ব এবং বহু-প্রকারতা নাই। সুতরাং সেই ব্রহ্মকে নানাপ্রকারে শ্রোতব্যও বলা যায় না। যাহা দর্শন করা যায় ও যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহা ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না স্বীকার করিতে হইলে, বিবেক-চূড়ামণি-কথিত সেই অনাদ্যা-বিদ্যাকেও ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাহা দর্শন করা যায়, তাহা ব্রহ্ম,—যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহা ব্রহ্ম স্বীকার করিলে, ব্রহ্মকে অনাত্মাই স্বীকার করা হয়। কারণ শ্রুতি-বেদান্ত প্রভৃতি মতে, দৃশ্য সকল এবং শ্রোতব্য সকলও, সেই একই অবিদ্যার নানাপ্রকার বিকাশ। উক্ত ত্রি-ষষ্টি শ্লোকের শেষ চরণে বলা হইয়াছে, 'তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-মদ্বয়ম্।' তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাও কি, যাহা দর্শন করা হয় ও যাহা শ্রবণ করা হয়, তাহাকে অদ্বিতীয়-সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে? আমাদের মতে তাহা কথনই পারা যায় না; তাহা যদি পারা যাইত, তাহা হইলে শ্রুতি-বেদান্তে, অনাত্মাকেও আত্মা বলিয়া স্বীকার করা হইত। শ্রুতি-বেদান্তের

মতেই, আত্মা এবং অনাত্মা অভেদ নহে। কেহ যদি,—যাহা দর্শন করা যায় তাহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহা হইলে বেদান্তমতে অবশ্যই সেই ব্যক্তির সেইটী ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হয়। কিন্তু তাঁহার ঐ প্রকার ভ্রমকে, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় বলা হইবে না। কেহ যদি,—যাহা শ্রবণ করা যায় তাহাকেও ব্রহ্ম বলেন, তাহা হইলে অবশ্যই বেদান্তমতে সেইটী সেই ব্যক্তির ভ্রমই বলিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার ঐ প্রকার ভ্রমকে, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় বলা হইবে না। নিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞান যাহা, তাহার সহিত ভ্রান্তিব কোন সংস্রবই নাই। তত্ত্বজ্ঞানের সহিত অভ্রান্তিরই সম্বন্ধ। অভ্রান্তিই সত্য,—ভ্রান্তিই মিথ্যা। যাহা দর্শন করা যায়, তাহা শ্রবণ করা যায় না;—যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহাও দর্শন করা যায় না;—সুতরাং দ্রষ্টব্য এবং শ্রোতব্য একই প্রকার নহে। শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত ত্রি-ষষ্টি শ্লোক স্বীকার করিলে, ব্রহ্মকে দ্রষ্টব্যও বলিতে হয়. শ্রোতব্যও বলিতে হয়; সুতরাং ব্রহ্মকে অনাত্মাই বলিতে হয়। কারণ আত্মা-ব্রহ্মের দ্বি-প্রকারতা অথবা বহু-প্রকারতা নাই। কেবল অনাত্মারই দ্বি-প্রকারতা এবং বহু-প্রকারতা আছে। ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলিলেও, তাঁহাকে অদ্বিতীয় বা অদ্বয় বলা যায় না। কারণ সচ্চিদানন্দ শব্দও যেমন তিনটী শব্দের সমষ্টি, তদ্রূপ সৎ যাহা,—চিৎ এবং আনন্দ তাহা নহে। ঐ তিন, তিন প্রকার। সুতরাং ঐ তিন ব্রহ্ম বলিলেও, তাঁহাকে অদ্বিতীয় বা অদ্বয় বলা যায় না। যিনি 'কেবল,'—যিনি একই প্রকার,—তিনিই অদ্বিতীয়। তাঁহাকেই অদ্বয়-ব্রহ্ম-একাত্মা বলা হয়।

একোনষষ্টি সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুঃষষ্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষু র্নিরীক্ষ্যতে।
অজ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বতং ভানুমন্ধবৎ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে সচ্চিদাত্মা, 'সর্ব্বগ' স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে সগুণ-সক্রিয়াই বলিতে হয়। 'সর্ব্বগ' যিনি, তাঁহাকে নিশ্চয়ই নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। 'সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং' বলার পর, 'জ্ঞানচক্ষু র্নিরীক্ষ্যতে' বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা ক্রিয়া হয় না, বলা যায় না। কারণ নিরীক্ষণ করাও ক্রিয়া; অতএব জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই বলা, অতি অসঙ্গত। শঙ্করাচার্য্যের মতে জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে স্বীকার করিলে, এবং তাঁহার মতানুসারে জ্ঞান-চক্ষু হইতে দৃষ্টি-ক্রিয়া বিকশিত হয় স্বীকার করিলে, জ্ঞানের নিষ্ক্রিয়ত্ব ও নির্গুণত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ নিরীক্ষণ করাও গুণ-কর্ম্মের পরিচায়ক। সেইজন্যই, যে জ্ঞান হইতে গুণ-কর্ম্ম বিকাশিত হয়, তাহাকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত চতুঃষষ্টি শ্লোকের প্রথম চরণে জ্ঞান-চক্ষু বলিয়া, দ্বিতীয় চরণে অজ্ঞান-চক্ষুও বলিয়াছেন। তবে কি তাঁহার মতে জ্ঞান ও অজ্ঞান অভেদ? তবে কি তাঁহার মতে জ্ঞান ও অজ্ঞান একই পদার্থ? চক্ষু দ্বারা দর্শনই করা যায়, কিন্তু চক্ষু দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টা এবং যাহা দ্বারা দর্শন করা যায়, উভয়ে অভেদও বলা যায় না।

দ্রষ্টাত্মার সহিত জ্ঞান-চক্ষুর অভেদত্বও স্বীকার করা যায় না। সুতরাং জ্ঞান-চক্ষুকে অনাত্মাই বলিতে হয়। কারণ আত্মা যাহা নহে, তাহা নিশ্চয়ই অনাত্মা।

ষষ্টি সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চষষ্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"শ্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তো জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ।
জীবঃ সর্ব্বমলান্মুক্তঃ স্বর্ণবৎ দ্যোততে স্বয়ম্॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে শ্রবণ-মনন প্রভৃতি দ্বারা যে জ্ঞানাগ্নি উদ্দীপ্ত হয়,—নিশ্চয়ই তাহা হ্রাস-বৃদ্ধি-শূন্য নহে, নিশ্চয়ই তাহা অপরিবর্ত্তনীয় নহে, নিশ্চয়ই তাহা অটল নহে এবং নিশ্চয়ই কেবল তাহার এক-প্রকারতাই আছে বলা যায় না; সুতরাং সেইজন্যই তাঁহাকে আত্মা বলিতে পারা যায় না। শঙ্করাচার্য্যেরই মতে, জ্ঞানকে নিত্য-সত্যও বলা যায় না। তাঁহার মতে জ্ঞানও যে নশ্বর, তাহা তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তদর্শনের দ্বিতীয় ভাগে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সেই শঙ্করাচার্য্যেরই মতে, জ্ঞানকে অনাত্মা না বলিয়া অপর কি বলা যাইতে পারে? উক্ত পঞ্চষষ্টি শ্লোকানুসারে,—

"শ্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তো জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ।
জীবঃ সর্ব্বমলান্মুক্তঃ স্বর্ণবৎ দ্যোততে স্বয়ম্॥"

স্বীকার করিলে, 'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব

নাপরঃ' বলা সঙ্গত হয় না। কারণ 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' বলায়, জীবও নিত্য, সত্য, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল এবং শুদ্ধ, স্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকাংশে ব্রহ্ম এবং জীব অভেদ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে বলিয়াই, জীব কখন মলিন হন্ ও জীব কখন সবিকার হন্, তাহাও স্বীকার করা উচিত হয় না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত পঞ্চষষ্টি শ্লোকানুসারে শ্রবণ-মনন প্রভৃতি দ্বারা উদ্দীপ্ত-জ্ঞানাগ্নি-পরিতাপিত বা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা পরিশোধিত জীবই, সর্ব্বপ্রকার মালিন্য-মুক্ত বুঝিতে হয়। কিন্তু জীব, শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানাগ্নি-পরিতাপিত না হইলে, তাহার সর্ব্ব-মালিন্য বিরহিত হয়, বুঝিবার কোন সন্তোষ-জনক হেতু নাই। সেইজন্যই জীব, শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানাগ্নি-পরিতাপিত বা পরিশোধিত হইবার পূর্ব্বে, সর্ব্ব-মালিন্য-বিশিষ্টই থাকেন, বুঝিতে হইবে। সুতরাং নিত্য-নির্ব্বিকার, নিত্য-নিরঞ্জন ও নিত্য-শুদ্ধ-ব্রহ্মের সহিত জীবের কি প্রকারেই বা, অভেদত্ব বা ঐক্য স্বীকার করা যাইতে পারে? কোন শাস্ত্রেইত ব্রহ্মকে, কখন সবিকার এবং কখন নির্ব্বিকার, কখন অঞ্জন-বিশিষ্ট এবং কখন নিরঞ্জন ও কখন অশুদ্ধ এবং কখন বা শুদ্ধত বলা হয় নাই। অতএব 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' স্বীকার করিয়া কি প্রকারেই বা, ব্রহ্মও যাহা, জীবও তাহা বলা যাইতে পারে? জীবত্বই মালিন্য,—ইহাইত সর্ব্ব-শাস্ত্রের মত। আর আত্মজ্ঞান-প্রভাবে জীবত্ব নষ্ট হইলে, জীবেরও অস্তিত্ব থাকে না। মলিন-জীব বিনষ্ট হইলে, কেবল নিরঞ্জন-শুদ্ধাত্মাই বিদ্যমান থাকেন্। উক্ত শ্লোকে সর্ব্ব-মালিন্য-বিরহিত-স্বর্ণের সহিতই, শ্রবণ প্রভৃতি

দ্বারা উদ্দীপ্ত-জ্ঞানাগ্নি-পরিতাপিত বা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা পরিশোধিত জীবের তুলনা করা হইয়াছে। যেমন সর্ব্ব-মালিন্য-বিরহিত-স্বর্ণের সহিত উক্ত জীবের তুলনা করা হইয়াছে, তদ্রূপ সে স্বর্ণও অবশ্য সর্ব্ব-মালিন্য-বিরহিত হইবার পূর্ব্বে, সর্ব্ব-মালিন্য-বিশিষ্টই ছিল। সুতরাং ঐ প্রকার স্বর্ণের সহিত কথিত-জীবের তুলনা করায়ও, জীব, নিত্য-নির্ব্বিকার, নিত্য-নিরঞ্জন, নিত্য-নির্ম্মল ও নিত্য-শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। জীব যে মহা-মলিন,—জীব যে বিষম-বিকার-বিশিষ্ট,—তাহা কোন্ বুদ্ধিমান না বুঝিতেছেন ?

একষষ্টি সিদ্ধান্ত।

আত্মবোধ গ্রন্থের ষট্ষষ্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"হৃদাকাশোদিতো হ্যাত্মা বোধভানুস্তমোঽপহৃৎ।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বধারী ভাতি সর্ব্বং প্রকাশতে॥"

আকাশ যত বড়, তাহাতে উদিত ভানু,—তত বড় নহে। আকাশ অপেক্ষা আকাশোদিত ভানু, অনেক ছোট। সুতরাং হৃদাকাশ অপেক্ষা তাহাতে উদিত-আত্মা বা বোধ-ভানুও ছোট। তবে সেই আত্মা বা বোধ-ভানুকে সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বধারী কি প্রকারে বলা হয় ? শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই, তাহা যে হৃদয়ের, সর্ব্ব-স্থানেও ব্যাপ্ত নহে। সুতরাং তাহা শরীরেরও সর্ব্ব-স্থানে ব্যাপ্ত নহে বলা যাইতে পারে। আর আত্মাই বোধ-ভানু স্বীকার করিলে, সেই আত্মাকে বোধ-কর্ত্তাই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? যেমন দ্রষ্টা

আর দৃষ্টি অভেদ নয়, তদ্রূপ বোধ-কর্ত্তা আর বোধও অভেদ নয় বলা যাইতে পারে। আত্মাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে বোধ-ভানু বলা যাইতে পারে না। কারণ উক্ত শ্লোকানুসারেই বোধ-ভানু সগুণ-সক্রিয়। কারণ বোধ-ভানুই তম অপহরণ করেন। তম অপহরণ করাও কার্য্য। কোন প্রকার কার্য্য যাঁহা দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাঁহাকে অবশ্যই সগুণ সক্রিয় বলিতে হয়। ভানু উদয়ের স্থান, আকাশ। ভানু আকাশ ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই উদিত হন্ না। আকাশে যে ভানু উদিত হন্, কেবল সেই 'ভানুই' সত্য বলা হয় নাই ;— ভানুও সত্য এবং ভানু যেখানে উদিত হন্, সে স্থানও অবশ্যই সত্য। বোধ-ভানু হৃদাকাশে উদিত হন্, বলা হইয়াছে। সেইজন্য কেবল আত্মা বা বোধ-ভানুকেই সত্য বলিতে পার না। সেই ভানু যে হৃদাকাশে উদিত হন্, সে হৃদাকাশও সত্য ; কারণ হৃদাকাশ ব্যতীত, স্বয়ং আত্মা বা বোধ-ভানু উদিত হন্, বলা হয় নাই। তদ্ব্যতীত উক্ত শ্লোকে হৃদাকাশকে অসত্য বলা হয় নাই। উক্ত শ্লোকেও দ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ শঙ্করাচার্য্যের সহিত আত্মা বা বোধ-ভানু অভেদ, উক্ত শ্লোকেও বলা হয় নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বধারী এবং তিনি সর্ব্ব প্রকাশ করেন; সুতরাং সর্ব্বের অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত ষট্‌ষষ্টি শ্লোকে সর্ব্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে তিনি সর্ব্বকে অসত্য বলেন নাই বলিয়া, সর্ব্বও সত্য স্বীকার করিতে হয়। উক্ত শ্লোকে তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলায়

তাঁহার এক প্রকার সীমা নির্দ্দেশ করিয়াই দেওয়া হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অনেক গ্রন্থের অনেক স্থলেই আত্মাকে সর্ব্ব বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত ষট্‌ষষ্টি শ্লোকানুসারে, সেই আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? যাহাতে ব্যাপ্ত ও যিনি ব্যাপ্ত বা ব্যাপী, উভয়ে কখনই অভেদ নহেন্। সুতরাং আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী বলায়, সর্ব্বের সহিত সেই সর্ব্বব্যাপী-আত্মার অভেদত্ব, ঐক্য বা অদ্বৈততা স্বীকার করা যায় না। আত্মাকে উক্ত শ্লোকেই সর্ব্বধারী বলা হইয়াছে। সর্ব্বধারী ও সর্ব্ব অভেদ, স্বীকারই করা যায় না। সুতরাং সর্ব্ব ও সর্ব্বব্যাপী, এবং সর্ব্ব ও সর্ব্বধারী, পরস্পর অভেদ নহে। উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা প্রকাশ করেন। যিনি প্রকাশ করেন এবং যাহা প্রকাশ করা হয়, উভয়ে কখনই অভেদ নহে। অতএব সেইজন্যও সর্ব্বের সহিত আত্মা বা বোধ-ভানুর অভেদত্ব, ঐক্য বা অদ্বৈততা নাই।

দ্বি-ষষ্টি সিদ্ধান্ত।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আত্মবোধ নামক গ্রন্থের সপ্তষষ্টি বা শেষ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"দিগ্‌দেশকালাদ্যনপেক্ষসর্ব্বগং শীতাদিহৃন্নিত্যসুখং নিরঞ্জনম্।
যঃ স্বাত্মতীর্থং ভজতে বিনিষ্ক্রিয়ঃ স সর্ব্ববিৎসর্ব্বগতোঽমৃতো ভবেৎ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে 'যঃ' আর শঙ্করাচার্য্য, অভেদ বুঝিবার

কোন কারণ নাই। কারণ, উক্ত শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং এবং শ্লোকোক্ত যিনি, পরস্পর যে অভেদ, তাহা প্রতিপন্ন করা হয় নাই। উক্ত শ্লোকীয় 'যঃ,'—'সর্ব্বগং।' সুতরাং 'যঃ'কে বিনিষ্ক্রিয় বলা উচিত নয়; কারণ 'সর্ব্বগং' অর্থে, সর্ব্বগামী। সর্ব্বগামী যিনি, তাঁহাকে কি প্রকারে বিনিষ্ক্রিয় বা ক্রিয়াবিহীন বলা যাইতে পারে? 'সর্ব্বগ' বা সর্ব্বগামী যিনি, তাঁহাকে সগুণ-সক্রিয় বলাই উচিত। উক্ত শ্লোকানুসারে যিনি দিগ্দেশ-কাল প্রভৃতির অপেক্ষা করেন না, সর্ব্বগামী-শীত প্রভৃতি-হারী, নিত্য-সুখ, নিরঞ্জন এবং নিজ আত্ম-তীর্থ ভজনা করেন, তিনিই সর্ব্ব-বিৎ, সর্ব্ব-গত এবং অমৃত হন্। উক্ত শ্লোকানুসারে যিনি স্বাত্ম-তীর্থ ভজনা করেন, তাঁহার অবশ্যই অদ্বৈত-জ্ঞান নাই। অদ্বৈতজ্ঞান স্ফূরিত হইলে, আর ভজনা করিতে হয় না। ভজনা,—দ্বৈতবোধবশতই করা হইয়া থাকে। ভক্তি-প্রতিপাদক নানাশাস্ত্রানুসারে ভক্তি-ভাবে ভজনা করাই প্রসিদ্ধ। উক্ত শ্লোকে স্বাত্ম-তীর্থ-ভজনার উল্লেখ আছে। সেইজন্য ঐ স্বাত্ম-তীর্থ-ভজনার সঙ্গে ভক্তিরও সংস্রব আছে বলিতে হইবে। যে হেতু, ভক্তি ব্যতীত ভজনায় প্রবৃত্তিই হয় না। যাঁহার ভজনায় প্রবৃত্তি আছে অথবা যিনি ভজনা-শীল, তাঁহার ভক্তির সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ। পরমহংস শঙ্করা-চার্য্যের মতেও ভক্তি উপেক্ষার সামগ্রী নহে। তিনি তাঁহার বিবেক-চূড়ামণি নামক গ্রন্থেও ভক্তির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে 'মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব-গরিয়সী।' শঙ্করাচার্য্যের গুরুদেব-প্রণীত 'অদ্বৈতানুভূতি' গ্রন্থেও ভক্তি-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা এই প্রকার,—

"স্বর্গস্থিতিপ্রলয়হেতুমচিন্ত্যশক্তিং
বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিং।
নির্ম্মুক্তবন্ধনমপারসুখাম্বুরাশিং
শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি॥ ১॥

ভক্তি-ভাববশতই প্রণাম করা হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্যের গুরুদেবও বিশ্বেশ্বর-শ্রীবল্লভকে প্রণাম করিয়াছিলেন। অতএব নিশ্চয় তাঁহারও ভক্তি-ভাব ছিল। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের শেষ শ্লোকেও ভক্তি-বিষয়িনী কথা আছে। উক্ত শেষ শ্লোক এই প্রকার—

"পরিপক্কং মনো যেষাং কেবলোঽয়ঞ্চ সিদ্ধিদঃ।
গুরুদৈবতভক্তানাং সর্ব্বেষাং সুলভো ভবেৎ॥১৪৪॥"

উক্ত শ্লোকে যেমন গুরুদৈবত-ভক্তগণের বিষয় কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ মণিরত্নমালা নামক গ্রন্থেও গুরুভক্ত-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে,—'শিষ্যস্তু কো যো গুরুভক্ত এব।' উক্ত গ্রন্থের সপ্তদশ শ্লোকেও ভক্তি-সম্বন্ধিনী প্রসঙ্গ আছে, তাহা এই প্রকার—

"মুমুক্ষুণা কিং ত্বরিতন্বিধেয়ং,
সৎসঙ্গতি নির্ম্মমতেশভক্তিঃ॥"

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত।

সিদ্ধান্তদর্শন।

চতুর্থ ভাগ।

অষ্টাবক্র-সংহিতোক্ত প্রথম-প্রকরণ সম্বন্ধে মত।

প্রথম সিদ্ধান্ত।

উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতৎ ত্বং ব্রূহি মে প্রভো॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে রাজর্ষি-জনকের প্রভু, অষ্টাবক্র। উক্ত শ্লোকানুসারে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়, অষ্টাবক্রের প্রতি জনকের দাস্য-ভাব ছিল। দাস্য-ভাব, দ্বৈতবোধক। দাস্য-ভাব ভক্তিবশতই স্ফূরিত হইয়া থাকে। জনকের দাস্য-ভাব ছিল। সেইজন্য তিনি, অবশ্যই ভক্ত ছিলেন স্বীকার করিতে হয়। আপনাকে দাস-বোধ করিয়া অন্যকে প্রভু যিনি বোধ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দ্বৈতবাদী। জনকের জ্ঞান, মুক্তি এবং বৈরাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেইজন্যই তিনি অষ্টাবক্রকে ঐ তিন লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐ তিন যদ্যপি রাজর্ষি-জনকের মধ্যে নিয়ত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার ঐ তিন লাভের প্রয়োজন হইত না,—তাহ

হইলে ঐ তিন, তাঁহাতে স্ফূরিত হইবারই প্রয়োজন হইত। সেইজন্য ঐ তিন জনকের মধ্যে ছিল, বলা যায় না। জনক নিজে ঐ তিন ছিলেন না। তাহা হইলে জনকের ঐ তিনে প্রয়োজন হইত না। ঐ তিন, তিন প্রকার। জনক, একই প্রকার। অদ্বৈতমতানুসারে জনক, আত্মা। আত্মা যাহা,—তাঁহার বহু-প্রকারতা অদ্বৈতবাদীরা স্বীকার করেন না।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় শ্লোকে জনকের প্রতি অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক বলা হইয়াছে,—

"মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত ! বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ভজ॥"

অষ্টাবক্রের মতে মুক্তিলাভেচ্ছা করিলে, বিষয় সকল বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হয়। মুক্তি, আত্মা নহে। মুক্তিকে আত্মা, কোন শাস্ত্রেই বলা হয় নাই। মুক্তিও অনাত্মা, বিষয় সকলও অনাত্মা। অষ্টাবক্রের বিবেচনায়, জনকের পক্ষে অনাত্মা-বিষয় সকল পরিত্যজ্য এবং অনাত্মা মুক্তিলাভের প্রয়োজন হইয়াছিল। মুক্তিও অনাত্মা। সেইজন্য উহাও আত্মজ্ঞানীর পক্ষে প্রলোভনের সামগ্রী নহে। অদ্বৈতমতে আত্মজ্ঞানীই আত্মা। আত্মা, নিত্য;—সেইজন্য আত্মজ্ঞানীও নিত্য। অতঃ এব সেইজন্য আত্মার বন্ধন স্বীকার করা যায় না। আত্মার বন্ধন স্বীকার করা যায় না বলিয়া, নিত্যাত্মজ্ঞানী-আত্মার মুক্তির প্রয়োজন হয় না। সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার ক্ষমা,

আর্জব, দয়া, সন্তোষ ও সত্যের প্রয়োজন হয় না। ঐ সকলও আত্মা নহে। সেইজন্য ঐ সকলও অদ্বৈতমতানুসারে অনাত্মার কয়েক প্রকার বিকাশ। সুতরাং অবদ্ধ-অমুমুক্ষু-আত্মার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই। উক্ত প্রকার আত্মা ব্যতীত, অন্যের ঐ সকলে প্রয়োজন হইলেও হইতে পারে। জনকও অনাত্মা যদ্যপি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জনকের ঐ সকলে প্রয়োজন হইয়া থাকিতে পারে। আত্মা, নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত। সেইজন্য তাঁহার ক্ষমা, আর্জব, দয়া, সন্তোষ ও সত্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই,—অবদ্ধ-নির্লিপ্ত-আত্মার মুক্তির কারণ, ঐ সকলে প্রয়োজনই নাই। সেইজন্য তাঁহার ঐ সকলের ভজনাও করিতে হয় না। অষ্টাবক্র, জনককে ঐ সকল ভজনা করিতে বলিয়াছেন। ভজনা,—দ্বৈতজ্ঞানাত্মিকা। বৈষ্ণবমতে শ্রদ্ধা, ভক্তি অথবা প্রেমাত্মক কোন ভাব দ্বারা ভগবানের ভজনা করিতে হয়। ভজনা,—অদ্বৈতজ্ঞানাত্মিকা নহে।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণের দ্বিতীয় শ্লোক মতে বিষবৎ-বিষয় সকল পরিত্যাগে, ক্ষমা, আর্জব, দয়া, সন্তোষ ও সত্য ভজনা করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্যান্য অনেক যোগীর মতেই ক্ষমা, আর্জব, দয়া ও সত্য প্রথম-যোগাঙ্গ-যমের অন্তর্গত। অষ্টাঙ্গ-যোগের একাঙ্গ, যম। সেই যমের দশ প্রকার বিকাশ। সেই দশ প্রকার বিকাশের

অন্তর্গতই ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া ও সত্য। অতএব সেইজন্য অষ্টাবক্র, রাজর্ষি-জনককে যোগাভ্যাস করিতেই বলিয়াছিলেন, প্রমাণিত হইয়াছে। সেইজন্য অষ্টাবক্রের, যোগ অনভিমত ছিলও বলা যায় না। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবং।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচন্ত্বেতে যমা দশ॥"

প্রথম-যোগাঙ্গ-যমের দশ প্রকার বিকাশের মধ্যে অহিংসাই প্রথম-বিকাশ। অহিংসা নানাপ্রকারে আচরিত হইতে পারে। কর্ম্ম দ্বারা অহিংসা করা যাইতে পারে, মন দ্বারা অহিংসা করা যাইতে পারে ও বাক্য দ্বারা অহিংসা করা যাইতে পারে। ঐ বিষয়ে মহাত্মনী-গার্গীর প্রতি মহাত্মা-যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন,—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসাত্বেন যোগিভিঃ॥৫১॥"

যমের দ্বিতীয়-বিকাশ, সত্য। যে সত্য-বাক্য দ্বারা কোন জীবের অনিষ্ট হয় না, তাহাই সত্য। সত্য-সম্বন্ধে যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যের মত,—

"সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণং॥৫৩॥"

যমের তৃতীয়-বিকাশ, অস্তেয়। অস্তেয়-সম্বন্ধে যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যের মত,—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা পরদ্রব্যেষু নিঃস্পৃহা।
অস্তেয়মিতি সংপ্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥৫৪॥"

প্রকৃত অস্তেয়ী-যোগী কর্ম্ম দ্বারা পর-দ্রব্য গ্রহণেচ্ছা করেন না, মন দ্বারা পর-দ্রব্য গ্রহণেচ্ছা করেন না এবং বাক্য দ্বারা পর-দ্রব্য গ্রহনেচ্ছা প্রকাশ কবেন না। যমের চতুর্থ-বিকাশ, ব্রহ্মচর্য্য। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক ব্রহ্মচর্য্য-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে ॥৫৫॥"

সর্ব্বদা, সর্ব্বত্রে ও সর্ব্বাবস্থাতে মন, বাক্য এবং কর্ম্ম দ্বারা মৈথুন-ত্যাগই ব্রহ্মচর্য্য। সিদ্ধ-ব্রহ্মচারীর মনেও মৈথুনেচ্ছা হয় না, তিনি বাক্য দ্বারাও মৈথুনেচ্ছা প্রকাশ করেন না, কর্ম্ম দ্বারাও তাঁহা কর্তৃক মৈথুন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। যমের পঞ্চম-বিকাশ, দয়া। প্রথমত দয়া-বৃত্তির উদয় মনে হইয়া থাকে। সেই উদয় হইতে দয়া করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। দয়া কবিবার ইচ্ছা হইলে, তাহা বাক্য অথবা কর্ম্ম দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে। প্রসিদ্ধ যোগিশ্রেষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্য দয়া-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"দয়া ভূতেষু সর্ব্বেষু সর্ব্বত্রানুগ্রহস্পৃহা।
বিহিতেষু তদন্যেষু মনোবাক্কায়কর্ম্মণা ॥ ৬৩ ॥"

যমের ষষ্ঠ-বিকাশ, আর্জব। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-সম্বন্ধে এক-প্রকার ভাবই আর্জব। প্রকৃত আর্জব-সম্পন্ন-যোগি-ব্যক্তি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, উভয়কেই প্রাকৃত জানেন। সেইজন্য তিনি উভয়কেই সম-বোধ করেন। ঐ উভয়ই প্রাকৃত বলিয়া, তিনি ঐ উভয়েতেই সম-ভাবে রত নহেন, এবং তিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, উভয়েতেই লিপ্ত নহেন্। আর্জব-সম্বন্ধে মহাত্মা-যাজ্ঞবল্ক্যের মত,—

"প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা একরূপত্বমার্জ্জবং।".

যমের সপ্তম-বিকাশ, ক্ষমা। যে বৃত্তি-প্রভাবে দোষীর দোষ গ্রহণ করা না হয়, তাহাই ক্ষমা। ক্ষমাশীল-সম্বন্ধে প্রিয়াপ্রিয় সমান। ক্ষমার সহিত দয়ার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ। যাঁহার ক্ষমা আছে, তাঁহারই দয়া আছে। দয়া-শূন্য, ক্ষমাশীল নহেন্। ক্ষমা-সম্বন্ধে মহাত্মা-যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছিলেন,—

"প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্ব্বেষু সমত্বং যচ্ছরীরিণাং।
ক্ষমা সৈবেতি বিদ্বদ্ভির্গদিতা বেদবাদিভিঃ॥৬৪॥"

যমের অষ্টম-বিকাশ, ধৃতি। যে বৃত্তি স্ফুরিত রহিলে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুগণের বিয়োগে, শোকে এবং দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না, যে বৃত্তি স্ফুরিত রহিলে সম্পূর্ণ অর্থ-হানি ও সম্ভ্রম-হানি হইলেও মন বিচলিত হয় না, সর্ব্বাধিপত্য পাইলেও লাভ-বোধ হয় না,—আনন্দ-বোধ হয় না, যে বৃত্তি স্ফুরিত রহিলে কোন সুবৃত্তি কিম্বা কোন কুবৃত্তি আত্মার উপর আধিপত্য করিতে পারে না, তাহাই ধৃতি। সেই ধৃতির সঙ্গে ধৈর্য্য এবং স্থৈর্য্যের বিশেষ-সম্বন্ধ। ধৃতি-সম্বন্ধে মহাত্মা-যাজ্ঞবল্ক্যের মত,—

"অর্থহানৌ চ বন্ধূনাং বিয়োগে চাপি সম্পদি।
ভূয়ঃ প্রাপ্তৌ চ সর্ব্বত্র চিত্তস্য স্থাপনং ধৃতিঃ॥৬৫॥"

যমের নবম-বিকাশ, মিতাহার। মিতাহার-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সে সম্বন্ধে যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যের মত এই প্রকার—

"অষ্টৌ গ্রাসা মুনের্ভক্ষ্যাঃ ষোড়শারণ্যবাসিনাং॥৬৬॥

দ্বাত্রিংশদ্ধি গৃহস্থস্য যথেষ্টং ব্রহ্মচারিণাং।
তেষাময়ং মিতাহারস্ত্বন্যেষামল্পভোজনং ॥৬৭॥”

যমের দশম-বিকাশ বা শেষ-বিকাশ, শৌচ। শৌচই শুদ্ধি। শৌচ বা শুদ্ধি বহুবিধ। সেই সকলের মধ্যে দুই প্রকারই প্রধান,—বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি। দেহ শুদ্ধ করিতে হইলে, বহিঃশুদ্ধির প্রয়োজন হইয়া থাকে। মলমূত্র-বমনোচ্ছিষ্ট প্রভৃতি বর্জিত-মৃত্তিকা ও জল দ্বারা দেহ-শুদ্ধি হইতে পারে। অন্তর বা অভ্যন্তর শুদ্ধ করিতে হইলে, ঐ সকল দ্বারা শুদ্ধ হয় না। অন্তর শুদ্ধ করিবার জন্য জ্ঞানই প্রধান অবলম্বন। প্রধানত তিন প্রকার অন্তঃশুদ্ধি। চিত্ত-শুদ্ধি, বুদ্ধি-শুদ্ধি এবং আত্ম-শুদ্ধি। শুদ্ধি বা শৌচ-সম্বন্ধে যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,—

“শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনঃশুদ্ধিস্তথান্তরং ॥৬৮॥
মনঃশুদ্ধিশ্চ বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মেণাধ্যাত্মবিদ্যয়া।
অধ্যাত্মবিদ্যা ধর্ম্মশ্চ পিত্রাচার্য্যেণ চানঘে ॥৬৯॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু সর্ব্বৈর্নিঃশ্রেয়সার্থিভিঃ।
গুরবঃ শ্রুতিসম্পন্না মান্যা বাঙ্মনসাদিভিঃ ॥৭০॥”

চতুর্থ সিদ্ধান্ত।

মহাত্মা-অষ্টাবক্র দ্বিতীয় শ্লোকে রাজর্ষি-জনককে প্রথম-যোগাঙ্গ-যম-সম্বন্ধীয় কয়েকটী অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন।

তিনি উক্ত রাজর্ষিকে দ্বিতীয়-যোগাঙ্গ-নিয়ম-সম্বন্ধে কেবল মাত্র তোষ বা সন্তোষকেই অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। অনেক যোগ-শাস্ত্রেই নিয়মের উল্লেখ আছে। মুমুক্ষু-ব্যক্তি-দিগের পক্ষে অনেকেরই মতে, নিয়ম বিশেষ প্রয়োজনীয়। অষ্টাবক্রও জনককে নিয়মের একটী অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছিলেন। সম্যক্-নিয়ম কি প্রকার, তাহা অনেকের জানিবার অভিলাষ হইতে পারে। সেইজন্য সম্যক্-নিয়মই এই স্থানে বিবৃত হইবে। যে যোগ-বল দ্বারা মনোবুদ্ধি সংযত রহে, তাহাই নিয়ম। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিয়ম-সম্বন্ধে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—

"তপঃ সন্তোষমাস্তিক্যং দানমীশ্বরপূজনং।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো হুতং।
এতে চ নিয়মাঃ প্রোক্তাস্তাংশ্চ সর্ব্বান্ পৃথক্ শৃণু ॥১॥
বিধিনোক্তেন মার্গেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শরীরশোষণং প্রাহুস্তপসাং তপ উত্তমং ॥২॥
যদৃচ্ছালাভতো নিত্যং মনঃ পুংসো ভবেদিতি ॥৩॥
যা ধীস্তামৃষয়ঃ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখলক্ষণং।
ধর্ম্মাধর্ম্মেষু বিশ্বাসো যস্তদাস্তিক্যমুচ্যতে ॥৪॥
ন্যায়ার্জ্জিতং ধনঞ্চান্নমন্যদ্বা যৎ প্রদীয়তে।
অর্থিভ্যঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তং দানমেতদুদাহৃতং ॥৫॥
যঃ প্রসন্নস্বভাবেন বিষ্ণুং বা রুদ্রমেব চ।
যথাশক্ত্যার্চ্চনং ভক্ত্যা এতদীশ্বরপূজনং ॥৬॥

রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং বাগদুষ্টানৃতাদিভিঃ।
হিংসাদিরহিতঃ কায় এতদীশ্বরপূজনং ॥৭॥
সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং বেদান্তশ্রবণং বুধৈঃ।
দ্বিজবৎ ক্ষত্রিয়স্যোক্তং সিদ্ধান্তশ্রবণং বুধৈঃ ॥৮॥
বিশাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি শীলবৃত্তমতাং সতাং।
শূদ্রাণাঞ্চ স্ত্রিয়শ্চৈব স্বধর্ম্মস্থ তপস্বিনাং।
সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং পুরাণশ্রবণং বুধৈঃ ॥৯॥
বেদলৌকিকমার্গেষু কুৎসিতং কর্ম্ম যদ্ভবেৎ।
তস্মিন্ ভবতি যা লজ্জা হ্রীস্তু সৈবেতি কীর্ত্তিতা ॥১০॥
বিহিতেষু চ সর্ব্বেষু শ্রদ্ধা যা সা মতির্ভবেৎ ॥১১॥
গুরুণা চোপদিষ্টোঽপি বেদবাহ্যবিবর্জ্জিতঃ।
বিধিনোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্মৃতঃ ॥১২॥
অধীত্য বেদং সূত্রং বা পুরাণং সেতিহাসকং।
এতেষ্বভ্যসনং তস্য অভ্যাসেন জপঃ স্মৃতঃ ॥১৩॥
জপশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকো মানসস্তথা।
বাচিকোপাংশু উচ্চৈস্তু দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১৪॥
মানসো মনসা ধ্যানং ভেদাদ্দ্বৈবিধ্যমাস্থিতঃ।
উচ্চৈর্জ্জপাদুপাংশুশ্চ সহস্রগুণমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥
মানসশ্চ তথোপাংশোঃ সহস্রগুণমুচ্যতে।
উচ্চৈর্জ্জপশ্চ সর্ব্বেষাং যথোক্তফলদো ভবেৎ।

নীচঃ শ্রুতো নচেৎ সোঽপি শ্রুতশ্চেন্নিষ্ফলো ভবেৎ ॥ ১৬॥
ঋষিশ্ছন্দোঽধিদৈবঞ্চ ধ্যায়ন্ মন্ত্রঞ্চ সর্ব্বদা।
যস্তু মন্ত্রং জপেৎ গার্গি তদেব হি ফলপ্রদং ॥ ১৭॥
প্রসন্নগুরুণা পূর্ব্বমুপদিষ্টমনুজ্ঞয়া।
ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধ্যর্থমুপায়গ্রহণং ব্রতং॥ ১৮ ॥”

উক্ত নিয়মবাচক শ্লোক সমূহের ভাবার্থ লিখিত হইতেছে,—“তপস্থা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর-পূজা, সিদ্ধান্ত শ্রবণ, হ্রী বা লজ্জা, মতি, জপ এবং হোম বা যজ্ঞ, এই সমস্তই নিয়ম। ঐ সকলের প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র-ভাবে শ্রবণ কর ;—বিধি-নির্দ্দেশিত পন্থাবলম্বনে কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি দ্বারা শরীর-শোষণই সমস্ত তপাপেক্ষা উত্তম তপ। যে শক্তি-প্রভাবে যদৃচ্ছালাভে পুরুষের মন নিয়ত একভাবে থাকে, ঋষিগণের মতে তাহাই সুলক্ষণ-সম্পন্ন-সন্তোষ। ধর্ম্মাধর্ম্মে বিশ্বাসই আস্তিক্য। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অল্প বা অধিক ন্যায়-র্জ্জিত ধন, ধনার্থীকে প্রদত্ত হইলে, তাহাকেই দান কহা যায়। স্বীয় শক্তি-সঙ্গত ভক্তি-ভাব-প্রসূতা প্রসন্নতার সহিত বিষ্ণু কিম্বা রুদ্র-দেবের যে অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে, তাহাই ঈশ্বর পূজা। (বিষ্ণু এবং রুদ্র, উভয়ই ঈশ্বর। একই ঈশ্বরের দ্বি-প্রকার মূর্ত্তি-জন্যই বিষ্ণু এবং রুদ্র নাম হইয়াছে)। হৃদয়ের রাগাদি-রাহিত্য, বাক্যের অসত্যাদি-দোষ-রাহিত্য, শরীরের হিংসাদি-রাহিত্যও ঈশ্বর-পূজা। (ঐ প্রকার অবস্থাতেই প্রকৃত মানসী-পূজা হইয়া থাকে)। বেদান্ত-শ্রবণই বুধগণ-সম্মত সিদ্ধান্ত-শ্রবণ। বিপ্রের

ন্যায় ক্ষত্রিয়েরও কথিত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণে অধিকার আছে, তাহাও বুধগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। কোন বুধ, সদ্‌বৃত্তি-সম্পন্ন-সাধু-বৈশ্যগণের পক্ষেও সিদ্ধান্ত-শ্রবণ উপযোগী বিবেচনা করেন। বুধগণের মতে তপস্বী-শূদ্রগণের পক্ষে, সর্ব্ব-বর্ণের তপস্বিনী-স্ত্রীগণের পক্ষে নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণ ও পুরাণ-শ্রবণই সিদ্ধান্ত-শ্রবণ। বেদ ও লোকাচারানুসারে যাহা কুৎসিত কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠানে যে লজ্জা-বোধ হয়, তাহাই যোগ-শাস্ত্রীয় 'হ্রী'। বিহিত সর্ব্ব-বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহাই মতি। বৈদিক বহির্ব্ব্যাপার-বিবর্জ্জিত স্বীয় গুরূপদিষ্ট ব্যবস্থানুসারে মন্ত্রাভ্যাসই জপ। চতুর্ব্বেদ, সকল সূত্র, সকল পুরাণ এবং সকল ইতিহাসাধ্যয়ন-রূপ যে অভ্যাস, সেই অভ্যাসের নামও জপ। জপ—দ্বি-প্রকার, বাচিক এবং মানসিক। বাচিক-জপও, উপাংশু ও উচ্চভেদে দ্বিবিধ। যে জপের উচ্চারণ জাপকের কর্ণদ্বয়ে প্রবিষ্ট হয় না, তাহাই উপাংশু-জপ। যে জপের উচ্চারণ উচ্চরবে করা হয়, এবং তন্নিবন্ধন সেই 'জপ' শব্দ জাপকের কর্ণকুহরদ্বয়ে প্রবেশ করে, তাহাই উচ্চ-জপ। মন দ্বারা ধ্যান বা ধ্যানা-বৃত্তিই মানস-জপ। ঐ জপেরও দ্বৈবিধ্য-বশত, ঐ জপও দ্বিবিধ। উচ্চ-জপাপেক্ষা উপাংশু-জপ সহস্র-গুণে শ্রেষ্ঠ। উপাংশু-জপা-পেক্ষা মানস-জপ সহস্র-গুণে শ্রেষ্ঠ। উচ্চ-জপ করিবার ফল, উচ্চ-জপ দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা নীচ বা অস্পষ্ট শ্রুত হইলে নিষ্ফল হইয়া থাকে। উপাংশু-জপ উচ্চ-জপের ন্যায় উচ্চারিত হইলে তাহাও নিষ্ফল হয়। গার্গি! যে ব্যক্তি জপের ঋষি, জপের ছন্দ এবং সেই ছন্দ-সমন্বিত জপের অধি-দেবতাকে ধ্যান পূর্ব্বক সর্ব্বদাই মন্ত্র-জপ করেন, তাঁহার সেই

সকল বৈধানুষ্ঠান-জন্য, তাঁহার সেই অনুষ্ঠিত-জপ ফলপ্রদ হয়। প্রসন্ন-গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে ধর্ম্মার্থ-কাম-সিদ্ধির জন্য, সেই প্রসন্ন-গুরূপদিষ্ট উপায়াবলম্বনই ব্রত।" কেহ কেহ কহেন, শ্রীযোগি-যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ স্তুত্র-খণ্ডের দ্বিতীয়োঽধ্যায়-কথিত প্রথম শ্লোকের 'হুতং' শব্দের পরিবর্ত্তে, ঐ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে 'ব্রতং' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা নহে; কারণ 'হুতং' শব্দের যাহা অর্থ, 'ব্রতং' শব্দের অর্থ তাহা নহে। উভয়ের অর্থ-গত বিশেষ পার্থক্য আছে।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত।

প্রথম-প্রকরণের তৃতীয় শ্লোকে অষ্টাবক্র বলিয়াছেন,—

"ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে॥"

অষ্টাবক্রের মতে আত্মা,—পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ নহেন্। শ্রুতিমতে আত্মাকে ঐ সমস্তই বলা যাইতে পারে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে,—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। অদ্বৈত-মত-প্রতিপাদক নানাগ্রন্থানুসারে আত্মাই ব্রহ্ম। কথিত শ্রুতি-বচনানুসারে ব্রহ্মাত্মাই এই সমস্ত। এই সমস্তের অন্তর্গত পঞ্চভূতও বটে। অতএব আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথ্বীও সেই ব্রহ্মাত্মা। অষ্টাবক্র জনককে বলিয়াছেন, যে জনকও আত্মা নহেন্; অথচ অষ্টাবক্র-সংহিতার অষ্টাবক্র-কথিত অনেক উপদেশেই জনককে আত্মা বলা হইয়াছে। উক্ত তৃতীয়

শ্লোকানুসারে আত্মা,—পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ প্রভৃতির সাক্ষী। উক্ত শ্লোকে আত্মাকে অনিত্য-সাক্ষী বলা হয় নাই। সেইজন্য উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মাকে নিত্য-সাক্ষী বুঝিতে হয়। আত্মা উক্ত পঞ্চভূতের নিত্য-সাক্ষী বলিয়া, উক্ত পঞ্চভূতকেও নিত্য বলিতে হয়। উক্ত তৃতীয় শ্লোকানুসারে আত্মা, 'চিদ্রূপ'। অষ্টাবক্রের মতে আত্মা 'চিদ্রূপ' বলিয়া, অষ্টাবক্রের মতে অবশ্যই আত্মা নিরাকার নহেন্। অষ্টাবক্রের মতে তিনি নিরাকার হইলে, অষ্টাবক্র কথনই তাঁহাকে 'চিদ্রূপ' বলিতেন না। তাহা হইলে তিনি সেই আত্মাকে নিশ্চয়ই 'চিৎ-স্বরূপ' বলিতেন। কোন শাস্ত্রমতেই 'রূপ' নিরাকার নহে। সর্ব্ব-শাস্ত্রমতেই 'রূপ' আকার। সেইজন্য—আত্মাকে 'চিদ্রূপ' বলা হইয়াছে বলিয়া, আত্মাকে চিদাকারই বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে অষ্টাবক্রের আত্মাকে নিরাকার বলিবার উদ্দেশ্য থাকিলে, 'চিদ্রূপ' শব্দ প্রয়োগের পরিবর্ত্তে তিনি 'চিৎ' শব্দও প্রয়োগ করিতে পারিতেন। অনেক শাস্ত্রমতেই 'চিৎ' নিরাকার। অনেক শাস্ত্রমতে 'স্বরূপ'ও নিরাকার। আত্মাকে 'চিৎ-স্বরূপ' বলিলে, আত্মা 'নিরাকার' ইহাই স্বীকার করা হইত। উক্ত শ্লোকে আত্মাকে সাক্ষী বলা হইয়াছে বলিয়া, আত্মা সগুণ-সক্রিয়ও স্বীকার করা হইয়াছে; কারণ এই জাগতিক-বিচারালয়ের কোন সাক্ষীই নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহেন্, তাহা অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। অষ্টাবক্র কর্তৃক আত্মাকে সাক্ষী বলা হইয়াছে বলিয়া, আত্মাও সগুণ-সক্রিয় স্বীকার করিতে হয়।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

প্রথম-প্রকরণের চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি॥"

অষ্টাবক্র জনককে 'চিতি'তে বিশ্রাম পূর্ব্বক অবস্থান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মতে 'চিতি' শব্দের অর্থ, 'চিৎ'। চিৎ অর্থে, জ্ঞান। প্রকৃত কথায়, জ্ঞানে কোন ব্যক্তিই অবস্থান করে না, কিন্তু 'কোন-ব্যক্তিতে' জ্ঞানই অবস্থান করিতে পারে। চিৎ অর্থে, আত্মাও বলা যাইতে পারে। সুতরাং সেইজন্য 'চিতি' অর্থেও আত্মা। 'চিতি' অর্থে আত্মা স্বীকার করিলে, জনক এবং সেই 'চিতি'কে অভেদ বলা যায় না। অষ্টাবক্রের মতে ঐ 'চিতি' এবং জনক অভেদ হইলে, জনককে 'চিতি'তে বিশ্রামপূর্ব্বক অবস্থান করিতে বলা হইত না। উক্ত শ্লোকীয় 'চিতি' অর্থে 'আত্মা' স্বীকৃত হইলে, জনককে অনাত্মাই বলিতে হয়। জনকের সহিত 'চিতি' অভেদ হইলে, অষ্টাবক্র জনকের 'চিতি'তে অবস্থানেরই প্রয়োজন-বোধ করিতেন না। অষ্টাবক্রের মতে জনক 'চিতি'তে অবস্থান করিতে পারিলেই সুখী, শান্ত এবং বন্ধ-মুক্ত হইতে পারেন। অনেকের মতেই অষ্টাবক্র-সংহিতার 'চিতি' শব্দের অর্থ, আত্মা। অদ্বৈতমতে আত্মা, সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং রাজর্ষি-জনক আত্মা-চিতিতে অবস্থিত ছিলেন না, বলা যায় না। অষ্টাবক্র জনককে আত্মা-চিতিতে অবস্থান করিতে বলায়, তাঁহার 'আত্মা-চিতি'র সর্ব্বব্যাপিত্ব অস্বীকার

করা হইয়াছে। তাঁহার 'জনক' যথায় ছিলেন, তথায় আত্মা-চিতির বিদ্যমানতা অস্বীকার করা হইয়াছে। সুখ, শান্তি এবং মুক্তি,—তিন প্রকার। সেইজন্য ঐ তিন প্রকার সামগ্রী 'আত্মা' নহে। বেদব্যাস প্রণীত বেদান্তদর্শন প্রভৃতি মতে, আত্মার বিবিধত্ব নাই। বেদান্তদর্শনমতে আত্মার এক-প্রকারতাই নির্দ্দিষ্ট আছে। সেইজন্য আত্মাকে সুখ, শান্তি কিম্বা মুক্তি বলা যায় না। উক্ত শ্লোকে সুখ, শান্তি এবং মুক্তির সহিত আত্মা-চিতির অভেদত্ব প্রদর্শন করা হয় নাই। অতএব উক্ত শ্লোকানুসারেও আত্মা-চিতি এবং ঐ তিন, অভেদ নহে। ঐ তিন 'আত্মা-চিতি' নহে বলিয়া, অবশ্য ঐ তিনই 'অনাত্মা-অচিতি'। সুতরাং আত্মজ্ঞানীর ঐ তিনে প্রয়োজনই হয় না।

সপ্তম সিদ্ধান্ত।

প্রথম-প্রকরণের পঞ্চম শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

"ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব॥"

অষ্টাবক্র-কথিত উক্ত শ্লোকের অর্থ এই প্রকার,—"তুমি বিপ্রাদিক বর্ণ নহ, তুমি আশ্রমী নহ, তুমি নয়নগোচর নহ, তুমি অসঙ্গ-নিরাকার-বিশ্বসাক্ষী, তুমি সুখী হও।" উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মার যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, জনকেরও সেই সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে। অতএব সেইজন্য জনককে 'আত্মা' বলিতে হয়। উক্ত শ্লোকানুসারে 'জনক'

নয়নগোচর নহেন্; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় শ্লোকানুসারে আত্মা, 'চিদ্রূপ'। অতএব 'জনক' নয়নগোচর নহেন্, কি প্রকারে বলা যায়? কারণ 'রূপ' নয়নগোচর হয় না, তাহা কোন শাস্ত্রেই বলা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক পুরাণ সকলের মতে শ্রীকৃষ্ণ, 'চিদ্রূপ'। সে সকল মতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা যায়। জনককে 'অসঙ্গ' বলা হইয়াছে,—অথচ তাঁহাকে কি প্রকারে সুখী হইতে বলা হইয়াছে? 'অসঙ্গ' যিনি, তাঁহার কি প্রকারে সুখ-সঙ্গ হইবে? সুখের সহিত সংস্রব ব্যতীত কেহই সুখী হইতে পারে না। জনকাত্মাকে 'নিরাকার' বলা হইয়াছে। আকাশ, বায়ু, শব্দ, মন, বুদ্ধি এবং প্রত্যেক মনোবৃত্তিও 'নিরাকার'। সুতরাং নিরাকারও অপ্রাকৃত নহে;—কারণ ঐ সকল এক-প্রকৃতিরই নানা বিকাশ। ঐ সকল 'নিরাকার' বলিয়া, 'নিরাকার'ও প্রাকৃত। আত্মা-জনকও 'নিরাকার' স্বীকার করিলে, সেই আত্মা-জনককে অবশ্যই প্রাকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তবে শ্রুতি এবং শঙ্করাচার্য্যের অনেক শ্লোকানুসারে আত্মা এবং অনাত্মা অভেদ স্বীকার করিলে, আত্মাকে প্রকৃতি এবং অপ্রকৃতি, উভয়ই স্বীকার করা যায়। নানাশাস্ত্রমতেই, আকার ও নিরাকার পরস্পর অভেদ নহে, কিন্তু অষ্টাবক্রের মতে, আকার ও নিরাকার অভেদ প্রমাণ করা যায়। পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় শ্লোকানুসারে আত্মা 'চিদ্রূপ,' চতুর্থ শ্লোকানুসারে আত্মা 'চিতি' এবং পঞ্চম শ্লোকানুসারে জনকাত্মা 'নিরাকার' সেইজন্য আকার এবং নিরাকার অভেদ বলিতে হয়।

অষ্টম সিদ্ধান্ত।

প্রথম-প্রকরণের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে অষ্টাবক্র এবং জনক, অভেদ বুঝিবার কোন কারণ নাই। উক্ত শ্লোকে উভয়ের প্রভেদত্বই সূচিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকও দ্বৈতবাচক। উক্ত শ্লোকানুসারে অষ্টাবক্র জনককে 'বিভো' সম্বোধন করিয়াছেন। নানা-শাস্ত্রানুসারে আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠকেই 'বিভো' সম্বোধন করা যাইতে পারে। প্রথম-প্রকরণের প্রথম শ্লোকে জনক, অষ্টাবক্রের প্রতি প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

"কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতৎ ত্বং ব্রূহি মে প্রভো॥"

তদুত্তরে অষ্টাবক্র,—দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত! বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ভজ॥
ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে॥
যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি॥"

প্রথম শ্লোকে জনকের মুমুক্ষুতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম শ্লোকানুসারে জনকের জ্ঞানাভাব, মুক্তির অভাব এবং বৈরাগ্যাভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ তিন সামগ্রীর জন্য জনক লালায়িত ছিলেন, তাহাও বুঝা যায়। সেইজন্যই তিনি ঐ তিন সামগ্রী কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, জানিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অষ্টাবক্রও সংক্ষেপে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোকে ঐ তিন লাভের উপায় কহিয়াছিলেন। জনক ঐ উপায়াবলম্বন করিবার পূর্ব্বেই, অষ্টাবক্র তাঁহাকে নিজ ষষ্ঠ শ্লোক দ্বারা কহিয়াছিলেন,—

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো!
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা॥"

উক্ত শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে,—"বিভো! তোমার মানসিক ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ নাই,—তুমি কর্ত্তা এবং ভোক্তা নহ,—তুমি সততই মুক্ত।" জনককে নির্ব্বিকারাত্মা বিবেচনায় যদ্যপি 'মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা' বলা হইয়া থাকে, তাহাও আমাদের বিবেচনায় বলা সঙ্গত হয় নাই; কারণ বদ্ধেরই মুক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেই জন্য সতত-মুক্ত কেহই নহেন্। নির্ব্বিকারাত্মাও সতত-মুক্ত নহেন্। নির্ব্বিকারাত্মা মুক্তই নহেন্। তাঁহার মুক্তির প্রয়োজনই হয় না, কারণ তাঁহার বন্ধন কখন হয় নাই। সুবর্ণ-নির্ম্মিত প্রস্তর-পাত্র বলার ন্যায় সর্ব্বদা-মুক্ত বা সতত-মুক্ত, এই বাক্য প্রয়োগ হইতে পারে। সুবর্ণ দ্বারা যেমন প্রস্তর-পাত্র নির্ম্মিত হইতে পারে না, তদ্রূপ কাহাকেও সর্ব্বকালের

জন্য 'মুক্ত' বলা যাইতে পারে না। কোন ব্যক্তি 'মুক্ত' এই কথা শ্রবণ করিলে, তাঁহার কোন দিন বন্ধন ছিল, অবশ্যই বোধ করা যাইতে পারে। সতত-মুক্ত, সর্ব্বদা-মুক্ত বা সর্ব্বকালে-মুক্ত বলিলেও, সেই মুক্তের বন্ধন হয় নাই বুঝিবার কোন কারণ নাই। কারণ বন্ধন ব্যতীত মুক্তি হইতেই পারে না। বন্ধনই মুক্তির কারণ। সেইজন্য মুক্তির নিত্যতা স্বীকার করা যায় না। অদ্বৈতমতের সর্ব্ব-শাস্ত্রানুসারেই বন্ধন, প্রাকৃত। সেই বন্ধন মুক্তির কারণ বলিয়া,—সেই বন্ধনবশত মুক্তির প্রয়োজন হয় বলিয়া, মুক্তিও অনিত্য স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য মুক্তিও 'প্রাকৃত'—সেইজন্য মুক্তিও 'অনাত্ম' স্বীকার করিতে হয়।

নবম সিদ্ধান্ত।

প্রথম-প্রকরণের সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"একো দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্ব্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরম্ ॥"

উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকে জনককে 'মুক্ত' বলা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত শ্লোকানুসারে জনক মুক্ত-প্রায়। মুক্ত-প্রায় এবং মুক্ত একই প্রকার নহে, উভয়ে বিশেষ তারতম্য আছে। মুমুক্ষুকেও মুক্ত-প্রায় বলা যাইতে পারে। মুমুক্ষু যাহা, মুক্ত তাহা নহে। জনককে 'দ্রষ্টা' বলা হইয়াছে। যিনি দ্রষ্টা, অবশ্যই তাঁহার দৃষ্টি আছে। দৃষ্টি নয়নে থাকে। নয়ন যে আত্মার আছে, তিনি অবশ্যই আকার-বিশিষ্ট বা সাকার।

দৃষ্টির ক্রিয়াও আছে। জনক দ্রষ্টা ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার দৃষ্টি-শক্তিও ছিল, সেইজন্য তাঁহার সেই দৃষ্টি-শক্তির ক্রিয়াও ছিল। তাঁহার দৃষ্টি-শক্তি ছিল বলিয়া, তাঁহার নয়নও ছিল। তাঁহার নয়ন ছিল বলিয়া, তাঁহার আকারও ছিল; কারণ নয়ন আকারেই থাকে। দ্রষ্টার্থে 'সাক্ষী' বলিলেও, দ্রষ্টার দৃষ্টি-শক্তি, নয়ন এবং দেহ স্বীকার করিতে হয়; কারণ সাক্ষীরও ঐ সমস্ত আছে। পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ শ্লোকে যে জনককে সর্ব্বদা-মুক্ত বলা হইয়াছে, পর শ্লোকে তাঁহাকেই—

"একো দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্ব্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরম্ ॥"

বলা সঙ্গত হয় নাই। সর্ব্ব-সাক্ষী-মুক্তাত্মার আপনাকে অসর্ব্ব-সাক্ষী বোধ করিবার কোন কারণ নাই। সেইজন্য অষ্টাবক্র-কথিত সর্ব্ব-সাক্ষী-মুক্ত-জনকাত্মারও আপনাকে বদ্ধ-দ্রষ্টা বোধ করা উচিত ছিল না। সর্ব্ব-সাক্ষী-মুক্তাত্মার কোন ক্রমে আপনাকে অসর্ব্ব-সাক্ষী-অমুক্তাত্মা বোধ হইলে, বন্ধন এবং মুক্তির সমতা লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে বন্ধন এবং মুক্তি, একই বস্তু বলিতে হয়। বন্ধন এবং মুক্তি, উভয়ই প্রকৃতির দুই প্রকার বিকাশ, তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

দশম সিদ্ধান্ত।

অষ্টম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অহং কর্ত্তেত্যহংমানমহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে 'আমি-কর্ত্তা' এই বোধ,—অহঙ্কার এবং অভিমানবশত হইয়া থাকে। উক্ত শ্লোকে অহঙ্কারাভিমানকে 'মহাকৃষ্ণাহি'র সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কোন মহাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে অবগত হওয়া যায়, উক্ত অহঙ্কারাভিমান নামক 'মহাকৃষ্ণাহি' নাশের কারণ, নিরহঙ্কার-নিরভিমান নামক 'অব্যর্থাস্ত্র'। কিন্তু স্বয়ং অষ্টাবক্র, অহঙ্কারাভিমান নাশের জন্য, উক্ত 'কথিতাস্ত্র' নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি উক্ত শ্লোকে 'মহাকৃষ্ণাহি' নাশের জন্য, কোন উপায়ই অবধারণ করেন নাই। তিনি জনককে 'নাহং কর্ত্তেতি'—বিশ্বাসামৃত পান করিয়া সুখী হইতে বলিয়াছেন। অষ্টাবক্র 'নাহং কর্ত্তেতি'কে যেমন 'বিশ্বাসামৃত' বলিয়াছেন, তদ্রূপ 'অহং কর্ত্তেত্যহং-মান'কে 'মহাকৃষ্ণাহি' না বলিয়া, অবিশ্বাস-বিষ, অজ্ঞান-বিষ বা অহঙ্কারাভিমান-বিষ বলিতে পারিতেন। অমৃত দ্বারা বিষ নষ্ট হইতে পারে সত্য,—কিন্তু 'অহং কর্ত্তেত্যহং-মান'কে বিষ বলা হয় নাই। মহাত্মা-অষ্টাবক্রের মতে, তাহা 'মহাকৃষ্ণাহি' বা 'মহাকৃষ্ণসর্প'; অতএব তাহার নাশে, তৎকর্ত্তৃক দংশিত স্থানের বিষ-নাশের সম্ভাবনা ছিল না। ঐ প্রকার সর্পের বিষ যে কি, তাহাও উক্ত মহাত্মা কহেন্ নাই। সেই বিষ-নাশের কোন উপায়ও তিনি বলেন নাই। সর্প-দংশিত-ব্যক্তির অভ্যন্তরে সর্পের অবস্থান স্বাভাবিক নহে। সেইজন্য কেহ কেহ কহেন, দেহাভ্যন্তরিক 'অহংমান'কে 'মহাকৃষ্ণাহি' বলা সঙ্গত হয় নাই।

একাদশ সিদ্ধান্ত।

নবম শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

"একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্য জ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥"

উক্ত শ্লোকে 'একো বিশুদ্ধবোধোঽহং,'—এইরূপ নিশ্চয়কেই 'বহ্নি' বলা হইয়াছে। অজ্ঞানকে 'গহন' বলা হইয়াছে। ঐ প্রকার বহ্নি দ্বারা অজ্ঞান-গহন দাহ করিয়া, বীত-শোক এবং সুখী হইতে বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে অজ্ঞান-গহনের স্থান নিরূপণ করা হয় নাই। কেবলমাত্র একটী কিম্বা দুইটী বৃক্ষকে গহন বলা যাইতে পারে না। উক্ত শ্লোকানুসারে দুই প্রকার দুইটী বৃক্ষই প্রাপ্ত হইয়া যায়। একটী শোক-বৃক্ষ এবং অপরটী দুঃখ-বৃক্ষ। উক্ত শ্লোকানুসারে ঐ দুই বৃক্ষকেই অজ্ঞান-গহনের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। ঐ দুই বৃক্ষ দগ্ধ হইলে, ঐ দুই বৃক্ষের অবস্থিতি যে ভূমিতে, সে ভূমি ঐ দুই বৃক্ষ, বিহীন হইতে পারে। ঐ দুই বৃক্ষের মধ্যে যেটীর নাম শোক, সেটীর দাহে, সেটীর অবস্থানের ভূমি বীত-শোক হয়। ঐ দুই বৃক্ষের মধ্যে যেটীর নাম দুঃখ, সেটীর দাহে, সেটীর অবস্থানের ভূমি দুঃখ-হীন বা সুখী হয়। ঐ দুই বৃক্ষের ভূমি, জনককেও বলিতে পার না। কারণ উক্ত নবম শ্লোকানুসারে জনককেই অহমোপাধিক 'একো বিশুদ্ধবোধ,'—এই প্রকার 'নিশ্চয়-বহ্নি' বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত দুই বৃক্ষের ভূমি, জনককে কি প্রকারে বলা যাইবে।

দ্বাদশ সিদ্ধান্ত।

দশম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দঃ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে ভ্রমবশত রজ্জুকে যেমন সর্প-বোধ হয়, তদ্রূপ ভ্রমবশতই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে বিশ্ব-বোধ ও বিশ্ব-দর্শন হয়। উক্ত শ্লোকে, যে আত্মাতে এই বিশ্ব কল্পিত হয়, তাঁহাকে 'আনন্দ' ও 'পরমানন্দ' বলা হইয়াছে। 'আনন্দ' অনেকেই সম্ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা 'আনন্দ' সম্ভোগ করেন, তাঁহারা,—এবং তাঁহারা যে 'আনন্দ' সম্ভোগ করিয়া থাকেন তাহা,—পরস্পর যে অভেদ নহে, এ কথা কে না জানে? অষ্টাবক্রের মতে যাঁহাতে বিশ্ব কল্পিত, অষ্টাবক্রের মতেই তাঁহাকে 'আনন্দ' বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহাকে প্রাকৃতই বলিতে হয়। কারণ অদ্বৈতমতে আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই অপ্রাকৃত নহে। আত্মাকে আনন্দ এবং জ্ঞান কহিলে, আত্মার এক-প্রকারতা রহে না। আত্মা, একই প্রকার। সেইজন্য আত্মা,—আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন্, অবশ্যই বলিতে হয়। উক্ত দশম শ্লোকানুসারে বিশ্ব, কল্পিত। কল্পিত যাহা, তাহাই মিথ্যা। কিন্তু আমরা স্পষ্টই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি, অতএব আমরা কি প্রকারেই বা আমাদের অবস্থিতির স্থান এই 'বিশ্ব'কে কল্পিত বা মিথ্যা বলি? আমাদের এই 'প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান বিশ্ব'কে সত্যই বলিতে হইতেছে। এই 'বিশ্ব'—দর্শন, স্পর্শন এবং বোধ দ্বারা অবধারিত হইতেছে। এই বিশ্বের সত্যতা-সম্বন্ধে,

এই সিদ্ধান্তদর্শনের তৃতীয় ভাগে বিস্তৃতরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে।

ত্রয়োদশ সিদ্ধান্ত।

একাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"মুক্ত্যভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিং বদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥"

অষ্টাবক্রের মতে 'মুক্ত্যভিমানী মুক্তো'। তাঁহারই মতে 'বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি'। অনেক অসম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও অভিমান-বশত আপনাদিগকে সম্ভ্রান্ত বিবেচনা করেন। অভিমান-বশত কত লোক আপনাদিগকে ধার্ম্মিক ও সাধু-বোধ করেন, অথচ তাঁহারা ধার্ম্মিকও নহেন, সাধুও নহেন্। যিনি অভিমান-বশত আপনাকে 'মুক্ত' বিবেচনা করেন, তিনি 'প্রকৃত-মুক্ত' নহেন্,—তিনিও 'বদ্ধ'। 'মুক্ত' হইলে নিরভিমানী হইতে হয়। সেইজন্য 'প্রকৃত-মুক্তে'র মুক্তাভিমান নাই। অষ্টাবক্রেরই পূর্ব্বোক্ত অষ্টম শ্লোকানুসারে অভিমান কোন উত্তম সামগ্রী নহে। সেমতেও অভিমান হেয়। সেমতে অভিমান বা মানকে 'মহাকৃষ্ণাহি' বলা হইয়াছে। 'বদ্ধ' আপনাকে 'বদ্ধ-বোধ' করিলে, তাহার সেই 'বোধ'কে, তাহার অভিমান না বলাই উচিত। তাহা,—সে প্রকৃত যাহা, তাহার সেই ধারণা। সেইজন্য সেই প্রকার 'বোধ' দোষণীয় নহে, বরঞ্চ তদ্দ্বারা সেই 'বদ্ধের' উপকার হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ সিদ্ধান্ত।

দ্বাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব॥"

উক্ত শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে,—"আত্মা—সাক্ষী, বিভু; পূর্ণ, এক্, মুক্ত, চিৎ, অক্রিয়, অসঙ্গ, নিস্পৃহ এবং শান্ত। ভ্রম-প্রযুক্তই তিনি সংসারবান্।" আত্মাকে 'সাক্ষী' বলা হইয়াছে। সেইজন্য তিনি 'সগুণ-সক্রিয়-সাকার'। 'সাক্ষী-আত্মা' কেন যে 'সগুণ-সক্রিয়-সাকার,' তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আত্মাকে 'বিভু' বলা হইয়াছে বলিয়া, আত্মা 'সক্রিয়'। কারণ যাঁহার বিভূতি আছে, তিনিই 'বিভু'। বিভূতি যাঁহার আছে, তাঁহার বিভূতি প্রকাশ হইয়া থাকে। 'বিভু' হইতে বিভূতির প্রকাশ, ক্রিয়া দ্বারা হইয়া থাকে। সেইজন্যই যে আত্মাকে 'বিভু' বলা হইয়াছে, সে আত্মা অবশ্যই 'সক্রিয়'। শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক নানাশাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণাত্মা—'বিভু'। তাঁহার কথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত বিভূতি-যোগাধ্যয়নে তাঁহাকে 'সগুণ-সক্রিয়'ই বলিতে হয়। আত্মাকে 'পূর্ণ' বলা হইয়াছে। সেইজন্য তিনি কোন বিষয়ে 'অপূর্ণ' নহেন্। সেইজন্য তাঁহাকে 'অসগুণ-অসক্রিয়' বলিলে, তিনিও 'অপূর্ণ' স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাকে 'পূর্ণ' বলা হইয়াছে বলিয়া, তিনি সগুণ-সক্রিয়ও বটেন। যাঁহাতে 'সমস্ত' আছে, তিনিই 'পূর্ণ'। আত্মাতে 'সমস্ত' আছে, সেইজন্য আত্মাও 'পূর্ণ'। আত্মা ব্যতীত 'সমস্ত' বলিয়া, আত্মা এবং 'সমস্ত' অভেদ বলা যায় না। কারণ আত্মা এবং 'সমস্ত'

অভেদ হইলে, আত্মা 'পূর্ণ' শব্দ দ্বারা বিশেষিত হইতেন না। 'পূর্ণ' শব্দ অদ্বৈত-বাচক নহে। আত্মাকে 'পূর্ণ' বলিলে, আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নাই, বুঝিবার কোন কারণ নাই। যেমন পূর্ণ-কুম্ভ বলিলে কেবলমাত্র কুম্ভ বুঝিবার কোন কারণ নাই,—পূর্ণ-কুম্ভ বলিলে সেই কুম্ভ, কোন বস্তু দ্বারা পূরিত বুঝিতে হয়; তদ্রূপ 'পূর্ণাত্মা' বলিলে আত্মা, কোন বস্তু বা বহু-বস্তু দ্বারা পূরিত বুঝিতে হয়। আত্মাকে 'এক্' বলা হইয়াছে। অনেকে ঐ 'এক্' শব্দের অর্থ, অদ্বিতীয় বলিয়া থাকেন, কিন্তু অদ্বিতীয় শব্দে কেবল 'এক্,' এই অর্থ হয় না। অদ্বিতীয় শব্দের দ্বিতীয়াধিক'ও অর্থ হইতে পারে; সেইজন্য অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ, 'বহু'ও হইতে পারে। কোন মহাত্মা বলেন, আত্মার মতন দ্বিতীয়-বস্তু নাই বলিয়া, আত্মা 'এক্'। অপর পক্ষ বলেন, আত্মার বহুতা নাই বলিয়া, আত্মাকে 'এক্' বলা হইয়াছে। আত্মাকে 'মুক্ত' বলা হইয়াছে। অষ্টাবক্রের মতে আত্মা 'মুক্ত' স্বীকার করিলে, কোন সময়ে সেই আত্মার নিশ্চয়ই বন্ধন ছিল স্বীকার করা হয়। আত্মাকে কেবল 'অমুক্ত' বলিলে, তিনি 'বদ্ধ' ইহাই স্বীকার করা হয়। সেইজন্য আত্মাকে কেবলমাত্র 'অবদ্ধ' কহিতে হয়। বেদান্ত প্রভৃতি অদ্বৈতমতের গ্রন্থাবলীমতে আত্মাকে 'নির্ব্বিকার' বলিতে হইলে, তাঁহাকে 'মুক্ত' বলা যায় না। কারণ 'নির্ব্বিকার' যিনি, তাঁহার কখন বন্ধন হইয়াছিল, স্বীকার করা যায় না। আত্মাকে 'চিৎ' বলা হইয়াছে। অনেক শাস্ত্রমতেই 'চিৎ' জ্ঞান-শক্তি। অনেক শক্তি-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক গ্রন্থমতে, 'চিৎ' কালী। সেইজন্য আত্মা ও চিৎ, অভেদ বলা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ

পাতঞ্জলদর্শনমতে, 'আত্মা' দৃক্‌শক্তি। বেদান্তদর্শনমতে ও অদ্বৈতবাদীদিগের অন্যান্য গ্রন্থমতে 'আত্মা'ই ব্রহ্ম, পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। 'আত্মা'ই কালী। অতএব সেইজন্য কালী ও ব্রহ্ম অভেদ। কালী-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক অনেক গ্রন্থমতেই 'কালী'—সগুণা, সাকারা এবং ক্রিয়াবতী। ঐ প্রকার কালীর সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে বলিয়া, ব্রহ্মকেও 'সগুণ-সক্রিয়-সাকার' বলা যায়। আত্মাকে 'অক্রিয়' বলা হইয়াছে। কিন্তু আত্মাকে 'চিৎ' বলায়, তাঁহাকে সগুণ, সক্রিয় এবং সাকার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ 'চিদাত্মা'কে কালী প্রমাণ করিয়া, তাঁহাকে সগুণ, সক্রিয় ও সাকার প্রমাণ করা হইয়াছে। সেই আত্মা যে সময় কোন কার্য্য করেন না, সে সময়ে তাঁহাকে 'অক্রিয়' বলিতে পার। বেদান্ত প্রভৃতি অদ্বৈত-গ্রন্থাবলীমতে আত্মার সর্ব্বদেহেই অবস্থান। প্রায় সর্ব্ব-দেহেই তিনি সক্রিয়, ইহাও বুঝা যায়। বেদান্ত প্রভৃতি মতে, আমিও 'আত্মা'। আমি-আত্মা যে 'সক্রিয়,' তাহা নিজেই বুঝিতেছি; ঐ দেহস্থ তুমি-আত্মা যে 'সক্রিয়,' তাহা তুমিও বুঝিতেছ; তবে আত্মাকে কেবলমাত্র 'অক্রিয়' কি প্রকারে বলা যায়। আত্মাকে 'সক্রিয়' এবং 'অক্রিয়' উভয়ই বলিতে হইলে, এই প্রকারে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে;—আত্মা যখন কার্য্য করেন, তখন তিনি সক্রিয়; আত্মা যখন কার্য্য করেন না, তখন তিনি 'অক্রিয়,'—তখনি তিনি 'অসঙ্গ,' 'নিস্পৃহ' এবং 'শান্ত'। 'সক্রিয়াত্মা' ও 'সগুণাত্মা' অসংসারবান নহেন।

পঞ্চদশ সিদ্ধান্ত।

ত্রয়োদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোঽহয়ং ভ্রমং মুক্ত্বা বাহ্যভাবমথান্তরম্ ॥"

উক্ত শ্লোকে আত্মাকে 'কূটস্থ' 'বোধ' এবং 'অদ্বৈত' ভাবনা করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু আত্মাকে 'কূটস্থ' ভাবনা করিলেই, আত্মাকে 'কূটস্থ' বোধ হয় না। আত্মাকে 'বোধ' ভাবনা করিলেও, আত্মাকে 'বোধ' বলিয়া বিবেচনা হয় না। আত্মাকে 'অদ্বৈত' ভাবনা করিলেও, আত্মাকে 'অদ্বৈত' বোধ হয় না। তাহা যদ্যপি হইত, তাহা হইলে তুমি আপনাকে 'রাজা' ভাবনা করিলেও 'রাজা' হইতে। তাহা হইলে তোমার ক্ষুধার উদয়ে, তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়াছে,—এই প্রকার ভাবনা করিলেও তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারিত। তাহা হইলে প্রত্যেক বদ্ধ-জীবই আপনাকে 'মুক্ত' ভাবিয়া, 'মুক্ত' হইতে পারিত। অদ্বৈতমতানুসারে 'পরিভাবনা'ও অপ্রাকৃত নহে। তবে 'পরিভাবনা' দ্বারা আত্মাকে কূটস্থ, বোধ এবং অদ্বৈতাবধারণ করাও সত্য নহে। 'অসত্য-প্রাকৃত-পরিভাবনা' দ্বারা যাহা নিশ্চয় করা হয়, তাহা কখনই বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। সেইজন্য 'পরিভাবনা' দ্বারা আত্মাকে কূটস্থ, বোধ এবং অদ্বৈত বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। আত্মা—কূটস্থ, বোধ এবং অদ্বৈত স্বীকার করিলে, আত্মার ত্রৈবিধ্য স্বীকার করা হয়। সেইজন্য আত্মাকে অপরিবর্ত্তনীয় এবং এক-প্রকারও বলা যাইতে পারে না। আত্মার এক-

প্রকারতা স্বীকার না করিলে, আত্মাকে প্রাকৃত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। কারণ প্রকৃতিরই বহু-প্রকারতা আছে। 'বোধ' শব্দের অর্থ, জ্ঞান। আত্মাকে 'বোধ' বলিলে, অবশ্য আত্মাকে 'জ্ঞান' বলিয়াই স্বীকার করা যায়। জ্ঞানকে 'আত্মা' বলিয়া স্বীকার করিলে, আত্মাকে 'জ্ঞাতা' বলা যায় না। 'আমি' এবং 'আমার জ্ঞান' অভেদ, ইহা আমার বোধ হয় না। 'আমি' এবং 'আমার জ্ঞান' যে স্বতন্ত্র, তাহা আমি নিজেই বুঝিতেছি। কোন মহাত্মার বিবেচনায় 'আমি' এবং 'আমার জ্ঞান' অস্বতন্ত্র হইলে, 'আমি' এবং 'আমার ক্ষুধা'ও অস্বতন্ত্র বলিয়া, তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় না কেন? তাহা হইলে মন, বুদ্ধি, সর্ব্বেন্দ্রিয় ও অহ-ঙ্কার প্রভৃতি এবং আমি অভেদ, ইহাই বা তৎকর্ত্তৃক অবধারিত হয় না কেন? 'আমি' এবং 'আমার জ্ঞান' যেমন অভেদ নহে, উভয়ে যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে; তদ্রূপ 'আত্মা' এবং 'আত্মজ্ঞান' অভেদ নহে, উভয়ে স্বাতন্ত্র্য আছে। সেইজন্য আত্মাকে 'বোধ' বলা সঙ্গত নহে। 'বোধ' যাহা, তাহাই বোধ-কর্ত্তা নহে। 'কর্ম্ম' যাহা, তাহাই কর্ম্ম-কর্ত্তা নহে। 'ভক্তি' যাহা, তাহাই ভক্ত নহেন্। 'প্রেম' যাহা, তাহাই প্রেমিক নহেন্। আত্মাকে অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণানুসারে 'অদ্বৈত' বলিতে হইলে, আত্মাকে 'কূটস্থ' এবং 'বোধ'ও বলা যায় না; তাহা হইলে আত্মার অদ্বৈততা রক্ষা হয় না। সেইজন্য আত্মা, 'বোধ' এবং 'কূটস্থ' নহেন্ই স্বীকার করিতে হয়। উক্ত শ্লোকে অষ্টাবক্র এবং জনকের সহিত আত্মার অভেদত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। সেইজন্য উক্ত শ্লোকটীও সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক।

ষোড়শ সিদ্ধান্ত।

চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিষ্কৃত্য সুখী ভব॥"

উক্ত শ্লোকও দ্বৈততার পরিচায়ক। উক্ত শ্লোকে মহাত্মা-অষ্টাবক্র জনককে 'পুত্রক' সম্বোধন করিয়াছেন। সেইজন্যই উক্ত শ্লোককেও দ্বৈত-সূচক বলিতে হয়। বাৎসল্য-ভাববশত 'পুত্রক' সম্বোধন করা যাইতে পারে। গুরুও শিষ্যকে 'পুত্রক' সম্বোধন করিতে পারেন। অষ্টাবক্র-সংহিতানুসারে জনকের গুরু, অষ্টাবক্র। সেইজন্য অষ্টাবক্র, জনককে 'পুত্রক' কহিয়াছেন। নানাশাস্ত্রানুসারে অবগত হওয়া যায়, শিষ্যের প্রতি গুরুর বাৎসল্য-ভাবও হইয়া থাকে। জনক, অষ্টাবক্রের শিষ্য ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার প্রতি অষ্টাবক্রের বাৎসল্য-ভাব থাকা অসঙ্গত হয় নাই। অষ্টাবক্রও ভাবুক ছিলেন বলিতে হইবে। সেইজন্যই তাঁহার জনকের প্রতি বাৎসল্য-ভাব ছিল। জনকের অষ্টাবক্রের প্রতি দাস্য-ভাব ছিল। সেইজন্যই তিনি, অষ্টাবক্র-সংহিতোক্ত প্রথম-প্রকরণের প্রথম শ্লোকানুসারে 'প্রভো' শব্দ দ্বারা অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়াছিলেন। অতএব সেইজন্য জনকও অভাবুক ছিলেন না, স্বীকার করিতে হয়। ক্রিয়ার সহিত সংস্রব থাকিতে, কেহই অভাবুক হইতে পারেন না। অবগত হওয়া যায়,—অষ্টাবক্র ও জনকের ক্রিয়ার সহিত সংস্রব ছিল। সেইজন্য তাঁহারাও ভাবুক ছিলেন স্বীকার করিতে হয়। কোন ভাবের সহিত দিব্যতার সংস্রব

থাকিলেই, সেই ভাবকে দিব্য-ভাব বলা যায়। যেমন অষ্টাবক্রের—আপনার সহিত জনকের দ্বৈততা ছিল বোধ থাকায়, উক্ত চতুর্দ্দশ শ্লোকানুসারে জনককে তিনি 'পুত্রক' সম্বোধন করিয়াছিলেন; যেমন জনকের—আপনার সহিত অষ্টাবক্রের দ্বৈততা ছিল বোধ থাকায়, অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম শ্লোকানুসারে, তিনি অষ্টাবক্রকে 'প্রভো' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন; তদ্রূপ দ্বৈতবোধবশত কাহারও পরমেশ্বরকে 'প্রভু' বোধ হইলে, তাঁহার সেই বোধজ-দাস্য-ভাবকে দিব্য-দাস্য-ভাবই বলা যাইতে পারে। কোন ভক্তের পরমেশ্বরের প্রতি অন্য কোন ভাব হইলে, সেই ভাবকেও দিব্য-ভাব বলা যায়। ভক্তের পরমেশ্বরের প্রতি যে কোন ভাব হইয়া থাকে, তাহাই দিব্য-ভাব। এক জীবের অন্য জীবের প্রতি যে ভাব আছে বা যে ভাব হয়, তাহাই অদিব্য-ভাব।

সপ্তদশ সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তের পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তে যে শ্লোক আছে, তাহার অর্থ এই প্রকার হইতে পারে,—"পুত্রক! দেহাভিমান-পাশ দ্বারা তুমি চির-বদ্ধ। আমিই 'বোধ'—এই প্রকার জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া সুখী হও।" দেহাভিমান-পাশ দ্বারা যিনি চির-বদ্ধ, তাঁহার মুক্ত হইবার সম্ভাবনা কি আছে? পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ শ্লোকীয় অষ্টাবক্র-বাক্য দ্বারা জনকের চির-বদ্ধত্বই প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ শ্লোকানুসারে জনক, চির-বদ্ধ। চির-বদ্ধার্থে, নিত্য-বদ্ধও বলা যাইতে পারে। নিত্য-বদ্ধের মুক্তির আশা

করাও অসঙ্গত। জনক যদ্যপি চির-বদ্ধ বা নিত্য-বদ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মুক্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য জনকের প্রতি অষ্টাবক্রের—

"দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব॥"

বলা সঙ্গত হয় নাই। উক্ত চতুর্দ্দশ শ্লোকের শেষাংশে—

'বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব'

বলা হইয়াছে। 'বোধ' শব্দের অর্থও 'জ্ঞান'। আমিই 'বোধ' স্বীকার করিলে, পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে 'আমি'কে অনিত্যই স্বীকার করিতে হয়। পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আত্মবোধ নামক গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে 'জ্ঞান'কে বা 'বোধ'কে স্পষ্টই অনিত্য বলিয়া বুঝিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কথিত উত্তর-গীতার তৃতীয়োঽধ্যায়ে—

"অহমেকমিদং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরং সুখং।
দৃশ্যাতে তৎ খগাকারং খগাকারং বিচিন্তয়েৎ॥১১॥"

বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকানুসারে 'এক,' 'অহং' বা 'আমি'ই, এই সমস্ত। অনেক অদ্বৈত গ্রন্থমতেই 'অহং' আত্মা-বাচক। সুতরাং উক্ত শ্রীকৃষ্ণ-কথিত শ্লোকানুসারে অহমাত্মা বা আমি-আত্মাই 'সমস্ত' স্বীকার করিতে হয়।

অষ্টাদশ সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্ব-কথিত চতুর্দ্দশ শ্লোকানুসারে দেহাভিমান-পাশ, 'আমি-বোধ'—এই প্রকার জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা ছেদিত হইতে পারে। ঐ শ্লোকের প্রথম-চরণে জনককে দেহাভিমান-পাশ দ্বারা চির-বদ্ধ বলা হইয়াছে। জনককে দেহাভিমান-পাশ দ্বারা চির-বদ্ধ বলায়, তদ্দ্বারা সেই দেহাভিমান-পাশেরও চিরত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। সেইজন্য 'আমি-বোধ'—এই প্রকার জ্ঞান-খড়্গ দ্বারাও উক্ত দেহাভিমান-পাশ ছেদিত হইতে পারে না। সেইজন্য চির-দেহাভিমান-পাশাবদ্ধ-জনকের মুক্তি হয় নাই, স্বীকার করিতে হয়। অতএব সেইজন্য জনকের প্রকৃত সুখলাভও হয় নাই, স্বীকার করিতে হয়। কারণ ঐ শ্লোকে জনককে জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা দেহাভিমান-পাশ ছেদন পূর্ব্বক সুখী হইতে বলা হইয়াছে। জ্ঞানকে 'খড়্গ' বলা হইয়াছে বলিয়া, বোধকেও 'খড়্গ' বলিতে হয়; কারণ 'জ্ঞান' ও 'বোধ' শব্দের একই অর্থ। বোধকেই 'অহং' বলা হইয়াছে বলিয়া, অহংও 'জ্ঞান' স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য বোধ, জ্ঞান এবং অহং বা আত্মা, অভেদই বলিতে হয়। বোধ, জ্ঞান এবং অহং বা আত্মা, পরস্পর অভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া এবং জ্ঞানও খড়্গ বলিয়া,—বোধও খড়্গ, অহংও খড়্গ এবং আত্মাও খড়্গ।

একোনবিংশ সিদ্ধান্ত।

অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণের পঞ্চদশ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে,—

"নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥"

উক্ত শ্লোকের এই প্রকার অর্থ হইতে পারে,—"তুমি নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, স্বপ্রকাশ ও নিরঞ্জন। তোমার সমাধিতে অবস্থান করিবার প্রয়াসই তোমার বন্ধন।" জনকের নিজ দেহের সঙ্গে সংস্রব ছিল, সেইজন্য তাঁহাকে নিঃসঙ্গ বলা উচিত হয় নাই। অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণীয় প্রথম শ্লোকানুসারে এবং অন্যান্য অনেক শ্লোকানুসারে, জনক কথা কহিতেন অবগত হওয়া যায়। কথা কহাও ক্রিয়া। সেইজন্য জনক নিষ্ক্রিয় ছিলেন, বলা যায় না। জনককে প্রকাশ করিবার কেহ না থাকিলে ও জনক স্বপ্রকাশ হইলে, অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণীয় প্রথম শ্লোকানুসারে তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং মুক্তির জন্য লালায়িত হইতেন না। অনেক শাস্ত্রানুসারে স্বপ্রকাশ যিনি, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার কোন অভাবই নাই। ঐ প্রথম শ্লোকানুসারে, জনক বদ্ধ ছিলেন অবগত হওয়া যায়। সেইজন্যই তিনি অষ্টাবক্রের প্রতি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি'। অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণের প্রথম শ্লোকানুসারে জনক বদ্ধ ছিলেন বলিয়া, উক্ত পঞ্চদশ শ্লোকানুসারে, তিনি 'নিরঞ্জন' ছিলেন স্বীকার করা যায় না। কারণ অদ্বৈতমতের প্রসিদ্ধ নানাগ্রন্থানুসারে যাঁহার বন্ধন নাই, তিনিই নিরঞ্জন। প্রথম-প্রকরণের প্রথম শ্লোকানুসারে জনকের বন্ধন ছিল। সেইজন্য তিনি অবশ্যই নিরঞ্জন ছিলেন, স্বীকার করা যায় না। জনক বদ্ধই ছিলেন,

প্রমাণ করা হইল। তাঁহার যদ্যপি সমাধিতে অবস্থান করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা—তাঁহার মুমুক্ষুতাবশতই হইয়াছিল, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ কোন সুবাসনাই বন্ধন-প্রযুক্ত হয় না। সুবাসনাবশতই দিব্য-ক্রিয়াযোগাবলম্বিত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার ক্রিয়াযোগ দ্বারাই জ্ঞানযোগে অধিকার হইয়া থাকে। সেইজন্যই সমাধিলাভ-বাসনা বন্ধন নহে, কিন্তু তাহা মুক্তিলাভের অনুকূল; সেইজন্য সমাধিলাভ-বাসনা মঙ্গলের কারণই বলিতে হইবে। নানাযোগশাস্ত্রানুসারে বহু-প্রকার সমাধি। ঘেরণ্ড-সংহিতামতে সমাধি ষড়-বিধ। প্রথম ধ্যানযোগ-সমাধি, দ্বিতীয় নাদযোগ-সমাধি, তৃতীয় রসানন্দযোগ-সমাধি, চতুর্থ লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি, পঞ্চম ভক্তিযোগ-সমাধি এবং ষষ্ঠ রাজযোগ-সমাধি। উক্ত গ্রন্থের সপ্তমোপদেশোক্ত ধ্যানযোগ-সমাধি বিবৃত হইতেছে,—

"শাম্ভবীং মুদ্রিকাং কৃত্বা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়েৎ।
বিন্দুব্রহ্ম সকৃদ্দৃষ্ট্বা মনস্তত্র নিয়োজয়েৎ ॥ ৭ ॥
খমধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিদপি বাধ্যতে।
সদানন্দময়ো ভূত্বা সমাধিস্থো ভবেন্নরঃ ॥ ৮ ॥"

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের এই প্রকার অর্থ-বোধ হইয়া থাকে,—"প্রথমতঃ শাম্ভবী-মুদ্রা দ্বারা আত্ম-প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এবং তদন্তে বিন্দু-ব্রহ্ম দর্শন করিয়া, সেই বিন্দু-ব্রহ্মে মনোযোগ করিতে হইবে। অনন্তর শিরস্থিত ব্রহ্মলোকময় আকাশের মধ্যে জীবাত্মাকে

আনিবে এবং শিরস্থিত ব্রহ্মলোকময় আকাশকে জীবাত্মার মধ্যে আনয়ন করিবে; এই প্রকারে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে বিলীন করিয়া নিত্যানন্দময় ও মুক্ত হইতে হইবে। ৭। ৮।” ধ্যানযোগ-সমাধি কথিত হইল। এইবার নাদযোগ-সমাধির বিবরণ বলা যাইতেছে,—

“সাধনাৎ খেরচীমুদ্রা রসনোর্দ্ধগতা সদা।
তদা সমাধিসিদ্ধিঃ স্যাদ্ধিত্বা সাধারণক্রিয়াং ॥ ৯ ॥”

উক্ত নবম শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ,—“খেচরী-মুদ্রা সাধনা-প্রভাবে সর্ব্বদাই স্বীয় রসনাকে ঊর্দ্ধগত করিয়া রাখিতে হইবে। তদ্দ্বারা সাধারণ ক্রিয়া পরিত্যাগ হইয়া সমাধি-সিদ্ধি হয়।” এইবার রসানন্দযোগ-সমাধির বিবরণ বলা যাইতেছে,—

“অনিলং মন্দবেগেন ভ্রামরীকুম্ভকং চরেৎ।
মন্দং মন্দং রেচয়েদ্বায়ুং ভৃঙ্গনাদং ততো ভবেৎ ॥১০॥
অন্তঃস্থং ভ্রামরীনাদং শ্রুত্বা তত্র মনো নয়েৎ।
সমাধির্জায়তে তত্র আনন্দঃ সোঽহমিত্যতঃ ॥১১॥”

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এইরূপ,—“অল্প বেগ-সম্পন্ন প্রাণ-বায়ুর রেচন দ্বারা ভ্রামরী-কুম্ভক অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাণবায়ুর মৃদু রেচন-প্রভাবে দেহাভ্যন্তরে ভৃঙ্গ-নাদ হইতে থাকে। ১০। অন্তরের যথায় ভ্রামরী-নাদ শ্রুত হয়, তথায় মনোনিয়োগ করিতে হইবে। ঐ প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা রসানন্দযোগ-সমাধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা ‘আমি’ই সেই ‘ব্রহ্ম’ বোধ হইয়া থাকে।

সেই 'বোধ' দ্বারা আনন্দ-সম্ভোগ হইতে থাকে। ১১।" রসানন্দযোগ-সমাধি-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া, এক্ষণে লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি-প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাইতেছে। সেই লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি এই প্রকার,—

"যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ।
সুশৃঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি ॥ ১২ ॥
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে ॥ ১৩ ॥"

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ, এই প্রকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে,—"অগ্রে যোনি-মুদ্রাবলম্বনে নিজে শক্তিময় হইতে হইবে; তৎপরে বোধ করিতে হইবে, পরম-পুরুষ বা পুরুষোত্তম-পরমাত্মার সঙ্গে, শক্তি-ভাবাপন্ন নিজের সুশৃঙ্গার-রসযোগে বিহার করিতেছে। ১২। তদ্দ্বারা আনন্দময় হইয়া, ঐ পরম-পুরুষ বা পুরুষোত্তম-পরমাত্মা-ব্রহ্মণের সহিত আপনাকে অভেদ বিবেচনা করিতে হইবে। উক্ত অভেদ বা ঐক্য-বোধাত্মক-লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি হইতেই 'অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং' বোধ হইয়া থাকে। ১৩।" লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি পরে, ভক্তি-যোগ-সমাধি কথিত হইতেছে,—

"স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েদিষ্টদেবস্বরূপকম্।
চিন্তয়েদ্ ভক্তিযোগেন পরমাহ্লাদপূর্ব্বকং ॥ ১৪ ॥
আনন্দাশ্রুপুলকেন দশাভাবঃ প্রজায়তে।
সমাধিঃ সম্ভবেত্তেন সম্ভবেচ্চ মনোন্মনিঃ ॥১৫॥"

উক্ত ভক্তিযোগ-সমাধির ব্যাখ্যা করা যাইতেছে,—"নিজ হৃদয়ে ইষ্টদেবতার 'স্বরূপ' ধ্যান করিতে হইবে; পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক ভক্তি-সংযোগে ঐ প্রকার ধ্যান করার প্রয়োজন। ১৪। তদ্দ্বারা প্রথমতঃ নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু ক্ষরিত হইতে থাকে, তৎসঙ্গে দেহে পুলক প্রকাশিত হয়। কথিত আনন্দাশ্রু ও পুলক-প্রভাবে দশা-ভাব স্ফূরিত হয়। (উক্ত দশা-ভাবকেই দিব্য-ভাব বলা যাইতে পারে। উক্ত দশা-ভাব, দিব্য-ভাব বা মহা-ভাব-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ চৈতন্য-ভাগবতে, চৈতন্য-মঙ্গলে, চৈতন্য-চরিতামৃতে, চৈতন্য-চরিত-মহাকাব্যে এবং চৈতন্য-সম্বন্ধীয় অন্যান্য নানাগ্রন্থে বর্ণিত আছে।) উক্ত দশা-ভাব বা দিব্য-ভাব দ্বারাই ভক্তিযোগ-সমাধি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারাই 'মনোন্মনি' হইয়া থাকে। ১৫।" যে অবস্থায় স্বীয় ইষ্টদেবতা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে মনোনিবেশ থাকে না, সেই অবস্থার নামই 'মনোন্মনি'। পঞ্চ-প্রকার সমাধি সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করিয়া, ষষ্ঠ-সমাধি-সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করা যাইতেছে,—

"মনোমূর্চ্ছাং সমাসাদ্য মন-আত্মনি যোজয়েৎ।
পরাত্মনঃ সমাযোগাৎ সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ ॥১৬॥"

উক্ত শ্লোকের অর্থ এই প্রকার—"মনোমূর্চ্ছা-কুম্ভকাবলম্বনে স্বীয় মন, আত্মাতে যোগ করিতে হইবে। পরাত্মায় বা পরমাত্মায় ঐ প্রকার যোগের জন্যই রাজযোগ-সমাধি-সিদ্ধিতে অধিকার হইয়া থাকে।" এক্ষণে সংক্ষেপতঃ রাজযোগ-সমাধি-প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল। পর-সিদ্ধান্তে সমাধি-সম্বন্ধে বলা হইবে।

বিংশ সিদ্ধান্ত।

সমাধি, বহু-প্রকার। প্রসিদ্ধ অনেক যোগ-শাস্ত্রমতেই প্রধানতঃ সমাধি, দ্বি-ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম, সবিকল্প-সমাধি এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম, নির্ব্বিকল্প-সমাধি। নির্ব্বিকল্প-সমাধিকেই নির্বীজ-সমাধি বলা যাইতে পারে। কেবল ধ্যানানুষ্ঠান-সাধনা দ্বারাও সমাধি হইতে পারে, ভক্তিবশতও সমাধি হইতে পারে, অতিরিক্ত দিব্য-জ্ঞানবশতও সমাধি হইতে পারে, প্রেমবশতও সমাধি হইতে পারে। সেই সমাধির অন্তর্গত অনেক ভাব,—সেইজন্য সম্পূর্ণ দিব্য-দাস্য-ভাববশত সমাধি হইতে পারে, সেইজন্য সম্পূর্ণ দিব্য-সখ্য-ভাববশত সমাধি হইতে পারে, সেইজন্য সম্পূর্ণ দিব্য-বাৎসল্য-ভাববশত সমাধি হইতে পারে, সেইজন্য সম্পূর্ণ দিব্য-মধুর-ভাববশত সমাধি হইতে পারে;—ঈশ্বরের প্রতি পরম-শক্র-ভাববশতও সমাধি হইতে পারে। সমাধি-অবস্থায় মন কোন পার্থিব-ভাবে এবং কোন অনিত্য-ভাবে আবদ্ধ রহে না। সমাধিস্থ-মহাপুরুষ সম্পূর্ণ 'অবদ্ধ'। যে মহাপুরুষের সমাধি হয়, তাঁহার বন্ধনের সহিত কোন সংস্রব রহে না। যাঁহার সমাধি হয়, তিনিই জীবন্মুক্ত-সিদ্ধ-পুরুষ। সাংসারিকতা থাকিতে সমাধিতে অধিকার হয় না। সমাধি-সম্বন্ধে মহাযোগী-ঘেরণ্ড কহিয়াছেন,—

"সমাধিশ্চ পরং যোগং বহুভাগ্যেন লভ্যতে।
গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন প্রাপ্যতে গুরুভক্তিতঃ ॥১॥"

সমাধি সাধনার অধিকারী-সম্বন্ধে মহাত্মা-ঘেরণ্ড কহিয়াছেন,—

"বিদ্যাপ্রতীতিঃ স্বগুরুপ্রতীতি-
রাত্মপ্রতীতির্ম্মনসঃ প্রবোধঃ।
দিনে দিনে যস্য ভবেৎ স যোগী
সুশোভনাভ্যাসমুপৈতি সদ্যঃ ॥ ২ ॥"

মহাত্মা-ঘেরণ্ড তৃতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"ঘটাদ্ভিন্নং মনঃ কৃত্বা ঐক্যং কুর্য্যাৎ পরাত্মনি।
সমাধিং তদ্‌বিজানীয়ান্মুক্তসংজ্ঞো দশাদিভিঃ ॥"

"ঘট বা দেহ হইতে মনকে পৃথককরত, তাহা পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য করিতে হইবে। সেই ঐক্যই, সমাধি। সমাধি দ্বারা সর্ব্ব-দশা বা সর্ব্বাবস্থা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।" সর্ব্ব-দশা হইতে মুক্ত হইলে, জীবের অবশ্যই বন্ধন থাকে না। অতএব সমাধিও জীবের মুক্তির কারণ। 'সমাধি' জীবের মুক্তির কারণ বলিয়া, সমাধি-লাভ-বাসনাও জীবের মঙ্গলের কারণ। অগ্রে জীবের সমাধি-লাভ-বাসনা না হইলে, সমাধি-সাধনা-সম্বন্ধে তাহার প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে সমাধি-লাভ-বাসনার প্রয়োজন। সেইজন্যই অষ্টাবক্রের—

"নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥ ১৫ ॥"

বলা সঙ্গত হয় নাই। মুমুক্ষু-জীবের সমাধি-লাভ-বাসনা হইলে, তাহার মুক্তিলাভের অনেক সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকারে সমাধি বর্ণিত হইল। আপাততঃ সমাধি-সিদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। সমাধি-সিদ্ধ হইলে, এইরূপ বোধ হয়,—

"অহং ব্রহ্ম ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্ ॥ ৪ ॥"

কথিত হইল—"আমিই 'ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহি, ব্রহ্মই 'আমি'। সেইজন্যই 'আমি' অশোক, 'আমি'ই সচ্চিদানন্দরূপ-নিত্য-মুক্ত-স্বভাববান্।" অতএব সমাধি সামান্য নহে, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সমাধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সমাধি দ্বারা আত্মজ্ঞান হয়, সমাধি দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান হয়। সমাধি, সম্পূর্ণ মুক্তির অনুকূল। সেইজন্য সমাধি-সম্বন্ধে দার্শনিক-বিবরণ, পর-সিদ্ধান্তে সন্নিবেশিত হইল। দার্শনিক-যোগ-প্রিয়গণের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী হইতে পারিবে।

একবিংশ সিদ্ধান্ত।

প্রসিদ্ধ পাতঞ্জলদর্শনীয় সমাধি-পাদ কথিত হইতেছে,--

"অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥
যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥
তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩ ॥
বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥
বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥
প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥
প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

বিপর্য্যয়োমিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যোবিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতোদৃঢ়-
ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা
বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥ ১৮ ॥

ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্ ॥ ২০ ॥

তীব্রসম্বেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ
ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥ ২৫ ॥

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯॥

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ॥ ৩০॥

দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহ-ভুবঃ ॥ ৩১ ॥

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-বিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতি-নিবন্ধিনী ॥ ৩৫ ॥

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ॥ ৪০ ॥

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণ গ্রাহ্যেষু
তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা॥ ৪২ ॥

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌস্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা
নির্বিতর্কা ॥ ৪৩ ॥

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া
ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

তত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজঃ
সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥"

উক্ত সমাধি-পাদ সমাপ্ত করিয়া, এক্ষণে সমাধি-পাদের ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে ;—"হিরণ্য-গর্ভ-সম্মত যোগানুশাসন বলা যাই-তেছে। ১। চিত্ত-বৃত্তি সকল নিরোধের নাম, যোগ। ২। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ হইলে, দ্রষ্টা বা সাক্ষী-স্বরূপে অবস্থিত হন্। ৩। সেই অবস্থিতিকালে আত্মার 'স্বরূপ' অপ্রচ্ছন্ন থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তিনি নানা মনোবৃত্তির সহিত সংযুক্ত

থাকায়, তৎস্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে। ৪। পঞ্চ-প্রকার মনোবৃত্তি। সেই পঞ্চ-প্রকার মনোবৃত্তি আবার দ্বি-ধা বিভক্ত হইয়াছে। এক প্রকারের নাম ক্লিষ্ট বা ক্লেশদায়ক এবং অপর প্রকারের নাম অক্লিষ্ট বা ক্লেশনাশক। ৫। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিকেই পঞ্চ-প্রকার মনোবৃত্তি বলা যায়। ৬। প্রমাণ-বৃত্তির অন্তর্গত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ৭। যাহা ভ্রমাত্মক মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রম অপনীত হইলে যে জ্ঞান স্থায়ী হয় না, সেই জ্ঞানকে 'বিপর্য্যয়' বলা যাইতে পারে। ৮। বস্তু না থাকিলেও তন্নামাত্মক-শব্দ-জনিত যে এক প্রকার মনোবৃত্তি স্ফূরিত হয়, সেই মনোবৃত্তিকে 'বিকল্প' বলিলে ভুল হয় না। যেমন খ-পুষ্প না থাকিলেও, তাহা বলিবামাত্র মনে এক প্রকার বৃত্তির উদয় হয়। ৯। অজ্ঞানা-লম্বিত স্বপ্রকাশ মনোবৃত্তি 'নিদ্রা'। ১০। প্রত্যেক অনুভূত বিষয়ই চিত্তে অঙ্কিত হইয়া আছে; ঐ প্রকার অঙ্কিত হইয়া থাকারই অপর নাম 'স্মৃতি'। ১১। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য-সাহায্যে প্রত্যেক মনোবৃত্তিই নিরুদ্ধ হইতে পারে। ১২। চিত্ত স্থির করিবার জন্য রজস্তমোবৃত্তি-শূন্য যে যত্ন, তাহাকেই 'অভ্যাস' কহা যায়। ১৩। প্রযত্ন-সহকারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল ঐ প্রকার অভ্যাস করিতে করিতে, তবে তাহা সুদৃঢ় ও নিশ্চল হয়। ১৪। যাঁহার সমস্ত শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, যিনি সমস্ত দৃষ্ট-বিষয়ে বীত-স্পৃহ হইয়াছেন; তাঁহারই বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। ১৫। ঐ প্রকার পরম-বৈরাগ্য স্ফূরিত হইলে, প্রকৃতি-পুরুষ যে পরস্পর অভেদ নয়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞান-

প্রভাবে প্রাকৃতিক গুণ-নিচয়ের প্রতিও বীত-স্পৃহ হইতে হয়।১৬। যে সংশয়-বিপর্য্যয়-বিরহিত-সম্প্রজ্ঞান-সমধিবলে ভাব্য-বস্তু-বিষয়ক-জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না,—বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা-ক্রমে তাহা চারি ভাগে বিভক্ত। ১৭। প্রবল-বৈরাগ্যবশত যখন সমস্ত চিত্ত-বৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তখন চিত্ত প্রত্যেক সংস্কার-পরিশূন্য হয়; সেই অবলম্বন-রহিত অপূর্ব্বাবস্থাকেই অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি বলা যায়। ১৮। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি-মূলক বিদেহ-লয় কিম্বা প্রকৃতি-লয়, উভয়ই মুক্তির কারণ হয় না। যেহেতু উভয়ই অবিদ্যা-পরিশূন্য নহে। নিদ্রার পর জাগরণ হইলে যেমন নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তদ্রূপ ঐ উভয়বিধ অনাত্ম-লয়ের পরেও চিত্ত পুনঃ পুনঃ সাংসারিক-ব্যাপারে আসক্ত হয়। ১৯। যিনি যোগ-সম্বন্ধীয় শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধিবলে, অতুল প্রজ্ঞালাভ করিয়াছেন, তিনিই মুক্ত হইয়াছেন। কোন প্রাকৃতিক-প্রলোভন আর তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না। তিনি বিদেহ-লয় এবং প্রকৃতি-লয়-বিহীন-উপায়-প্রত্যয়-শীল-নিত্য-মুক্ত-যোগী হইয়াছেন। তিনিই চিরকালের জন্য স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ২০। তীব্র-কার্য্য-শক্তি-সম্পন্ন-সংস্কারের নাম 'সম্বেগ'। তীব্র-সম্বেগশালী-যোগীরই শীঘ্র সমাধি হয়। ২১। মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র-ভেদে তিন প্রকার 'সম্বেগ' আছে। মৃদু-সম্বেগশীল-যোগীর সমাধি বিলম্বে হয়। মধ্য-সম্বেগশালী হইলে, তদপেক্ষা শীঘ্র হয়। যাঁহার অধিমাত্র-সম্বেগ হইয়াছে, অতি শীঘ্রই তিনি সমাধি-মগ্ন হন্। ২২। শুদ্ধ-ভক্তি-সহকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিলেও সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির অধিকারী হওয়া যায়। ২৩। যে পরম-পুরুষকে বা

পুরুষোত্তমকে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক বা কর্ম্মফল এবং আশয়, অধীন করিতে পারে না, যিনি সর্ব্বাত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তিনিই ঈশ্বর। ২৪। যিনি ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ—তাঁহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ব-বীজ নিহিত আছে। ২৫। সেই ঈশ্বর, ব্রহ্মার এবং সমস্ত দেবগণেরও গুরু। তিনি চিরকাল আছেন, সেইজন্যই তিনি 'নিত্য'। ২৬। সেই ঈশ্বর, ওঙ্কারের বাচ্য। তাঁহার নাম, ওং বা ওঁ। ২৭। ঈশ্বর-বাচক ওঙ্কার বা প্রণব জপ করিতে করিতে, ঈশ্বর-বাচক ওঙ্কার বা প্রণবের অর্থ ভাবিতে ভাবিতে—সেই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। সম্যক্-একাগ্রতার উদয়ে ঐ প্রকার জপ দ্বারা সমাধি হয়। ২৮। নিয়ত ওঙ্কার বা প্রণব-জপ এবং তদর্থ ভাবনা করিলে, সমস্ত যোগ-বিঘ্নই অপসারিত হয়—ক্রমে সমল-চিত্ত অমল হয়; নিজ দেহের মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁহাকে জানা যায়, তাঁহাকে জানিলে স্বভাবতঃ সমাধি-শক্তির স্ফূরণ হয়। ২৯। ব্যাধি, স্ত্যান বা (সমাধিস্থ হইবার ইচ্ছার অভাব না থাকিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতার অভাব), সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি বা অনিবার্য্য-বিষয়াসক্তি, ভ্রান্তি-দর্শন বা ভ্রান্তি-মূলক-অনিত্য-জ্ঞান, অলব্ধ-ভূমিকত্ব এবং অনবস্থিতত্ব বা নানা বিঘ্নবশত যোগ-শক্তির অপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষম-বিঘ্ননিচয়-প্রভাবে সমাধিলাভ করা যায় না। ঐ সকল চিত্ত বিক্ষেপের বিশেষ অন্তরায়। ৩০। দুঃখ, শারীরিক-কম্প, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং ইচ্ছার ব্যঘাত-জনিত ক্ষোভ হইতে যে মনোবিকার উপস্থিত হয়, তাহা সমাধি-সম্বন্ধে মহা-বিঘ্ন। ৩১। ঐ সকল প্রতিবন্ধক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এক্-তত্ত্বাভ্যাস

বা একাগ্রভাবে একমাত্র ঈশ্বরের ধ্যানই অভ্যাস করিতে হইবে। ৩২। অন্যের সুখে সুখ-বোধ হইলে, অন্যের দুঃখে দয়া হইলে, অন্যের পুণ্যে হর্ষ হইলে এবং অন্যের পাপে উপেক্ষা করিলে, চিত্তে যে এক অপূর্ব্ব অমল-ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার তুলনা নাই। সে ভাব প্রফুল্লতাময়-চিত্ত-প্রসাদ। সেই ভাবময়-চিত্ত-প্রসাদই সমাধির জনক। ৩৩। পুনঃ পুনঃ বহির্বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে অন্তরে ধারণ করিয়া পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিলেও চিত্ত-স্থির হইতে পারে। চিত্ত-স্থির হইলে একাগ্র হওয়া যায়। ৩৪। দিব্যজ্ঞানময়ী-সর্ব্ব-বিষয়বতী-প্রবৃত্তি-প্রভাবে সর্ব্ব-তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া, সর্ব্ব-তত্ত্ব-ময়-চিত্ত করিতে পারিলেও তাহা সুস্থির হয়; সেই সুস্থির-চিত্ত এরূপ সুনির্ম্মল হয়, যে তৎপ্রভাবে দিব্য-গন্ধ আঘ্রাণ করা যায়, দিব্য-শব্দ শ্রবণ করা যায়, দিব্য-রস আস্বাদন করা যায়, দিব্য-রূপ দর্শন করা যায়, দিব্য-সুখ অনুভব করা যায়। এই সকল ফল প্রত্যক্ষ করিলে স্বভাবতঃ আরও যোগানুশীলনে চিত্ত সুদৃঢ় হয়। ৩৫। মনোস্থির হইলে এক্ প্রকার অপরূপ জ্যোতি-দর্শন হয়। সে জ্যোতির তুলনা নাই। তাহা যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি চিরকালের জন্য অশোক হইয়াছেন। তিনি সেই জ্যোতিষ্মতী-সাত্ত্বিকী-বুদ্ধি-প্রভাবে সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির অধিকারী হইয়াছেন। ৩৬। পরম-বৈরাগীদিগের বৈরাগ্য-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও চিন্তা করিলে, চিত্ত-স্থির হয়। চিত্ত-স্থির হইলে, সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির আর বিলম্ব থাকে না। ৩৭। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন-যোগে কোন দিব্য-মূর্ত্তি দর্শন অথবা অপ্রাকৃত-সুখানুভব হইলে,

জাগিবামাত্র যদি সেই দিব্য-মূর্ত্তি এবং অনুভূত-সুখচিন্তা করা যায়, তাহা হইলেও একাগ্র-চিত্ত হওয়া যায়। ৩৮। নিজাভিমত যে কোন দিব্য-বস্তু ধ্যান কর না কেন, তৎপ্রভাবে অবশ্যই একাগ্রতা-শক্তি প্রবল হইবে। ৩৯। উক্ত অভ্যাসগুলি সুনির্ম্মল-স্থির-চিত্ত হইলে, অতি ক্ষুদ্র-পরমাণু হইতে পরম-মহৎ-পরমাত্মাকে পর্য্যন্তও বশে আনা যায়। ৪০। অতি স্থূল হইতে যখন অতি সূক্ষ্ম-বস্তুতে পর্য্যন্ত মনোস্থির করিবার যোগ-সাধকের সামর্থ্য হইবে, তখনি ঈশ্বরে মনোলয় হইবে। তখন কোন বস্তুতে বা কোন তত্ত্বে মনোস্থির করিতে হইলে, বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। যখন সম্যক্-প্রকারে মনোবশ হইবে, তখন আর একাগ্রতা অভ্যাসের প্রয়োজনও হইবে না। তখন কোন স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম-জ্ঞেয়াবলম্বনে মনোস্থির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। তখন নির্ম্মল-স্ফটিক যেমন—যখন যে বর্ণের যে পদার্থের সন্নিহিত করা হয়, তখন তাহা যেমন সেই বর্ণের সেই পদার্থে রঞ্জিত হইয়া যায়; তদ্রূপ অদ্ভুত একাগ্রতা-বলে নিবৃত্তিক-নির্ম্মল-চিত্ত-বৃত্তি সর্ব্ব-বস্তুতে, সর্ব্ব-বিষয়ে, এমন কি ঈশ্বরে পর্য্যন্ত নিবেশিত হইতে পারে এবং তন্নিবন্ধন ফলভোগও করিতে পারে। কাষ্ঠ অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইলে, অগ্নির ন্যায় কাষ্ঠও দাহ করে। তখন অগ্নি যে সকল ফলভাগী, কাষ্ঠও সেই সকল ফলভাগী হয়। ঐ প্রকারে নিবৃত্তিক-নির্ম্মল-চিত্ত যখন যে বস্তুতে সংযুক্ত হয়, তখন তাহা সেই বস্তুরই ফলভাগী হয়। ৪১। ঐ সকল সমাপত্তির বা তন্ময়তার মধ্যে যে সমাপত্তি শব্দ, অথবা যে সমাপত্তির বা তন্ময়তার অর্থ ধ্যাতার স্পষ্ট বোধ হয় না, সেই সমাপত্তির বা তন্ময়তার নামই

সবিতর্ক-সমাধি। ৪২। ধ্যাতা, ধ্যেয়-বস্তু-বাচক শব্দার্থ বিস্মৃত হইলে, কেবলমাত্র তাঁহার চিত্তে ধ্যেয় প্রকাশিত থাকেন। সেই কেবলমাত্র ধ্যেয়-বস্তুর প্রকাশকেই নির্ব্বিতর্ক-সমাধি বলা যায়। ৪৩। কথিত সবিতর্ক-নির্ব্বিতর্ক-সমাধির ব্যাখ্যা দ্বারা সূক্ষ্ম-বিষয়ক সবিচার-নির্ব্বিচার-সমাধিও নির্ণয় করা হইয়াছে। ৪৪। সূক্ষ্ম-বিষয়ক সবিচার ও নির্ব্বিচার-সমাধি, প্রকৃতি অতিক্রম করিতে পারে না। প্রকৃতি পর্য্যন্তই তাহাদের সীমা। ৪৫। ঐ সকল সমাধি, সবীজ-সমাধির বা যে সমাধির অবসানে পুনর্ব্বার সংসারাসক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়, সেই সমাধির অন্তর্গত। ৪৬। নির্ব্বিচার-সমাধি-প্রভাবে সুবিমল-চিত্ত হইলে, সর্ব্ব-প্রকাশক অধ্যাত্ম-প্রসাদ লাভ হয়। সেই অধ্যাত্ম-প্রসাদেরই অপর নাম অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। ৪৭। সেই অধ্যাত্ম-প্রসাদ বা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবলে, ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা বা যে প্রজ্ঞাবলে কেবল সত্যই প্রকাশিত হয়, সেই প্রজ্ঞা স্ফূরিত হয়। ৪৮। শ্রুতানুমান-জাত-প্রজ্ঞা বা ইন্দ্রিয়-জনিত-প্রজ্ঞা বা অনুমান-প্রসূত-প্রজ্ঞা অথবা অন্য কোন প্রকার প্রজ্ঞাই সর্ব্বজ্ঞানময়ী-সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশিকা-সর্ব্বশক্তিশালিনী-ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞার সমতুল্য নহে। ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা। তাহার সহিত অন্য কোন প্রজ্ঞারই তুলনা হইতে পারে না। ৪৯। সেই ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা-প্রসূত-সংস্কার-বলে সমস্ত পূর্ব্ব-সংস্কারই বিনষ্ট হয়। ৫০। তৎপ্রভাবে সমস্ত পূর্ব্ব-সংস্কার বিনষ্ট হইলে, তাহাও নিরুদ্ধ হয়। তাহা নিরুদ্ধ হইলে, সর্ব্ব-নিরোধক-নির্বীজ-সমাধির আবির্ভাব হয়। নির্বীজ-সমাধি বা বীজ-শূন্য-সমাধি বা যে সমাধিতে চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত-বৃত্তির অভাব হয়,

সেই সমাধি হইলে, চিত্ত সর্ব্ব-বৃত্তি-শূন্য হয়। তখন তাহার কোন গুণ ও কোন ক্রিয়া থাকে না। তখন তাহা আপনার প্রসৃতি—মূল-প্রকৃতিতে লয় হয়। তখন আত্মাও নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হইয়া 'কেবলমাত্র' হন্। ৫১।" সমাধি-পাদের উক্ত শেষ সূত্রানুসারে নির্বীজ-সমাধিবশত নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হইতে হয়। অতএব সমাধি, জীবত্ব হইতে মুক্ত হইবারই উপায়। সেইজন্য সমাধি-প্রাপ্তির অনুকূল যাহা, তাহাও মুক্তির অনুকূল বলিতে হইবে। সেইজন্য জনকের প্রতি অষ্টাবক্রের—

"নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥ ১৫ ॥"

বলা উচিত হয় নাই। কারণ সমাধিবশত মুক্তি হয় বলিয়া, সমাধির জন্য বাসনাও মুক্তির অনুকূল। ঐ প্রকার বাসনাকে কখনই বন্ধন অথবা বন্ধনের কারণ বলা যায় না।

দ্বাবিংশ সিদ্ধান্ত।

ষোড়শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

"ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥"

উক্ত শ্লোকের অর্থ এই প্রকার,—"তুমি এই বিশ্বে ব্যাপ্ত। যথার্থতঃ বিশ্ব তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। ক্ষুদ্র-চিত্ততা ত্যাগ কর। তুমি যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপ।" জনক কর্তৃক যদ্যপি এই বিশ্ব ব্যাপ্ত থাকিত, তাহা হইলে সেই ব্যাপ্তি-সম্বন্ধে জন-

কের জ্ঞানও থাকিত। নানাশাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম কর্ত্তৃকই বিশ্ব-ব্যাপ্ত। নানাশাস্ত্রানুসারে সেই ব্রহ্ম, বদ্ধ নহেন্। নানা-শাস্ত্রানুসারে সেই ব্রহ্ম, আত্মজ্ঞান-বিহীন নহেন্। জনকের নিজ বাক্যানুসারে এবং অষ্টাবক্রের বাক্যানুসারে জনক, বদ্ধ ও অনাত্মজ্ঞানী ছিলেন। অতএব তিনি বিশ্ব-ব্যাপ্ত ছিলেন, স্বীকার করা যায় না। পরিমিত-দেহবিশিষ্ট পরিমিত জনকে বিশ্ব অধিষ্ঠিত ছিলও বিশ্বাস করা যায় না। পরিমিত-জনকে যদ্যপি বিশ্ব অধিষ্ঠিত ছিল বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে আমাতেও বিশ্ব অধিষ্ঠিত আছে, বিশ্বাস করিতে পার। কারণ বেদান্তানুসারে জনকে ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই। তোমার ঐ প্রকার বিশ্বাস হইয়াছে—তুমি নিজে বলিলেও আমি তাহা স্বীকার করিব না; কারণ এই বিশ্ব আমাতে অধিষ্ঠিত থাকিলে, আমি তাহা অবশ্যই বুঝিতাম এবং অন্যান্য সকলেও তাহা অবশ্যই দর্শন করিতেন। বেদান্ত প্রভৃতিমতে বুদ্ধিও প্রাকৃত। অতএব বেদান্ত প্রভৃতিমতে অবশ্যই বুদ্ধি, সত্য ও নিত্য নহে। যাহা প্রাকৃত, তাহা অদ্বৈতমতের কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থমতেই 'শুদ্ধ' নহে। অদ্বৈতমতের সর্ব্ব-গ্রন্থানুসারে আত্মাই কেবল 'শুদ্ধ'। সে সকল গ্রন্থের কোন গ্রন্থমতেই অনাত্মা 'শুদ্ধ' নহে। সেইজন্য অনাত্মা-বুদ্ধিকেও 'শুদ্ধ' বলা যায় না, সুতরাং অষ্টাবক্রের 'শুদ্ধ-বুদ্ধ' শব্দও ব্যবহার করা উচিত হয় নাই। অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক জনককে 'শুদ্ধ-বুদ্ধ' বলা হইয়াছে বলিয়া, জনককেও প্রাকৃত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে—সেইজন্য জনককে অনাত্মা বলিয়াও স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ অদ্বৈতমতে আত্মা 'বুদ্ধ'ও নহেন্, 'শুদ্ধ-বুদ্ধ'ও নহেন্। সমস্তই

আত্মা স্বীকার করিলে, জনককেও 'বুদ্ধ' বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জনককে 'শুদ্ধ-বুদ্ধ' বলিয়াও স্বীকার করা যায়। জনককে শুদ্ধ-বুদ্ধের 'স্বরূপ' স্বীকার করিলেও জনককে অনাত্মা বলিতে হয়, কারণ শুদ্ধ-বুদ্ধের 'স্বরূপ' যাহা, অদ্বৈত-মতে এবং পাতঞ্জলদর্শনমতে তাহা অনাত্মা বা প্রকৃতি। জনক তাহা স্বীকার করিলেও জনককে আত্মা বলা যায় না। বাস্তবিক অষ্টাবক্রের যদ্যপি জনককে বিশ্ব-ব্যাপ্ত, জনকেতে বিশ্ব-অবস্থিত এবং জনক 'শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপ' ধারণা হইত, তাহা হইলে তিনি ঐ প্রকার মহান্-জনককে ক্ষুদ্র-চিত্তবিশিষ্ট বোধ করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র-চিত্ততা পরিহার করিতে বলিতেন না। মহান্-ব্রহ্মই বিশ্ব-ব্যাপ্ত। তিনি নির্ব্বিকার, সুতরাং তাঁহার ক্ষুদ্র-চিত্ততাও নাই। জনক যদ্যপি ঐ মহান্-ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার ক্ষুদ্র-চিত্ততা রহিত না, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার কোন প্রকার বিকার রহিত না, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং মুক্তির প্রয়োজনও হইত না। কারণ সর্ব্বশক্তিমান-সম্পূর্ণ-ব্রহ্মে কিছুরই অভাব নাই। সেইজন্য তিনি ব্রহ্মের সহিত অভেদ ছিলেন, অবশ্যই বলা যায় না।

ত্রয়োবিংশ সিদ্ধান্ত।

সপ্তদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"নিরপেক্ষো নির্ব্বিকারো নির্ভয়ঃ শীতলাশয়ঃ।
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥"

উক্ত শ্লোকের অভিপ্রায় এই প্রকার হইতে পারে,—"তুমি নিরপেক্ষ, নির্ব্বিকার, নির্ভয়, শীতলাশয়, অগাধ-বুদ্ধি, অক্ষুব্ধ এবং চিন্মাত্র-বাসনাবিশিষ্ট হও।" উক্ত শ্লোকে জনককে নির্ব্বিকার হইতে বলা হইয়াছে। অথচ তাঁহাকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো!
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা॥"

উক্ত দুই শ্লোকানুসারে, জনককে প্রকারান্তরে নির্ব্বিকারই বলা হইয়াছে। তবে তাঁহাকে উপরোক্ত সপ্তদশ শ্লোকে পুনর্ব্বার নির্ব্বিকার হইতে বলা হইয়াছে কেন? ভয়ও এক প্রকার বিকার। নির্ভয় যিনি, তিনিই নির্ব্বিকার। উক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকানুসারে জনককে নির্ব্বিকার বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। অতএব সেইজন্য তাঁহাকে নির্ভয় বলিয়াও প্রমাণ করা হইয়াছে। যাঁহার কোন প্রকার আশাতে আস্থা নাই, তিনিই নির্ব্বিকার। যিনি কোন প্রকার আশাশীল নহেন্, তিনিই নির্ব্বিকার। সেইজন্য অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক যে জনককে নির্ব্বিকার হইতে বলা হইয়াছে, আবার তাঁহাকেই অষ্টাবক্রের শীতলাশয় হইতে বলা সঙ্গত হয় নাই। নির্ব্বিকারের বুদ্ধির সহিত কোন সংস্রব নাই। সেইজন্য উক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে যিনি নির্ব্বিকাররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাকে অগাধ-বুদ্ধি বলাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই। নির্ব্বিকারের কোন বাসনা

থাকে না। কারণ বাসনাও এক প্রকার বিকার। সেইজন্ত উক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে নির্ব্বিকার-প্রমাণিত-জনককে ‘চিন্মাত্রবাসনঃ’ বলাও যায় না। অষ্টাবক্রেরই কোন কোন শ্লোকানুসারে জনকই আত্মা। অতএব সেইজন্য তাঁহাকে ‘চিন্মাত্রবাসনঃ’ বলা উচিত হয় নাই। কারণ অদ্বৈত-মতের অনেক গ্রন্থমতেই আত্মা ‘চিৎ’। অষ্টাবক্রও তাঁহার অষ্টাবক্র-সংহিতা গ্রন্থের প্রথম-প্রকরণীয় তৃতীয় শ্লোকে আত্মাকে ‘চিদ্রূপং’ কহিয়াছেন। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অনেক গ্রন্থের অনেক শ্লোকানুসারেও আত্মা ‘চিৎ’।

চতুর্ব্বিংশ সিদ্ধান্ত।

অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

“সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ॥”

উক্ত শ্লোকের অর্থানুসারে বুঝিতে হয়,—“সাকার, অসত্য—নিরাকার, নিশ্চল বা সত্য। এই তত্ত্বোপদেশ-প্রভাবে পুনর্জন্ম হয় না।” সাকার অসত্য স্বীকৃত হইলে, নিরাকারকেও অসত্য বলিতে হয়। কারণ সাকার যাহা, তাহাই আকার-বিশিষ্ট নিরাকার। সেইজন্য সাকার মিথ্যা নহে। অষ্টাবক্র এবং জনকেরও আকার ছিল। তাঁহারাও আকারবিশিষ্ট সাকার-নিরাকার ছিলেন। আমাদের প্রত্যেকেরও আকার আছে। আমরা প্রত্যেকেই আকারবিশিষ্ট সাকার-নিরাকার। অতএব আকার, সাকার এবং নিরাকার, এই তিনই সত্য বলিতে

হয়। নিরাকারকে 'সত্য' বলিয়া নিজে অষ্টাবক্রও স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহার মতে সাকার, অসত্য। আমরা প্রমাণ করিয়াছি—আকার, সাকার এবং নিরাকার, এই তিনই সত্য। আমরা যে সাকার, তাহা স্পষ্টই বুঝিতেছি। আমাদের আকার, আমরা আপনারই দর্শন করিতেছি। অতএব সেইজন্য আকারাভাব স্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক-যুক্তি, বিশ্বাস-যোগ্য নহে। তবে প্রত্যক্ষের সহিত যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে, আমরা সেই যুক্তিই বিশ্বাস করি। 'সোঽহং' অর্থাৎ 'আমি-সেই' এবং 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমি-সেই,' আনুমানিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে; কিন্তু 'সোঽহং' এবং 'তত্ত্বমসি' প্রত্যক্ষ-যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে না। আমি কথায় মাত্র 'আমি-সেই' বা 'সোঽহং,' 'আমি-শিব' বা 'শিবোঽহং,' 'আমি-বিষ্ণু' বা 'অহংবিষ্ণু' বলিতে পারি; কিন্তু 'আমি-সেই' বা 'সোঽহং' জ্ঞান দ্বারা বুঝি না। তুমি কথায় মাত্র 'তুমি-সেই' বলিতে পার; কিন্তু তুমি—'তুমি-সেই' বলিবার বা 'তত্ত্বমসি' বলিবার তাৎপর্য্য বুঝ না। উহা তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে হয়। যদি বল, আত্মজ্ঞান লাভ হইলে 'আমি-সেই' বা 'সোঽহং' বুঝিব—যদি বল, আত্মজ্ঞান লাভ হইলে 'তুমি-সেই' বা 'তত্ত্বমসি' বলিবার তাৎপর্য্য বুঝিবে, তাহা তোমার বলা উচিত নহে। কারণ অদ্বৈতমতানুসারে আত্মার বা ব্রহ্মের সহিত আমি-আত্মার এবং তুমি-আত্মার কোন প্রভেদ না থাকিলে, আমি-আত্মা বা আমি-ব্রহ্ম, তুমি-আত্মা বা তুমি-ব্রহ্ম-সম্বন্ধে আমার এবং তোমার অজ্ঞান

থাকিতে পারে না। তাহা হইলে আমি-তুমি-আত্মার নিয়ত 'সোঽহং' এবং 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান থাকা উচিত। তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে কখনই ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নহে। অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণীয় উক্ত অষ্টাদশ শ্লোকানুসারে নিরাকারই নিশ্চল—নিরাকারই সত্য। আকাশ—নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহাত সত্য নহে। বায়ু—নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহাত সত্য নহে। মন—নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহাত সত্য নহে। বুদ্ধি—নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহাত সত্য নহে। অহঙ্কার—নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহাত সত্য নহে। প্রত্যেক মনোবৃত্তিও নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহাদের কোনটীইত সত্য নহে। শব্দ—নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহাওত সত্য নহে। উক্ত সকল দৃষ্টান্তানুসারে বহু-প্রকার বহু-নিরাকার উদাহৃত হইয়াছে। অতএব সেইজন্যই অদ্বৈতমতে নিরাকারকেও অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ বলিতে হয়। অদ্বৈতমতে কেবল আত্মারই বহু-প্রকারতা নাই; কিন্তু সেমতে অনাত্মারই বহুত্ব এবং বহু-প্রকারতা আছে। পূর্ব্বে নিরাকারেও বহুত্ব এবং বহু-প্রকারতা প্রদর্শন হইয়াছে। সেইজন্য নিরাকারকেও অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক জড়ও নিশ্চল। নিরাকারকে নিশ্চল বলিয়া কি তাহাকেও এক প্রকার জড় বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই? অষ্টাবক্র 'নিরাকারস্তু নিশ্চলম্' বলিয়াছেন বলিয়া, নিরাকারকেও প্রকারান্তরে জড় বলিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-মতে অনেক জড়-পরমাণু আছে। সে সকলের প্রত্যেকটীই

নিরাকার। তবে অষ্টাবক্রের নিশ্চল-নিরাকার কি এক প্রকার জড়-পরমাণু? অচল শব্দার্থে, পর্ব্বতও বলা যাইতে পারে। অচল এবং নিশ্চল শব্দের একই অর্থ। তবে কি নিশ্চল-নিরাকারার্থে 'পর্ব্বত-নিরাকার' বুঝিতে হইবে? যদি বল নিরাকার—অদৃশ্য, পর্ব্বত—দৃশ্য, অতএব সেইজন্য অষ্টাবক্রের মতে নিশ্চল-নিরাকার—'পর্ব্বত-নিরাকার' নহে বলিলেও তুমি বলিতে পার। কিন্তু নিরাকার শব্দার্থে কি কেবল অদৃশ্যই বুঝিতে হয়? নিরাকার শব্দের কি অন্য কোন প্রকার অর্থ নাই?—অবশ্যই আছে। নিরাকার শব্দার্থে 'যিনি আকার নহেন্'ও হইতে পারে। 'যিনি আকার নহেন্' বলিলে, 'যিনি 'সাকার' বুঝিলেও বুঝা যায়। পর্ব্বতেরও আকার আছে। সুতরাং পর্ব্বত অবশ্যই আকারবিশিষ্ট। অতএব সেইজন্য পর্ব্বতকেও 'সাকার' বলা যায়। কারণ আকারবিশিষ্ট যাহা, তাহাই 'সাকার'; সুতরাং নিশ্চল-নিরাকারার্থে 'সাকার-পর্ব্বত'ও হইতে পারে। নিরাকার শব্দে যদ্যপি 'যাঁহার আকার নাই' স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নিরাকার শব্দের অর্থ, 'আকার' বুঝিবার পক্ষেই বা বাধা কি? কারণ 'যাঁহার আকার নাই' অর্থে, 'যিনি আকার নহেন্'ত বুঝিতে হয় না। নিরাকার শব্দের অর্থ যদ্যপি 'যিনি আকার নহেন্' করা হয়, তাহা হইলেও নিরাকার শব্দার্থে 'যিনি সাকার' ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অষ্টাবক্র যদ্যপি 'সমস্তই ব্রহ্ম'—অবধূত-দত্তাত্রেয়-কথিত 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি' এই বাক্যানুসারে স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কথিত নিরাকারকে নিশ্চল বলার জন্য, আমাদের কোন আপত্তিই

হইত না। তাহা হইলে আমরা ভাবিতাম—যে ব্রহ্ম 'সমস্ত' তিনি অবশ্যই নিশ্চল-নিরাকারও বটেন।

পঞ্চবিংশ সিদ্ধান্ত।

একোনবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"যথৈবাদর্শমধ্যস্থে রূপেঽন্তঃ পরিতস্তু সঃ।
তথৈবাস্মিন্ শরীরেঽন্তঃপরিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥"

মুকুর মধ্যে যে সামগ্রী প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা সেই মুকুর মধ্যে রহে না। পরমেশ্বর শরীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছেন স্বীকার করিলেও, তিনি শরীরাভ্যন্তরে আছেন, স্বীকার করা যায় না। আকারই কোন স্বচ্ছ-পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আকার, জড়। অজড়-নিরাকারকে জলে, দর্পণে বা অন্য কোন স্বচ্ছ-পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইতে কেহ কখন দর্শন করেন নাই। অজড়-নিরাকার প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে স্বীকার করিলে, অজড়-নিরাকারও 'আকার' স্বীকার করিতে হয়; কারণ আকারই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আকারও জড়। সেই আকার যে স্বচ্ছ-পদার্থে প্রতিবিম্বিত হয়, সে স্বচ্ছ-পদার্থও জড়। কোন প্রকার জড়-স্বচ্ছ-পদার্থে অজড়-চৈতন্য-পরমেশ্বরের প্রতিবিম্বিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অষ্টাবক্রের মতানুসারে, তোমরা যদ্যপি একান্তই শরীরে পরমেশ্বর প্রতিবিম্বিত রহিয়াছেন বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তোমরা অবশ্যই সেই পরমেশ্বরকে 'আকার' বলিয়াই স্বীকার কর। কারণ পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, আকার ব্যতীত

এবং জড় ব্যতীত অন্য কিছুই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। অতএব সেইজন্য অনাকার-নিরাকারও প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না, স্বীকার করিতে হয়। তোমাদের মতে, পরমেশ্বর দেহে প্রতিবিম্বিত আছেন স্বীকার করিলে, তিনিও অন্ত-বিশিষ্ট-আকার অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে তিনিও জড় অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আকার যাহা, তাহা অনন্ত নহে—কে না জানে? জড় যাহা, তাহাও অনন্ত নহে—কে না জানে? তোমাদের অষ্টাবক্রের নির্দ্দেশানুসারে পরমেশ্বরকে অবশ্যই জড়াকার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জড়াকার যে 'নিষ্ক্রিয়' তাহা আমরা দর্শন করিয়া থাকি। তুমিও পরমেশ্বরকে 'নিষ্ক্রিয়' বলিয়াই অবশ্য স্বীকার কর। কারণ তোমার মতে ঐ পরমেশ্বর অবশ্যই 'ব্রহ্ম'। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম 'নিষ্ক্রিয়' বলিয়াই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অতএব সেই-জন্য তুমিও ঐ পরমেশ্বরকে অবশ্য 'নিষ্ক্রিয়' বলিয়াই জান। উক্ত প্রকার নিষ্ক্রিয়-পরমেশ্বরে, পতিতের কি প্রয়োজন আছে? সে পরমেশ্বরত পতিতকে উদ্ধার করিতে পারেন না। কারণ উদ্ধার করাও এক প্রকার কার্য্য। কার্য্যই ক্রিয়া। যিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি অবশ্যই পতিতকে উদ্ধার করিতে পারেন না। সেইজন্য তিনি অবশ্যই পতিতপাবনও নহেন্। উক্ত প্রকার নিষ্ক্রিয়-পরমেশ্বরকে দয়াময়ও বলিতে পার না। কারণ, দয়া করাও এক প্রকার কার্য্য। পতিতপাবন-দয়াময়-পরমেশ্বর, 'সগুণ-সক্রিয়'। সেই পরমেশ্বরের কাছেই পতিতের বড় আশা-ভরসা আছে। সেই পরমেশ্বরই পতিতোদ্ধার জন্য এই পৃথি-বীতে কতবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই পরমেশ্বরই

পতিতোদ্ধার জন্য, তাঁহার ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বারম্বার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেইজন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান-শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা-অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রানায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥"

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের নির্দ্দেশ ব্যতীত, ভূভার-হারী-শ্রীকৃষ্ণ-পরমেশ্বরের অবতার হইবার অন্যান্য বহু কারণও আছে। সেই ভূভার-হারী-করুণাময়-ভক্তবৎসল-পরমেশ্বরে, ভক্তিযোগ দ্বারাই ভক্ত তাঁহাতে মিলিত হন্। সেইজন্য ভক্তিযোগের বিশেষ মাহাত্ম্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান-শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ভক্তিযোগ এই প্রকার—

"অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫ ॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ৭ ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮ ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯ ॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০ ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১ ॥
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২ ॥
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩ ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৪॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকোলোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥১৫॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৬॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৭॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥১৯॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥২০॥"

উক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত ভক্তিযোগ সমাপ্ত হইল। এক্ষণে উক্ত ভক্তিযোগের অর্থ বিবৃত হইতেছে,—"অর্জ্জুন কহিলেন, যে সমস্ত ভক্ত তোমাকে সতত-যুক্ত হইয়া তোমাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা এবং যাঁহারা অক্ষরাব্যক্তকে উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যোগ-বিত্তম? ১। শ্রীভগবান বলিলেন, আমাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিত্যযুক্ত হইয়া, সতত পরমা শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা আমার অর্চ্চনা করেন,

আমার বিবেচনায় তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যুক্ততম। ২। যে সমস্ত সর্ব্ব-ভূত-হিতে-রত-সর্ব্বত্র-সমবুদ্ধি-সম্পন্ন-ব্যক্তিগণ, ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া, সর্ব্বত্র-গমনশীল, অচিন্ত্য, অচল, কূটস্থ, ধ্রুব এবং অনির্দ্দেশ্য-অক্ষরাব্যক্তকে উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকে লাভ করেন। ৩—৪। অব্যক্তাসক্ত-চিত্ত-ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে; কারণ, দুঃখেই দেহীগণ অব্যক্ত-প্রদা গতি প্রাপ্ত হন্। ৫। যে সকল ব্যক্তি আমাকে সর্ব্ব-কর্ম্ম এবং সেই সর্ব্ব-কর্ম্মের ফল সকল প্রদান পূর্ব্বক আমাতে রত, যে সকল ব্যক্তি অনন্য-ভক্তিযোগ-বিলসিত-ধ্যান দ্বারা আমাকে উপাসনা করেন, সেই—আমাতে আবেশিত চিত্ত-ভক্তিযোগ-সম্পন্ন-ব্যক্তিগণকে আমি অবিলম্বে মৃত্যুর কারণ, সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। ৬—৭। আমাতে স্থৈর্য্য দ্বারা মনোযোগ কর, আমাতে বুদ্ধি-নিবিষ্ট কর, নিঃসন্দেহ ঐ উভয় কার্য্য দ্বারা ইহলোক পরিত্যাগান্তে, 'গোলোকে' আমাতেই বাস করিবে। ৮। আমাতে যদ্যপি স্থিরতার সহিত চিত্ত-সমাধান করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে ধনঞ্জয়! অভ্যাস-যোগাবলম্বনে আমাকে পাইবার ইচ্ছা কর। ৯। অভ্যাস-যোগানুষ্ঠানে যদ্যপি অক্ষম হও—তাহা হইলে কেবল আমার জন্যই কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও—আমার জন্য কর্ম্ম করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিবে। ১০। এই প্রকার অনুষ্ঠানেও যদ্যপি অশক্ত হও, তাহা হইলে মদ্যোগা-শ্রিত এবং আত্ম-সংযত হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম-ফল-ত্যাগে রত হও। ১১। অভ্যাসাপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়স্কর, জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যানের প্রাধান্য, ধ্যানাপেক্ষা কর্ম্ম-ফল-ত্যাগের প্রাধান্য; অনন্তর সেই কর্ম্ম-

ফল-ত্যাগবশতই শান্তিলাভ হয়। ১২। সর্ব্ব-ভূত-প্রতি অদ্বেষ্টা, মিত্রতা সম্পন্ন, করুণ বা করুণা-সম্পন্ন, নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাবান, সতত-সন্তুষ্ট, সংযতাত্মা, মত্তত্ত্বে দৃঢ়-নিশ্চয় এবং মদর্পিত-মনোবুদ্ধি যে ভক্তি-যোগী বা ভক্ত—তিনিই আমার প্রিয়। ১৩—১৪। যে ভক্তি-সম্পন্ন-ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন লোক শঙ্কিত হন্ না, যিনি কোন লোক কর্ত্তৃক শঙ্কা প্রাপ্ত হন্ না, যিনি হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগ-মুক্ত—তিনিই আমার প্রিয়। ১৫। যে ব্যক্তি সর্ব্ব-বস্তুতে স্পৃহা-শূন্য বা অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথারহিত ও সর্ব্বোদ্যম-ত্যাগী আমার ভক্ত—তিনিই আমার প্রিয়। ১৬। হৃষ্ট হইবার সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেও যাঁহার হর্ষ-বোধ হয় না, দ্বেষ করিবার কারণ উপস্থিত হইলেও যিনি দ্বেষ করেন না, শোকের কারণ উপস্থিত হইলেও যিনি শোকার্ত্ত হন্ না, যিনি আকাঙ্ক্ষা-শূন্য এবং শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান—তিনিই আমার প্রিয়। ১৭। শত্রু-মিত্রে সমভাবাপন্ন, মানাপমানে সম-ভাবাপন্ন, শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, নিন্দা-স্তুতিতে সমবোধ-সম্পন্ন, সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত-মৌনী কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট, নিকেতন-শূন্য, স্থিরমতি-ভক্তিমান-নরই আমার প্রিয়। ১৮—১৯। এই নিত্য-ধর্ম্ম যে প্রকার কথিত হইয়াছে, তদনুসারে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচরণ করেন, সেই সকল শ্রদ্ধা-সম্পন্ন মদ্গত-প্রাণ আমার ভক্তগণ, আমার অতিশয় প্রিয়। ২০।”

ভক্তিযোগ কথিত হইল। এক্ষণে অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণোক্ত একোনবিংশ শ্লোক-সম্বন্ধে আরো কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বিচার-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত

হইয়াছে, যে পরমেশ্বরের প্রতিবিম্বমাত্র জীব-শরীরে অধিষ্ঠিত আছে। কিন্তু 'স্বয়ং-পরমেশ্বর' জীব-শরীরে অধিষ্ঠিত নহেন্। বহু-জীব বিদ্যমান। কথিত প্রমাণানুসারে, সেই সকলের কোনটীতেই পরমেশ্বর বিদ্যমান নহেন্। সুতরাং সেইজন্য সেই পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপীও বলা যায় না। কারণ অষ্টাবক্রের মতে জীব-সকলে পরমেশ্বর বিদ্যমান নহেন্। অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণোক্ত উক্ত একোনবিংশ শ্লোকে যাঁহাকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই সগুণ-সক্রিয়। তাঁহাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। কারণ যাঁহার পরমৈশ্বর্য্য আছে, তিনিই পরমেশ্বর। তাঁহার সেই পরমৈশ্বর্য্যের প্রকাশ—গুণ-কর্ম্ম দ্বারা হইয়া থাকে, তাহা নানাস্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রানুসারেই অবগত হওয়া যায়। নানাস্মৃত্যানুসারে, নানাপুরাণানুসারে এবং নানাতন্ত্রানুসারে সেইপরমেশ্বরকে 'সগুণ-সক্রিয়' বলা হইয়াছে। স্বচ্ছ-পদার্থেই জড়াকারের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে। কোন জীব-শরীরই স্বচ্ছ নহে। তবে তাহাতে কি প্রকারেই বা পরমেশ্বর প্রতিবিম্বিত হন্? অনেকের পক্ষে তাহা অবধারণ করাও দুষ্কর হইয়া থাকে।

ষড়্‌বিংশ সিদ্ধান্ত।

অষ্টাবক্র-সংহিতোক্ত আত্মানুভবোপদেশো নাম প্রথম-প্রকরণের বিংশ বা শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"একং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা॥"

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে,— "এক-সর্ব্বগত-ব্যোম যেমন ঘটের বহিরন্তরে বিদ্যমান, তদ্রূপ নিত্য-ব্রহ্মও নিরন্তর সর্ব্বভূতে বিদ্যমান।" বলা হইয়াছে— নিত্য-ব্রহ্ম নিরন্তর সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। অষ্টাবক্রের মতে নিত্য-ব্রহ্ম নিরন্তর সর্ব্বভূতে বিদ্যমান বলিয়া, সর্ব্বভূতেরও অবশ্যই নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। উক্ত শ্লোকে নিত্য-ব্রহ্ম কিয়ৎকালের জন্য সর্ব্বভূতে বিদ্যমান বলা হয় নাই। সেই-জন্য অষ্টাবক্রের মতে সর্ব্বভূতের অনিত্যতা স্বীকার করা হয় নাই, অবশ্যই বলিতে হইবে। অষ্টাবক্রের মতে, ব্রহ্মের নিত্যতার ন্যায় সর্ব্বভূতের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া, সর্ব্বভূতকেও অসত্য বলা যায় না। শ্রুতি-বেদান্তমতে যাহা অসত্য নহে—তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম। অষ্টাবক্রের মতে নিরন্তর বা সতত, ব্রহ্ম 'সর্ব্বভূতে' বিদ্যমান; কিন্তু অষ্টাবক্র-কথিত উক্ত শ্লোকানুসারে নিত্য-ব্রহ্ম ও নিত্য-সর্ব্বভূতকে অভেদ বুঝিবার কোন কারণ নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে নিত্য-ব্রহ্মের, নিত্য-সর্ব্বভূতের সঙ্গে পার্থক্য আছেই বুঝিতে হয়। অথচ উক্ত শ্লোকানুসারে উভয়কেই নিত্য বলা যায়। কোন প্রসিদ্ধ অদ্বৈত-গ্রন্থমতেও আত্মা 'বহু' নহেন্। অতএব সেইজন্য সর্ব্বভূতকে আত্মা বলা যায় না। অদ্বৈতমতানুসারে কেবল ব্রহ্মকেই আত্মা বলিতে হয়। অদ্বৈতমতে সর্ব্বভূত, অনাত্মারই অন্তর্গত। অদ্বৈতমতানুসারে 'সর্ব্বভূত' অনাত্মার নানা বিকাশ বলিয়া, সর্ব্বভূতকেও অনাত্মা বলিতে হয়। অনেক অদ্বৈত-গ্রন্থানুসারে 'অনাত্মা'—অনিত্য ও অসত্য। কিন্তু অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণের উক্ত বিংশ শ্লোকানুসারে, সর্ব্ব-

ভূতেরও নিত্য-ব্রহ্মের ন্যায়, নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। নিরন্তর ব্রহ্ম 'সর্ব্বভূতে' বিদ্যমান বলিলে, কোন বুদ্ধিমানই সর্ব্ব-ভূতের অনিত্যতা বুঝেন না। নিরন্তর নিত্য-ব্রহ্ম যাহাতে বা যে সকলে বিদ্যমান, তাহা বা সে সকলও অবশ্যই নিত্য। কারণ, নিরন্তর নিত্যের—অনিত্যে বিদ্যমানতা থাকিতে পারে না। কেহ সেই ব্রহ্মের ঐ প্রকার বিদ্যমানতা অসম্ভব নহে বলিলে, আমরা তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া তাঁহার অযৌক্তিক-অসত্য-কথা ভ্রম-প্রসূত বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকি। কারণ অষ্টাবক্র স্পষ্টই নিত্য-ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বভূতেরও নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"এবং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা ॥"

অষ্টাবক্র-সংহিতোক্ত আত্মানুভবোপদেশ নাম প্রথম-প্রকরণ-সম্বন্ধীয় মত সমাপ্ত।

নদঃ শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ধ্রুবমমুং
ত্রয়াণাং তীর্থানামুপনয়সি সম্ভেদমনঘে ! ॥ ৫৪ ॥
তবাপর্ণে ! কর্ণেজপনয়নপৈশুন্যচকিতা
নিলীয়ন্তে তোয়ে নিয়তমনিমেষাঃ শফরিকাঃ।
ইয়ঞ্চ শ্রীর্ব্বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং
জহাতি প্রত্যূষে নিশি চ বিঘটয্য প্রবিশতি ॥ ৫৫ ॥
নিমেষোন্মেষাভ্যাং প্রলয়মুদয়ং যাতি জগতী
তবেত্যাহুঃ সন্তো ধরণিধররাজন্যতনয়ে !।
ত্বদুন্মেষাজ্জাতং জগদিদমশেষং প্রলয়তঃ
পরিত্রাতুং শঙ্কে পরিহৃতনিমেষাস্তব দৃশঃ ॥ ৫৬ ॥
দৃশা দ্রাঘীয়স্যা দরদলিতনীলোৎপলরুচা
দবীয়াংসং দীনং স্নপয় কৃপয়া মামপি শিবে !।
অনেনায়ং ধন্যো ভবতি ন চ তে হানিরিয়তা
বনে বা হর্ম্ম্যে বা সমকরনিপাতো হিমকরঃ ॥ ৫৭ ॥
অরালং ভ্রূপালীযুগলমগরাজন্যতনয়ে !
ন কেষামাধত্তে কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকম্।
তিরশ্চীনো যত্র শ্রবণপথমুল্লঙ্ঘ্য বিলসন্
অপাঙ্গব্যাসঙ্গো দিশতি শরসন্ধানধিষণাম্ ॥ ৫৮ ॥
স্ফুরদ্গণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাড়ঙ্কযুগলং
চতুশ্চক্রং শঙ্কে তব মুখমিদং মান্মথরথম্।
যমারুহ্য দ্রুহ্যত্যবনিরথমর্কেন্দুচরণং
মহাবীরো মারঃ প্রমথপতয়ে সং জিতবতে ॥ ৫৯ ॥

সরস্বত্যাঃ সূক্তীরমৃতলহরীকৌশলহরীঃ
পিবন্ত্যাঃ শর্ব্বাণি শ্রবণচুলুকাভ্যামবিরলম্ ।
চমৎকারশ্লাঘাচলিতশিরসঃ কুণ্ডলগণো
ঝণৎকারৈস্তারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব তে ॥ ৬০ ॥
অসৌ নাসাবংশস্তুহিনগিরিবংশধ্বজপটে !
ত্বদীয়ো নেদীয়ঃ ফলতু ফলমস্মাকমুচিতম্ ।
বহন্নন্তর্মুক্তাঃ শিশিরতরনিশ্বাসঘটিতাঃ
সমৃদ্ধ্যা যস্তাসাং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ ॥ ৬১ ॥
প্রকৃত্যা রক্তায়াস্তব সুদতি ! দন্তচ্ছদরুচে-
র্ব্বরাকী সাদৃশ্যং জনয়তু কথং বিদ্রুমলতা ।
ন বিম্বং তদ্বিম্বপ্রতিফলনলাভাদরুণিতং
তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমপি বিলজ্জেত কলয়া ॥ ৬২ ॥
স্মিতজ্যোৎস্নাজালং তব বদনচন্দ্রস্য পিবতাং
চকোরাণামাসীদতিরসতয়া চঞ্চুজড়িমা ।
অতস্তে শীতাংশোরমৃতলহরীমম্লরুচয়ঃ
পিবন্তি স্বচ্ছন্দং নিশি নিশি ভৃশং কাঞ্জিকধিয়া ॥ ৬৩ ॥
অবিশ্রান্তং পত্যুর্গুণগণকথাম্রেড়নজড়া
জবাপুষ্পচ্ছায়া তব জননি ! জিহ্বা বিজয়তে ।
যদগ্রাসীনায়াঃ স্ফটিকদৃশদচ্ছচ্ছবিময়ী
সরস্বত্যা মূর্ত্তিঃ পরিণমতি মাণিক্যবপুষা ॥ ৬৪ ॥
রণে জিত্বা দৈত্যানপহৃতশিরস্ত্রৈঃ কবচিভিঃ
নিবৃত্তৈশ্চণ্ডাংশুত্রিপুরহরনির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ ।

বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ শশিশকলকর্পূরধবলা
বিলুপ্যন্তে মাতস্তব বদনতাম্বূলকণিকাঃ ॥ ৬৫ ॥

বিপঞ্চ্যা গায়ন্তী বিবিধমবদানং পশুপতে-
স্ত্বয়ারব্ধে বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনৈঃ।
তদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈরপলপিততন্ত্রীকলরবাং
নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন নিভৃতম্ ॥ ৬৬ ॥

করাগ্রেণ স্পৃষ্টং তুহিনগিরিণা বৎসলতয়া
গিরীশেনোদস্তং মুহুরধরপানাকুলিতয়া।
করগ্রাহ্যং শম্ভোর্ম্মুখমুকুরবৃন্তং গিরিসুতে!
কথঙ্কারং ব্রূমস্তব চিবুকমৌপম্যরহিতম্ ॥ ৬৭ ॥

ভুজাশ্লেষান্নিত্যং পুরদময়িতুঃ কণ্টকবতী
তব গ্রীবা ধত্তে মুখকমলনালশ্রিয়মিয়ম্।
স্বতঃশ্বেতা কালাগুরুবহলজম্বালমলিনা
মৃণালীলালিত্যং বহতি যদহো হারলতিকা ॥ ৬৮ ॥

গলে রেখাস্তিস্রো গতিগমকগীতৈকনিপুণে!
বিবাহব্যানদ্ধপ্রগুণগণসংখ্যাপ্রতিভুবঃ।
বিরাজন্তে নানাবিধমধুররাগাকরভুবাং
ত্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব তে ॥ ৬৯ ॥

মৃণালীমৃদ্বীনাং তব ভুজলতানাং চতসৃণাং
চতুর্ভিঃ সৌন্দর্য্যং সরসিজভবঃ স্তৌতি বদনৈঃ।
নখেভ্যঃ সন্ত্রস্যন্ প্রথমদলনাদন্ধকরিপো-
শ্চতুর্ণাং শীর্ষাণাং সমমভয়হস্তার্পণধিয়া ॥ ৭০ ॥

নখানামুদ্দ্যোতৈর্নবনলিনরাগং বিহসতাং
করাণান্তে কান্তিং কথয় কথয়ামঃ কথমমী।
কদাচিদ্বা সাম্যং ভজতু কলয়া হন্ত কমলং
যদি ক্রীড়ল্লক্ষ্মীচরণতললাক্ষারুণদলম্ ॥ ৭১ ॥
সমং দেবি! স্কন্দদ্বিপবদনপীতং স্তনযুগং
তবেদং নঃ খেদং হরতু সততং প্রস্নুতমুখম্।
যদালোক্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ো হাসজনকঃ
স্বকুম্ভৌ হেরম্বঃ পরিমৃষতি হস্তেন ঝটিতি ॥ ৭২ ॥
অমূ তে বক্ষোজাবমৃতরসমাণিক্যকলসৌ
ন সন্দেহস্পন্দো নগপতিপতাকে! মনসি নঃ।
পিবন্তৌ তৌ যস্মাদবিদিতবধূসঙ্গমরসৌ
কুমারাবদ্যাপি দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ ॥ ৭৩ ॥
বহত্যম্ব! স্তম্বেরমদনুজকুম্ভপ্রকৃতিভিঃ
সমারব্ধাং মুক্তামণিভিরমলাং হারলতিকাম্।
কুচাভোগো বিম্বাধররুচিভিরন্তঃশবলিতাং
প্রতাপব্যামিশ্রাং পুরবিজয়িনঃ কীর্তিমিব তে ॥ ৭৪ ॥
কুচৌ সদ্যঃস্বিদ্যত্তটঘটিতকূর্পাসভিদুরৌ
কষন্তৌ দোর্মূলং কনককলসাভৌ কলয়তা।
তব ত্রাতুং ভঙ্গাদলমিতি বিলগ্নং তনুভুবা
ত্রিধাবদ্ধং দেবি! ত্রিবলিলবলীবল্লিভিরিব ॥ ৭৫ ॥
তব স্তন্যং মন্যে ধরণিধরকন্যে! হৃদয়তঃ
পয়ঃপারাবারঃ পরিবহতি সারস্বত ইব।

দয়াবত্যা দত্তং দ্রবিড়শিশুরাস্বাদ্য তব যৎ
কবীনাং প্রৌঢ়ানামজনি কমনীয়ঃ কবয়িতা ॥ ৭৬ ॥
হরক্রোধজ্বালাবলিভিরবলীঢ়েন বপুষা
গভীরে তে নাভীসরসি কৃতঝম্পো মনসিজঃ।
সমুত্তস্থৌ তস্মাদচলতনয়ে! ধূমলতিকা
জনস্তাং জানীতে জননি! তব রোমাবলিরিতি ॥ ৭৭ ॥
যদেতৎ কালিন্দীতনুতরতরঙ্গাকৃতি শিবে!
কৃশে মধ্যে কিঞ্চিজ্জননি! তব তদ্ভাতি সুধিয়াম্।
বিমর্দ্দাদন্যোন্যং কুচকলসয়োরন্তরগতং
তনূভূতং ব্যোম প্রবিশদিব নাভিং কুহরিণীম্ ॥ ৭৮ ॥
স্থিরো গঙ্গাবর্ত্তঃ স্তনমুকুলরোমাবলিলতা-
কলাস্থানং কুণ্ডং কুসুমশরতেজোহুতভুজঃ।
রতেলীলাগারং কিমপি তব নাভীতি গিরিজে
বিলদ্বারং সিদ্ধের্গিরিশনয়নানাং বিজয়তে ॥ ৭৯ ॥
নিসর্গক্ষীণস্য স্তনতটভরেণ ক্লমজুষো
নমন্মূর্ত্তের্নাভৌ বলিষু শনকৈস্ত্রুট্যত ইব।
চিরং তে মধ্যস্য ত্রুটিততটিনী-তীরতরুণা
সমাবস্থাস্থেম্নো ভবতু কুশলং শৈলতনয়ে! ॥ ৮০ ॥
গুরুত্বং বিস্তারং ক্ষিতিধরপতিঃ পার্ব্বতি! নিজা-
ন্নিতম্বাদাচ্ছিদ্য ত্বয়ি যজনরূপেণ নিদধে।
অতস্তে বিস্তীর্ণো গুরুরয়মশেষাং বসুমতীং
নিতম্বপ্রাগ্ভাবঃ স্থগয়তি লঘুত্বং নয়তি চ ॥ ৮১ ॥

করীন্দ্রাণাং শুণ্ডাঃ কনককদলীকাণ্ডপটলী-
মুভাভ্যামূরুভ্যামুভয়মপি নির্জ্জিত্য ভবতী।
সুবৃত্তাভ্যাং পত্যৌ প্রণতিকঠিনাভ্যাং গিরিসুতে!
বিজিগ্যে জানুভ্যাং বিবুধকরিকুম্ভদ্বয়মপি ॥ ৮২ ॥
পরাজেতুং রুদ্রং দ্বিগুণশরগর্ভৌ গিরিসুতে!
নিষঙ্গৌ তে জঙ্ঘে বিষমবিশিখো বাঢ়মকৃত।
যদগ্রে দৃশ্যন্তে দশশরফলাঃ পাদযুগলী-
নখাগ্রচ্ছদ্মানঃ সুরমুকুটশাণৈকনিশিতাঃ ॥ ৮৩ ॥
শ্রুতীনাং মূর্দ্ধানো দধতি তব যৌ শেখরতয়া
মমাপ্যেতৌ মাতঃ! শিরসি দয়য়া ধেহি চরণৌ।
যয়োঃ পাদ্যং পাথঃ পশুপতিজটাজূটতটিনী
যয়োর্ল্লাক্ষালক্ষ্মীররুণহরচূড়ামণিরুচিঃ ॥ ৮৪ ॥
হিমানীহন্তব্যং হিমগিরিতটাক্রান্তরুচিরৌ
নিশায়াং নিদ্রাণং নিশি চ পরভাগে চ বিশদৌ।
পরং লক্ষ্মীপাত্রং শ্রিয়মপি সৃজন্তৌ প্রণয়িনাং
সরোজং ত্বৎপাদৌ জননি! জয়তশ্চিত্রমিহ কিম্ ॥ ৮৫ ॥
নমোবাচং ব্রূমো নয়নরমণীয়ায় পদয়ো-
স্তবাস্মৈ দ্বন্দ্বায় স্ফুটরুচিরসালক্তকবতে।
অসূয়ত্যত্যন্তং যদভিহননায় স্পৃহয়তে
পশূনামীশানঃ প্রমদবনকঙ্কেল্লিতরবে ॥ ৮৬ ॥
মৃষা কৃত্বা গোত্রস্খলনমথ বৈলক্ষনমিতং
ললাটে ভর্ত্তারং চরণযুগলং তাড়য়তি তে।

চিরাদন্তঃশল্যং দহনকৃতমুন্মূলিতবতা
তুলাকোটিক্কাণৈঃ কিলকিলিতমীশানরিপুণা ॥ ৮৭ ॥
পদন্তে কান্তীনাং প্রপদমপদং দেবি ! বিপদাং
কথং নীতং সদ্ভিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাম্ ।
কথং বা বাহুভ্যামুপযমনকালে পুরভিদা
তদাদায় ন্যস্তং দৃশদি দয়মানেন মনসা ॥ ৮৮ ॥
নখৈর্নাকস্ত্রীণাং করকমলসঙ্কোচশশিভি-
স্তরূণাং দিব্যানাং হসত ইব তে চণ্ডি ! চরণৌ ।
ফলানি স্বস্থেভ্যঃ কিশলয়করাগ্রেণ দধতাং
দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং শ্রিয়মনিশমহ্নায় দদতৌ ॥ ৮৯ ॥
কদা কালে মাতঃ ! কথয় কলিতালক্তকরসং
পিবেয়ং বিদ্যার্থী তব চরণনির্ণেজনজলম্ ।
প্রকৃত্যা মূকানামপি চ কবিতাকারণতয়া
যদাদত্তে বাণী মুখকমলতাম্বূলরসতাম্ ॥ ৯০ ॥
পদন্যাসক্রীড়াপরিচয়মিবালব্ধুমনস-
শ্চরন্তস্তে খেহলং ভবনকলহংসা ন জহতি ।
স্ববিক্ষেপে শিক্ষাং সুভগমণিমঞ্জীররণিত-
চ্ছলাদাচক্ষাণং চরণকমলং চারুচরিতম্ ॥ ৯১ ॥
অরালা কেশেষু প্রকৃতিসরলা মন্দহসিতে
শিরীষাভা গাত্রে দৃশদিব কঠোরা কুচতটে ।
ভৃশং তন্বী মধ্যে পৃথুরসি বরারোহবিষয়ে
জগত্ত্রাতুং শম্ভোর্জয়তি করুণা কাচিদরুণা ॥ ৯২ ॥

পুরারাতেরন্তঃপুরমসি ততস্ত্বচ্চরণয়োঃ
সপর্য্যামর্য্যাদা তরলকরণানামসুলভা।
তথা হ্যেতে নীতাঃ শতমখমুখাঃ সিদ্ধিমতুলাং
তব দ্বারোপান্তস্থিতিভিরণিমাদ্যাভিরমরাঃ ॥ ৯৩ ॥
গতাস্তে মঞ্চত্বং দ্রুহিণহরিরুদ্রেশ্বরশিবাঃ
শিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিতকপটপ্রচ্ছদপটঃ।
ত্বদীয়ানাং ভাসাং প্রতিফলনলাভারুণতয়া
শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং দোগ্ধি কুতুকম্ ॥ ৯৪ ॥
কলঙ্কঃ কস্তূরী রজনিকরবিম্বং জলময়ং
কলাভিঃ কর্পূরৈর্ম্মরকতকরণ্ডং নিবিড়িতম্।
অতস্ত্বদ্ভোগেন প্রতিদিনমিদং রিক্তকুহরং
বিধির্ভূয়োভূয়ো নিবিড়য়তি নূনং তব কৃতে ॥ ৯৫ ॥
স্বদেহোদ্ভূতাভির্ঘৃণিভিরণিমাদ্যাভিরভিতো
নিষেব্যাং নিত্যে! ত্বামহমিতি সদা ভাবয়তি যঃ।
কিমাশ্চর্য্যং তস্য ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তো
মহাসম্বর্ত্তাগ্নির্বিরচয়তি নীরাজনবিধিম্ ॥ ৯৬ ॥
কলত্রং বৈধাত্রং কতি কতি ভজন্তে ন কবয়ঃ
শ্রিয়ো দেব্যাঃ কো বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ।
মহাদেবং হিত্বা তব সতি! সতীনামচরমে!
কুচাভ্যামাসঙ্গঃ কুরুবকতরোরপ্যসুলভঃ ॥ ৯৭ ॥
গিরামাহুর্দ্দেবীং দ্রুহিণগৃহিণীমাগমবিদো
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরীমদ্রিতনয়াম্।

তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা
মহামায়ে ! বিশ্বং ভ্রময়সি পরংব্রহ্মমহিষি ! ॥ ৯৮ ॥
সমুদ্ভূতস্থূলস্তনভরমুরশ্চারু হসিতং
কটাক্ষে কন্দর্পাঃ কতি চ ন কদম্বদ্যুতিবপুঃ।
হরস্থং ত্বদ্ভ্রান্তিং মনসি জনয়ামাস মদনো
ভবত্যাং যে ভক্তাঃ পরিণতিরমীষামিয়মুমে ! ॥ ৯৯ ॥
সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা বিধিহরিসপত্নো বিহরতে
রতেঃ পাতিব্রাত্যং শিথিলয়তি রম্যেণ বপুষা।
চিরং জীবন্নেব ক্ষয়িতপশুপাশব্যতিকরঃ
পরং ব্রহ্মাভিখ্যং রসয়তি রসং ত্বদ্ভজনবান্ ॥ ১০০ ॥
নিধে ! নিত্যস্মেরে ! নিরবধিগুণে ! নীতিনিপুণে !
নিরাঘাটজ্ঞানে ! নিয়মপরচিত্তৈকনিলয়ে ! ।
নিয়ত্যা নির্ম্মুক্তে নিখিলনিগমান্তস্তুতপদে !
নিরাতঙ্কে ! নিত্যে ! নিগময় মমাপি স্তুতিমিমাম্ ॥ ১০১ ॥
প্রদীপজ্বালাভির্দ্দিবসকরনীরাজনবিধিঃ
সুধাসূতেশ্চন্দ্রোপলজললবৈরর্ঘ্যরচনা।
স্বকীয়ৈরম্ভোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং
ত্বদীয়াভির্ব্বাগ্‌ভিস্তব জননি ! বাচাং স্তুতিরিয়ম্ ॥ ১০২ ॥

মঞ্জীরশোভিচরণং বলিশোভিমধ্যং
হারাভিরামকুচমম্বুরুহায়তাক্ষম্।
লীলাত্মকং হিমমহীধরকন্যকাখ্যং
জ্ঞানপ্রদীপমিমমীশ্বরদীপদীপ্তম্ ॥ ১০৩ ॥

ইত্থং শঙ্করমূর্ত্তিনা ভগবতা বাগ্দেবতাসিন্ধুনা
শ্রীসৌন্দর্য্যসুধানদীস্তুতিরিয়ং কৢপ্তা বিচিত্রা গুণৈঃ।
আবৃত্তা ধৃতশক্তিভির্দ্দশশতাবৃত্ত্যা নরৈঃ সাধকৈ-
স্তান্ কুর্ব্বীত কবীন্ নরেন্দ্রমুকুটীসংঘৃষ্টপাদাম্বুজান্ ॥১০৪॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতমানন্দলহরীস্তোত্রং
সমাপ্তম্।